১২তম খণ্ড

ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা

উত্তরণের উপায়

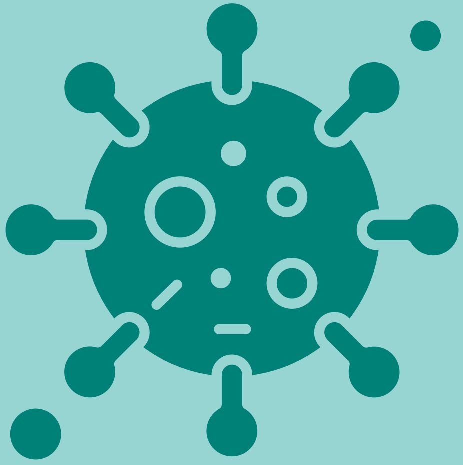

বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা উত্তরণের উপায়

দ্বাদশ খণ্ড

বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা : উত্তরণের উপায়
(২০২০-২১ সালে প্রকাশিত টিআইবির গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংকলন)

দ্বাদশ খণ্ড

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২২

© ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ ২০২২

গবেষণালব্ধ তথ্য-উপাত্তনির্ভর এই প্রকাশনায় উপস্থাপিত বিশ্লেষণ ও সুপারিশ টিআইবির মতামতের প্রতিফলন, যার দায়দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট গবেষক ও টিআইবির।

সংকলনে অন্তর্ভুক্ত গবেষণাগুলোর উপদেষ্টা

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, টিআইবি

অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের
উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, টিআইবি

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি

প্রচ্ছদ অলংকরণ

সামছুদ্দোহা সাফায়েত

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (৫ম ও ৬ষ্ঠ তলা)
বাড়ি - ৫, সড়ক - ১৬ (নতুন) (পুরোনো ২৭)
ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: ৮৮০-২ ৪৮১১৩০৩২, ৪৮১১৩০৩৩, ৪৮১১৩০৩৬
ফ্যাক্স: ৮৮০-২- ৪৮১১৩১০১
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org
ফেসবুক : www.facebook.com/TIBangladesh

ISBN: 978-984-35-2052-4

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

মুখবন্ধ

প্রথম অধ্যায়
শুদ্ধাচার ব্যবস্থা

তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ চর্চার মূল্যায়ন ১৫
জুলিয়েট রোজেটি, ফাতেমা আফরোজ ও কুমার বিশ্বজিত দাস

স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় উপজেলা নারী নির্বাহী কর্মকর্তার চ্যালেঞ্জ ও করণীয় ৩৭
নাহিদ শারমীন

দ্বিতীয় অধ্যায়
সেবা খাত

মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন : সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় ৪৯
তাসলিমা আক্তার

করোনাভাইরাস সংকট মোকাবিলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ : দ্বিতীয় পর্ব ৬৫
মো. জুলকারনাইন, মোহাম্মদ নূরে আলম, মোরশেদা আক্তার, তাসলিমা আকতার ও মনজুর ই খোদা

করোনাভাইরাস সংকট মোকাবিলা : কোভিড-১৯ টিকা ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ৮৫
মো. জুলকারনাইন, মোহাম্মদ নূরে আলম, মোরশেদা আক্তার ও তাসলিমা আকতার

উন্নয়নে অন্তর্ভুক্তি এবং প্রতিবন্ধিতা : সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় ৯৯
ফারহানা রহমান, নিহার রঞ্জন রায় ও দিপু রায়

সরকারি সেবায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অভিগম্যতা : জবাবদিহি ব্যবস্থার বিশ্লেষণ ১১৭
মো. মোস্তফা কামাল, অমিত সরকার ও জুলিয়েট রোজেটি

সরকারি গণগ্রন্থাগার : সেবা ও ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় ১২৯
কুমার বিশ্বজিত দাশ

তৃতীয় অধ্যায়
ব্যক্তিমালিকানাধীন খাত

তৈরি পোশাক খাতে করোনাভাইরাস উদ্ভূত সংকট : সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও করণীয় ১৪৩
নাজমুল হুদা মিনা ও মোহাম্মদ নূরে আলম

চতুর্থ অধ্যায়
পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ মোকাবিলা

বন অধিদপ্তর : সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় ১৫৯
মো. রেযাউল করিম, মোহাম্মদ নূরে আলম ও মো. নেওয়াজুল মওলা

দুর্যোগ মোকাবিলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় : ঘূর্ণিঝড় আম্পানসহ সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা ১৭৩
মো. নেওয়াজুল মওলা, কাজী আবু সালেহ, মো. মাহ্ফুজুল হক, রাজু আহমেদ মাসুম ও মু. জাকির হোসেন খান

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন অর্থায়ন ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় ১৯১
মো. রাজু আহমদ মাসুম ও মু. জাকির হোসেন খান

যুক্তরাজ্যের গ্লাসগোতে কপ-২৬ জলবায়ু সম্মেলন : কয়লাভিত্তিক জ্বালানি ব্যবহার বন্ধ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসার ও প্রতিশ্রুত জলবায়ু অর্থায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রসঙ্গে টিআইবির অবস্থানপত্র ২০৩

গবেষক পরিচিতি ২১১

মুখবন্ধ

২০১৯ সালের ডিসেম্বরে চীন থেকে শুরু হয়ে পৃথিবীর প্রায় সব দেশে অতিঅল্প সময়ের মধ্যে ছড়িয়ে পড়া প্রাণঘাতী সংক্রামক রোগ কোভিড-১৯ উদ্ভূত অতিমারি ২০২১ সালের শেষ দিক পর্যন্তও একটি বাস্তবতা। বাংলাদেশে ২০২০ সালের মার্চ মাসের শুরুর দিকে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ শুরু হয়, যা ২০২১ সালের মাঝামাঝি সময়ে মারাত্মক আকার ধারণ করে। বর্তমানে এর প্রকোপ অনেকখানি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকলেও এখনো এটি দেশের অন্যতম একটি স্বাস্থ্য সমস্যা ও দুর্যোগ। এই অতিমারির বিভিন্ন বিরূপ আর্থসামাজিক প্রভাব থেকে বাংলাদেশ এখনো মুক্ত হতে পারেনি। তবে এই সংকটের মধ্যেও বিভিন্ন খাত ও প্রতিষ্ঠানে সুশাসনের সংকট আগের মতোই বিরাজমান বলে বিভিন্ন গবেষণায় উদ্ঘাটিত হয়েছে, বিশেষ করে স্বাস্থ্য খাতে সুশাসনের ঘাটতি ও দুর্নীতির গভীরতা আরও উন্মোচিত হয়েছে।

দেশব্যাপী দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি ও নাগরিক চাহিদাকে সোচ্চার ও কার্যকর করার জন্য কাজ করছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। এর অংশ হিসেবে সুশাসনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সরকারি-বেসরকারি সেবা খাতে দুর্নীতির প্রকৃতি, মাত্রা ও ব্যাপকতা নিরূপণের জন্য টিআইবি গবেষণা ও তার ভিত্তিতে অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সরকার ও সংশ্লিষ্ট সব অংশীজনের অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশে আইনি, প্রাতিষ্ঠানিক, নীতি ও কৌশল কাঠামোতে প্রয়োজনীয় ও যুগোপযোগী সংস্কারের মাধ্যমে রাষ্ট্রের দুর্নীতিবিরোধী ও সুশাসনসহায়ক অবকাঠামো সুদৃঢ় করা ও এর প্রয়োগে সহায়ক ভূমিকা পালন করা এই কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য।

টিআইবি পরিচালিত ও প্রকাশিত বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ নিয়ে 'বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা : উত্তরণের উপায়' শীর্ষক ১১টি সংকলন ইতিমধ্যে বার্ষিক ভিত্তিতে প্রকাশিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় এই সিরিজের দ্বাদশতম সংকলন ২০২২ সালের অমর একুশে গ্রন্থমেলা উপলক্ষে প্রকাশিত হলো। এই সংকলনকে চারটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে : প্রথম অধ্যায়ে দেশের শুদ্ধাচারব্যবস্থা, দ্বিতীয় অধ্যায়ে সেবা খাত, তৃতীয় অধ্যায়ে ব্যক্তিমালিকানাধীন খাত এবং চতুর্থ অধ্যায়ে পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ মোকাবিলা নিয়ে প্রকাশিত বিভিন্ন গবেষণার ওপর ভিত্তি করে লিখিত প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ের প্রথম প্রবন্ধে শুদ্ধাচারব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানের অংশ হিসেবে 'তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ চর্চার মূল্যায়ন' শীর্ষক গবেষণার সারাংশ উপস্থাপিত হয়েছে। বাংলাদেশে ২০০৯ সালে প্রণীত তথ্য অধিকার আইনে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, যেখানে প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ তাদের গৃহীত সিদ্ধান্ত, কার্যক্রম কিংবা সম্পাদিত বা প্রস্তাবিত কর্মকাণ্ডের সব তথ্য নাগরিকদের কাছে সহজলভ্য হয় এভাবে সূচিবদ্ধ করে প্রকাশ ও প্রচার করবে এমন বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরে প্রণীত তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা, ২০১০ এবং স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা, ২০১৪ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত এবং সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বা বিভাগ, অধিদপ্তর,

সংস্থা ও এর আওতাভুক্ত কার্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত মেয়াদ ও পদ্ধতি অনুযায়ী স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশ, প্রচার ও হালনাগাদ করার নির্দেশনা দেওয়া হয়। এই গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর ওয়েবসাইটে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের ব্যাপ্তি ও মাত্রার তারতম্য পর্যবেক্ষণ করার জন্য নির্ধারিত নির্দেশকের ভিত্তিতে এসব প্রতিষ্ঠানের র‍্যাংকিং করা হয়েছে।

এই গবেষণায় দেখা যায়, ওয়েবসাইটের মাধ্যমে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশে অগ্রগতি যথেষ্ট সন্তোষজনক নয়। তথ্যের প্রবেশগম্যতার ক্ষেত্রে ইতিবাচক অবস্থা লক্ষ করা গেলেও তথ্যের ব্যাপ্তি ও উপযোগিতার ক্ষেত্রে সব ধরনের প্রতিষ্ঠানে কার্যকর উদ্যোগ প্রয়োজন। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর ওয়েবসাইটে বিধিমালা অনুযায়ী অনেক তথ্য প্রকাশিত হলেও তথ্যের হালনাগাদকরণ এবং ধরন অনুযায়ী তথ্যের বিন্যাস, বিস্তৃতি ও সহজলভ্য তথ্যপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে এখনো ঘাটতি বিদ্যমান। অন্যদিকে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর ওয়েবসাইটে বিধিমালা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্যের ঘাটতি লক্ষণীয়। এ ছাড়া ওয়েবসাইটে তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোয় প্রয়োজনীয় ধারণার ঘাটতিও লক্ষ করা যায়।

দ্বিতীয় প্রবন্ধে স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় উপজেলা নারী নির্বাহী কর্মকর্তার চ্যালেঞ্জ ও করণীয় নিয়ে পরিচালিত গবেষণার সারাংশ উপস্থাপিত হয়েছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) উপজেলার প্রধান নির্বাহী হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

স্থানীয় পর্যায়ে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে নারী ইউএনওরা কী ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেন তা এই প্রবন্ধে উঠে এসেছে। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত জরিপে ১৪৯ জন নারী ইউএনওর মধ্যে অংশগ্রহণ করেছেন ৪৫ জন। এ থেকে ধারণা পাওয়া যায় যে নারীরা হয়তো তাদের চ্যালেঞ্জের বিষয়টি বলতে অনাগ্রহী। গবেষণায় আরও দেখা যায়, জেন্ডার চাহিদা বিবেচনায় রেখে মাঠপর্যায়ে উন্নয়নকাজের পরিদর্শন ও আইনশৃঙ্খলা উন্নয়নের মতো বিশেষ পরিস্থিতিতে নারী ইউএনওদের বিশেষ কোনো নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেই, ফলে তুলনামূলকভাবে নারীরা পুরুষদের তুলনায় অনেক বেশি ঝুঁকির সম্মুখীন হন। দুর্নীতি প্রতিরোধ অভিযান, সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান, মাদকবিরোধী অভিযান, লকডাউন বাস্তবায়ন, প্রভৃতি কাজে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী থেকে পর্যাপ্ত ও যথাসময়ে সহযোগিতা পাওয়া অত্যন্ত জরুরি হলেও তারা তা পান না। এ ছাড়া নারী ইউএনওর সহকর্মী, উপজেলার অন্যান্য কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধিদের মাঝে নারীদের নিয়ে নেতিবাচক জেন্ডার ধারণা বিদ্যমান। কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে ইউএনওরা রাজনীতিবিদদের কাছ থেকে পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবের মুখোমুখি হন। ত্রাণসামগ্রী বিতরণ ও বিভিন্ন প্রকল্পের কাজের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের সময় স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের রাজনীতিবিদদের পক্ষ থেকে অনিয়ম করার জন্য চাপ প্রয়োগ করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে শারীরিকভাবেও লাঞ্ছনার শিকার হতে হয়। নারী ইউএনওরা দুর্নীতিবিরোধী কাজের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন এবং অনেক সময় অনৈতিক কাজ করতে চাপ প্রয়োগ করা হয়। নানা ধরনের উন্নয়নমূলক কাজে উপজেলা পরিষদ থেকে যথাযথ সহযোগিতা তারা পান না। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে নারী ইউএনওরা স্থানীয় সংবাদকর্মীদের কাছ থেকেও চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন। সর্বোপরি, স্থানীয় পর্যায়ে সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সংস্কৃতি এখনো নারীকর্মীবান্ধব নয়; বরং বৈষম্যমূলক।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে সরকারের বিভিন্ন সেবা খাত ও এর অধীনে সেবা প্রতিষ্ঠানের ওপর বেশ কয়েকটি গবেষণার সারাংশ আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ের প্রথম প্রবন্ধে মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম

বাস্তবায়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও তা থেকে উত্তরণের উপায় নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশে সাধারণ, কারিগরি ও মাদ্রাসা– এ তিনটি ধারার অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার প্রশাসনিক, ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হচ্ছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর। এই অধিদপ্তরের অধীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর প্রায় ৮২ শতাংশ মাধ্যমিক স্তরের প্রতিষ্ঠান। গবেষণায় দেখা যায়, মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার বা মানোন্নয়নে সরকারের বিভিন্ন ইতিবাচক পদক্ষেপ সত্ত্বেও গুরুত্বপূর্ণ এ খাতের প্রত্যাশিত উৎকর্ষ অর্জনে এখনো ঘাটতি বিদ্যমান। ২০১০ সালে জাতীয় শিক্ষানীতি হলেও এখনো অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাস্তবায়িত হয়নি। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও নীতিগতভাবে প্রাধান্য না পাওয়ায় শিক্ষা আইন এখন পর্যন্ত প্রণীত হয়নি। জাতীয় বাজেটে শিক্ষা খাতের বরাদ্দ আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী নয়। শিক্ষক ও কর্মচারীর জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধাও অনুপস্থিত। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার মাঠপর্যায়ের প্রশাসনিক কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমন্বিত জনবল কাঠামোর অনুপস্থিতি এবং জনবল সক্ষমতার ঘাটতিতে সুষ্ঠু তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শনের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে এ গবেষণায়। মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতে পদক্ষেপের ঘাটতির ফলে অনিয়ম ও দুর্নীতির বিস্তার হচ্ছে, শিক্ষা কার্যক্রম প্রক্রিয়ায় দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক প্রভাব, অনিয়ম ও আর্থিক দুর্নীতি অব্যাহত রয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হয়েছে।

দ্বিতীয় প্রবন্ধে করোনাভাইরাস সংকট মোকাবিলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ শীর্ষক গবেষণার সারাংশ উপস্থাপিত হয়েছে। এটি ২০২০ সালে একই বিষয়ের ওপর সম্পন্ন গবেষণার দ্বিতীয় পর্ব, যেখানে প্রথম পর্বে প্রাপ্ত ফলাফলের পরবর্তী সময়ে করোনাভাইরাস মোকাবিলায় সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমে কী ধরনের অগ্রগতি সাধিত হয়েছে এবং কী ধরনের নতুন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তা সুশাসনের আলোকে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, করোনা মোকাবিলায় সরকারের কিছু কার্যক্রমে উন্নতি হলেও করোনাভাইরাস মোকাবিলায় সরকারের গৃহীত কার্যক্রমে সুশাসনের প্রতিটি নির্দেশকের ক্ষেত্রে ব্যাপক ঘাটতি তখনো বিদ্যমান ছিল। স্বাস্থ্য খাতে ইতিমধ্যে গভীরভাবে বিস্তৃত দুর্নীতি করোনা সংকটে প্রকটভাবে উন্মোচিত হয়েছে এবং করোনা সংকটকে কেন্দ্র করে দুর্নীতির নতুন সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। করোনা পরীক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা, ত্রাণ কার্যক্রমে অব্যবস্থাপনা তখনো চলমান। একইভাবে সরকারের ত্রাণসহ প্রণোদনা কর্মসূচি থেকেও অনিয়ম-দুর্নীতি ও সুবিধা লাভের প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। মাঠপর্যায়ের অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে বিতরণকৃত ত্রাণ থেকে প্রকৃত উপকারভোগীরা বঞ্চিত হয়েছে।

আরও দেখা যায়, অনিয়ম-দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্তদের মধ্যে উচ্চপর্যায়ের ব্যক্তিদের রাজনৈতিক বিবেচনায় আড়াল করা হয়েছে এবং এ ক্ষেত্রে কিছু ব্যক্তির বিরুদ্ধে লোক দেখানো ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবণতা ছিল। এ ছাড়া তথ্য প্রকাশে বিধিনিষেধ আরোপের মাধ্যমেও অনিয়ম-দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনাকে আড়াল করার প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। সরকারের সংকোচনমূলক নীতি প্রয়োগের (সেবা ও নমুনা পরীক্ষা হ্রাস) মাধ্যমে শনাক্তের সংখ্যা হ্রাস হওয়াকে 'করোনা নিয়ন্ত্রণ' হিসেবে দাবি করা হয়েছে এবং রাজনৈতিক অর্জন হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। করোনাভাইরাস মোকাবিলার প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিশেষজ্ঞ মতামত উপেক্ষা করে আমলানির্ভর সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রবণতাও বিদ্যমান ছিল। শহরকেন্দ্রিক ও বেসরকারি পর্যায়ের বাণিজ্যিক সেবা সম্প্রসারণ, পরীক্ষায় ফি নির্ধারণ দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে এই সেবা থেকে বঞ্চিত করেছে

এবং হয়রানি ও অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি করেছে। নমুনা পরীক্ষা, চিকিৎসা এবং করোনার অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবিলায় গৃহীত প্রণোদনা কর্মসূচির ক্ষেত্রেও সমাজের সুবিধাপ্রাপ্ত অংশের অনুকূলে পক্ষপাত করা হয়েছে এবং চিকিৎসাসেবা ও প্রণোদনার সুফল সাধারণ মানুষের কাছে তখনো পৌঁছেনি।

পরবর্তী প্রবন্ধে করোনাভাইরাস সংকট মোকাবিলার ক্ষেত্রে কোভিড-১৯ টিকা ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ নিয়ে গবেষণার সারাংশ উপস্থাপিত হয়েছে, যা এই গবেষণা সিরিজের তৃতীয় পর্ব হিসেবে সম্পন্ন হয়েছে। বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ টিকার ব্যবহার শুরু হওয়ার (ডিসেম্বর ২০২০) কিছুদিনের মধ্যেই বাংলাদেশে অগ্রাধিকারভিত্তিক টিকা প্রদানের ব্যবস্থা (ফেব্রুয়ারি ২০২১) করা হয়। গবেষণায় দেখা যায়, সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির বিদ্যমান ব্যবস্থা ব্যবহারসহ দ্রুততার সঙ্গে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও টিকা কার্যক্রম বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। তবে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ বিস্তার রোধে বিজ্ঞানভিত্তিক ও পরিকল্পিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা, নমুনা পরীক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থাপনার সম্প্রসারণ ও অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবিলায় প্রণোদনা বিতরণে যথাযথ উদ্যোগের ঘাটতিসহ সমন্বয়হীনতা, অব্যবস্থাপনা, অনিয়ম-দুর্নীতি অব্যাহত ছিল। কোভিড-১৯ টিকা ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমেও সুশাসনের প্রতিটি নির্দেশকে ঘাটতি লক্ষ করা গেছে। আইনের লঙ্ঘন করে অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় টিকা আমদানির মাধ্যমে জনগণের টাকা থেকে তৃতীয় পক্ষের লাভবান হওয়ার সুযোগ তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। কৌশলগত ঘাটতি, ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর প্রভাব ও রাজনৈতিক বিবেচনায় টিকা ক্রয়ের ক্ষেত্রে একক উৎসের ওপর নির্ভর করার কারণে চলমান টিকা কার্যক্রমে আকস্মিক স্থবিরতা নেমে আসে। টিকাদান পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে সমন্বয়ের ঘাটতি, অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীকে পরিপূর্ণভাবে টিকার আওতায় আনার ক্ষেত্রে উদ্যোগের ঘাটতি ও সম প্রবেশগম্য টিকা কার্যক্রম নিশ্চিত না করার ফলে অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য ঝুঁকিপূর্ণ ও সুবিধাবঞ্চিত অনেক জনগোষ্ঠী টিকার আওতার বাইরে রয়ে যায়। টিকার নিবন্ধনব্যবস্থা সমাজের সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর অনুকূলে হওয়ার কারণে এলাকা, শ্রেণি, লিঙ্গ ও পেশাভিত্তিক বৈষম্য তৈরি হয়, যা সর্বজনীন টিকাদান কর্মসূচির অর্জনকে ঝুঁকিপূর্ণ করছে। সর্বোপরি করোনা মোকাবিলা ও টিকা কার্যক্রমে সুশাসনের ঘাটতি করোনাভাইরাস নির্মূল বা নিয়ন্ত্রণকে দীর্ঘায়িত করছে।

এ অধ্যায়ের চতুর্থ প্রবন্ধে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়ন-প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্তিতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও তা থেকে উত্তরণের উপায় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। গবেষণায় দেখা যায়, রাষ্ট্রীয়ভাবে আইনি কাঠামো থাকা সত্ত্বেও প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের উন্নয়নে অন্তর্ভুক্তি যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। নীতিগত ও আইনগতভাবে গুরুত্ব দেওয়া সত্ত্বেও বাস্তবে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের কল্যাণে বিদ্যমান কর্মপরিকল্পনা অন্তর্ভুক্তিমূলক নয় এবং তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সক্ষমতার ঘাটতি রয়েছে। রাষ্ট্রীয় বাজেটে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের জন্য বরাদ্দ বাস্তবসম্মত ও যথেষ্ট নয় এবং যে বরাদ্দ দেওয়া হয় তা-ও নানা অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে যথাযথভাবে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছায় না। সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর নিয়মিত তদারকি ও নিরীক্ষা না হওয়ায় সেবা প্রদান কার্যক্রমে অনিয়ম-দুর্নীতি অব্যাহত রয়েছে। প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের প্রকৃত সংখ্যা নির্ধারণে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে ঘাটতি থাকায় অধিকাংশ প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি মৌলিক মানবাধিকার ও রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এ ছাড়া প্রতিবন্ধিতাসহ

ব্যক্তিদের কল্যাণ ও উন্নয়নে অন্তর্ভুক্তিতে যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সংগঠনগুলোর মধ্যে সমন্বয় ও অংশগ্রহণের ঘাটতি রয়েছে।

পঞ্চম প্রবন্ধে সরকারি সেবায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অভিগম্যতা ও জবাবদিহি ব্যবস্থার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বাছাইকৃত কয়েকটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে সরকারি সেবা ও জবাবদিহি ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রচারে ঘাটতি রয়েছে। আবার আইনি সীমাবদ্ধতা বা আইনের অনুপস্থিতি, আইনের যথাযথ প্রয়োগে ব্যর্থতার কারণে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সেবায় অভিগম্যতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়ে থাকে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো বিভিন্ন সেবা প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান জবাবদিহি কাঠামো অনেক ক্ষেত্রে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক নয়। কারণ এ ক্ষেত্রে তাদের ভাষাগত, আর্থিক ও প্রযুক্তিগত ইত্যাদি সীমাবদ্ধতা বিবেচনায় নেওয়া হয়নি। আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীদের নেতিবাচক মানসিকতা ও চর্চা, অভিযোগ দাখিলের পর প্রত্যাশিত সমাধান না পাওয়া, বরং বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হওয়ার কারণে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী জবাবদিহি কাঠামো ব্যবহারে নিরুৎসাহিত হন। সর্বোপরি, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মৌলিক সেবা নিশ্চিতে জবাবদিহি ব্যবস্থা শক্তিশালী করা না হলে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের 'কাউকে পেছনে না রাখা' লক্ষ্য অর্জন করা কঠিন হবে।

এ অধ্যায়ের শেষ প্রবন্ধে সরকারি গণগ্রন্থাগারের সেবা ও ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় আলোচিত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট গবেষণায় দেখা যায় গণগ্রন্থাগারগুলোর আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে কার্যকর উদ্যোগ ও পরিকল্পনার ঘাটতি রয়েছে। তা ছাড়া সরকারের শিক্ষানীতিসহ অন্যান্য জাতীয় নীতি ও পরিকল্পনায় গণগ্রন্থাগারকে গুরুত্ব দিয়ে কৌশল নির্ধারণ ও কার্যক্রম গ্রহণ করা হলেও তা বাস্তবায়নে কার্যকর উদ্যোগের ঘাটতি রয়েছে। গণগ্রন্থাগারগুলোকে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পাঠকপর্যায়ে কার্যকর সেবা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে যুগোপযোগী করে তোলার উদ্যোগে ঘাটতি এবং নিয়োগ, পদায়ন, বদলি, প্রশিক্ষণ, ক্রয়-প্রক্রিয়া ও প্রকল্প বাস্তবায়নে অনিয়ম-দুর্নীতির প্রবণতা বিদ্যমান। এ ছাড়া ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ও কর্মকর্তাদের স্বচ্ছতা, কার্যকর তদারকি ও জবাবদিহির ঘাটতিতে কর্মীদের একাংশ অনিয়ম-দুর্নীতিতে জড়িত হওয়ার প্রবণতা রয়েছে। সার্বিকভাবে সুশাসনের ঘাটতির কারণে সাধারণ জনগণের কাছে সহজে ও সুলভে শিক্ষা ও তথ্যসেবা পৌঁছে দেওয়াার মতো সম্ভাবনাময় একটি খাতের সেবার মান যথাযথভাবে বিকশিত হতে পারছে না এবং কার্যকর পাঠকসেবা কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে ব্যক্তিমালিকানাধীন খাতের অধীনে তৈরি পোশাক খাতে করোনাভাইরাস উদ্ভূত সংকটে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও করণীয় নিয়ে একটি গবেষণার সারাংশ উপস্থাপিত হয়েছে। ২০১৯ সালের ডিসেম্বর থেকে করোনাভাইরাস পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ার ফলে বৈশ্বিক 'সাপ্লাই চেইন' (উৎপাদন, বিপণন ও সরবরাহ শৃঙ্খল) ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়, যার মধ্যে তৈরি পোশাক খাত অন্যতম। বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতে কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি আমদানিতে চীনের ওপর নির্ভরশীলতা, ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন দেশে মহামারি ছড়িয়ে পড়ার কারণে লকডাউন, ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল ২০২০ পর্যন্ত ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের ৩ দশমিক ১৮ বিলিয়ন

মার্কিন ডলার পরিমাণ চলমান ক্রয়াদেশ স্থগিত বা বাতিলের ফলে ২০২০ সালের এপ্রিল মাসে পোশাক রপ্তানি ৭৭ দশমিক ৬৭ শতাংশ কমে যায়, যা জুন ২০২০ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এ সময়ে ৪১৮টি কারখানা সাময়িক বা স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যায় এবং সংশ্লিষ্ট কারখানার বেশিরভাগ শ্রমিক কাজ হারান।

তৈরি পোশাক খাতে সুশাসনের বিভিন্ন নির্দেশককে উল্লেখযোগ্য ঘাটতি পূর্ববর্তী বিভিন্ন গবেষণায় উঠে এলেও তা নিরসনে সরকার ও মালিকপক্ষের সদিচ্ছা ও কার্যকর পদক্ষেপের ব্যাপক ঘাটতি ইতিমধ্যে বিদ্যমান ছিল। করোনার সময়ে এই প্রবণতা আরও প্রকট হয়েছে বলে দেখা যায়। আরও দেখা যায়, চার দশক ধরে বিকশিত তৈরি পোশাক খাত এখনো প্রণোদনার ওপর নির্ভরশীল। করোনার মতো সংকট মোকাবিলায় এ খাতের নিজস্ব সক্ষমতা এখনো তৈরি হয়নি। মালিকপক্ষ সরকারের ওপর প্রভাব ও চাপ প্রয়োগ করে ব্যবসার সম্ভাব্য ক্ষতি পুষিয়ে নিতে সরকারের কাছ থেকে বিভিন্ন প্রণোদনা আদায় করলেও শ্রমিকদের অধিকার, সুরক্ষা ও নিরাপত্তায় কোনো প্রকার পরিকল্পনা ও কার্যকর কৌশল প্রণয়ন করেনি। করোনা সংকটের প্রাথমিক পর্যায়ে শ্রমিকদের স্বার্থ বিবেচনায় না নিয়ে শুধু ব্যবসায়িক স্বার্থে আইনের অপব্যবহারের মাধ্যমে কারখানা লে-অফ ঘোষণার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। করোনা সংকটকালে ক্রেতা প্রতিষ্ঠানও শ্রমিক সুরক্ষার ওপর গুরুত্ব দেয়নি এবং দায়িত্ব এড়িয়ে গেছে; বরং কারখানা মালিকদের চাপ প্রদান ও নৈতিক ব্যবসা না করার প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। সর্বোপরি করোনা সংকটের কারণে দেশের তৈরি পোশাক খাত ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এ সংকট থেকে উত্তরণের জন্য এ খাতে সরকার বিপুল প্রণোদনা ও সহায়তা প্রদান করে; যার ক্ষুদ্র অংশই শ্রমিকদের কাছে পৌঁছেছে বলে দেখা যায়।

চতুর্থ অধ্যায়ে পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ মোকাবিলা নিয়ে তিনটি গবেষণার সারাংশ এবং একটি অবস্থানপত্র উপস্থাপিত হয়েছে। প্রথম প্রবন্ধে বন অধিদপ্তরের সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দেখা যায় বন আইনের (১৯২৭) কার্যকর প্রয়োগে প্রয়োজনীয় বিধিমালা, সম্পূরক আইন ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং ৯৩ বছরের পুরোনো আইনটি সংস্কারের জন্য কার্যকর কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। সংরক্ষিত বনভূমির চারপাশে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎসহ বৃহৎ প্রকল্প গ্রহণ, বনের জমি অবৈধ দখল, বনভূমির জমি বিভিন্ন উন্নয়ন কাজে বরাদ্দ এবং বনের স্থায়ী ক্ষতিরোধে বন অধিদপ্তরের কোনো ভূমিকা লক্ষ করা যায় না। বন সংরক্ষণ কার্যক্রমকে কম অগ্রাধিকার প্রদান করে বননির্ভর রাজস্ব ও আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডের সম্প্রসারণে অধিদপ্তর বেশি মনোযোগী। বনায়ন, বনভূমি সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পরিচালনা করা হচ্ছে না। অন্যদিকে বননির্ভর আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রথাগত ভূমি অধিকারহরণ, বন আইন লঙ্ঘন করে ও একতরফাভাবে সংরক্ষিত বন, বন্য প্রাণীর অভয়ারণ্য, জাতীয় উদ্যান ঘোষণাসহ উচ্ছেদের নামে বন অধিদপ্তর বৈষম্যমূলকভাবে জবরদখল করে বলে দেখা যায়। অধিদপ্তরের বিভিন্ন কার্যক্রম, যেমন রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্য অর্জন, বন সংরক্ষণ ও বনায়নকে কেন্দ্র করে দুর্নীতির বিস্তার ঘটেছে এবং তা প্রতিরোধে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ লক্ষ করা যায় না।

দ্বিতীয় প্রবন্ধে ঘূর্ণিঝড় আম্পানসহ সাম্প্রতিক কয়েকটি দুর্যোগের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে দুর্যোগ মোকাবিলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দেখা যায় দুর্যোগ মোকাবিলা ও ব্যবস্থাপনায় সুশাসন নিশ্চিতে মাঠপর্যায়ে পরিচালিত আগের গবেষণাগুলোর সুপারিশ আমলে না নেওয়া এবং তা বাস্তবায়ন না করায় সাম্প্রতিক দুর্যোগেও

আগের চিহ্নিত ঘাটতির পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার, জাতীয় আইন, নীতি এবং আদেশাবলি প্রতিপালনে কার্যকর উদ্যোগে ঘাটতি রয়েছে। দুর্যোগের পূর্বাভাস প্রচারে আন্তপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় না থাকায় কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রদান করা হয়, ফলে স্থানীয় পর্যায়ে জরুরি সতর্কবার্তা প্রচারেও ভুল-বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। দুর্যোগ সহনশীল অবকাঠামো (আশ্রয়কেন্দ্র, বাঁধ, রাস্তা ইত্যাদি) নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণে অনিয়ম, দুর্নীতির কারণে জনদুর্ভোগ এবং অর্থনৈতিক ক্ষতি বৃদ্ধি পেলেও অভিযুক্ত সংস্থা ও ব্যক্তিকে জবাবদিহির আওতায় আনতে কার্যকর পদক্ষেপের ঘাটতি রয়েছে। ত্রাণের চাহিদা যাচাই, উপকারভোগী নির্বাচন এবং বিতরণ কার্যক্রমে দুর্নীতি, অনিয়মসহ স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, ন্যায্যতা এবং জন অংশগ্রহণ নিশ্চিত না করায় প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তরা ত্রাণসহায়তা থেকে বঞ্চিত হয়। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা এবং আন্তপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ের ঘাটতির কারণে দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতির প্রকৃত হিসাব, ত্রাণের চাহিদা নিরূপণ ও সমন্বিত পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ণ করা হয় না এবং তদনুসারে বরাদ্দেও ঘাটতি থাকে। তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘমেয়াদি পুনর্বাসনের উদ্যোগ না নেওয়ায় অতিদরিদ্র শ্রেণির একটি অংশ বাস্তুচ্যুত হয়ে নিকটবর্তী শহরে এবং রাজধানীতে অভিবাসন করে। এ প্রবণতা অব্যাহত থাকলে পরবর্তী দুর্যোগের পর আরও নতুন জলবায়ুতাড়িত বাস্তুচ্যুতি এবং অভ্যন্তরীণ অভিবাসন বৃদ্ধির আশঙ্কা রয়েছে।

তৃতীয় প্রবন্ধে বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন অর্থায়ন ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ প্রবন্ধে দেখা যায় বাংলাদেশের ‘জাতীয় অনুমিত অবদানে’ (এনডিসি) প্রতিশ্রুত ১৫ শতাংশ প্রশমন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকারের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক উৎস থেকে তহবিল সংগ্রহে কোনো পথনকশা না থাকা এবং কার্যকর পদক্ষেপের অভাবে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক তহবিল হতে সরাসরি তহবিল সংগ্রহে জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলো কার্যকর অভিগম্যতা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। পরিবেশ সুরক্ষায় সাংবিধানিক অঙ্গীকার ও প্রশমনের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নবায়নযোগ্য উৎস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিনিয়োগ না করে বরং কয়লা ও এলএনজিভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে ব্যাপকভাবে বিনিয়োগ করা হচ্ছে। প্রশমন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা, জন অংশগ্রহণ ব্যবস্থা, স্থানীয়ভাবে প্রকল্পের চাহিদা এবং গুরুত্ব বিবেচনা না করে রাজনৈতিক বিবেচনায় প্রকল্পে অর্থায়ন, অনুমোদন এবং বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রশমন কার্যক্রমের স্থান ও সময়ভিত্তিক কোনো প্রাধিকার ক্রম নির্ধারিত না থাকার সুযোগে রাজনৈতিক প্রভাব ব্যবহার করে অনিয়ম-দুর্নীতির উদ্দেশ্যে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের প্রবণতা বিদ্যমান। প্রকল্প বাস্তবায়ন নীতি নিয়মিত লঙ্ঘন করলেও অভিযুক্ত সংস্থা বা ব্যক্তিবর্গকে জবাবদিহির আওতায় আনা হয়নি। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে প্রশমন প্রকল্প প্রণয়ন, অর্থায়ন, কার্যক্রম বাস্তবায়ন, তদারকি, নিরীক্ষা ও মূল্যায়নে সংশ্লিষ্ট আইএমইডি এবং মহাহিসাব নিরীক্ষকের অধিদপ্তরের সঙ্গে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিলের (বিসিসিটিএফ) মধ্যে আন্তপ্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ ও কোনো কার্যকর সমন্বয় ব্যবস্থা নেই।

এ অধ্যায়ের শেষ প্রবন্ধ হিসেবে যুক্তরাজ্যের গ্লাসগোতে কপ-২৬ জলবায়ু সম্মেলন উপলক্ষে কয়লাভিত্তিক জ্বালানি ব্যবহার বন্ধ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রসার ও প্রতিশ্রুত জলবায়ু অর্থায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রসঙ্গে টিআইবির অবস্থানপত্র উপস্থাপিত হয়েছে। এ অবস্থানপত্রে টিআইবি বাংলাদেশের পক্ষ থেকে কপ-২৬ সম্মেলনে উত্থাপনযোগ্য বেশ কিছু সুপারিশ প্রস্তাব করে, যার

মধ্যে জলবায়ুবিষয়ক নীতিনির্ধারণে জীবাশ্ম জ্বালানি কোম্পানিদের অনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করা, ২০৫০ সালের মধ্যে 'নেট জিরো' লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আইএনডিসিসহ প্রশমনবিষয়ক সব কার্যক্রমে উন্নত দেশগুলোর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা, ২০৫০ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য উৎস থেকে শতভাগ জ্বালানি উৎপাদনে উন্নত দেশগুলোকে পর্যাপ্ত জলবায়ু তহবিল, প্রযুক্তি হস্তান্তর ও কারিগরি সহায়তা প্রদানে ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরামের (সিভিএফ) পক্ষ থেকে সমন্বিতভাবে দাবি উত্থাপন করা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করে উন্নত দেশগুলোর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রতিবছর ১০০ বিলিয়ন ডলার জলবায়ু তহবিল প্রদান করা, জিসিএফসহ জলবায়ু তহবিলে অভিযোজনকে অগ্রাধিকার দিয়ে ক্ষতিপূরণের টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা, ক্ষয়ক্ষতি নির্ধারণ এবং এ-সংক্রান্ত প্রতিবেদন স্বচ্ছতার সঙ্গে প্রস্তুতে একটি গাইডলাইন তৈরি করা এবং ঝুঁকি বিনিময়ে বিমার পরিবর্তে অনুদানভিত্তিক ক্ষতিপূরণ প্রদান করা উল্লেখযোগ্য।

এ ছাড়া বাংলাদেশ সরকারের করণীয় হিসেবে যেসব সুপারিশ প্রস্তাব করা হয় তার মধ্যে ২০২১ সালের পরে নতুন কোনো প্রকার কয়লা জ্বালানিনির্ভর প্রকল্প অনুমোদন ও অর্থায়ন না করার ঘোষণা দেওয়া, নেট জিরো লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কপ-২৬ সম্মেলনে একটি আইনি সমঝোতা করতে সিভিএফের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিকভাবে শক্ত অবস্থান গ্রহণ করা, জীবন-জীবিকা, বন ও পরিবেশ এবং প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষায় কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রসহ বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ শিল্পায়ন কার্যক্রম স্থগিত করা, জ্বালানি খাতে স্বার্থের দ্বন্দ্ব সংশ্লিষ্টদের বাদ দিয়ে অন্তর্ভুক্তি ও অংশগ্রহণমূলক উপায়ে প্রস্তাবিত ইন্টিগ্রেটেড এনার্জি অ্যান্ড পাওয়ার মাস্টারপ্ল্যান (আইইপিএমপি) প্রণয়ন করা যেখানে কৌশলগতভাবে নবায়নযোগ্য জ্বালানিকে গুরুত্ব দেওয়া হবে, ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

এই সংকলনের গ্রন্থনা ও সম্পাদনা টিআইবির রিসার্চ এবং পলিসি বিভাগের সিনিয়র রিসার্চ ফেলো শাহজাদা এম আকরামের নেতৃত্বে সম্পন্ন হয়েছে। প্রকাশনাসংক্রান্ত কাজে বিশেষ সহায়তা দিয়েছেন আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগের কো-অর্ডিনেটর মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট কো-অর্ডিনেটর মাসুম বিল্লাহ। তাদেরসহ অন্যান্য বিভাগের সংশ্লিষ্ট সহকর্মী যারা নিজস্ব অবস্থানে থেকে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন, তাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। এ ছাড়া গবেষণা পরিচালনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট খাত ও প্রতিষ্ঠানের সব পর্যায়ের কর্মকর্তাসহ বিশেষজ্ঞ ও অংশীজন, যারা তথ্য প্রদানসহ বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন, তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

সংকলনটি বাংলাদেশে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথে চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণে আগ্রহী পাঠকের ভালো লাগবে, এই প্রত্যাশা করছি। এতে অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি প্রবন্ধে মূল গবেষণাপ্রসূত সুনির্দিষ্ট সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এসব সুপারিশ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করবে এবং যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে, টিআইবির এই প্রত্যাশা। সংকলন সম্পর্কে পাঠকের মন্তব্য ও পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

প্রথম অধ্যায়

শুদ্ধাচার ব্যবস্থা

তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ চর্চার মূল্যায়ন*

জুলিয়েট রোজেটি, ফাতেমা আফরোজ ও কুমার বিশ্বজিত দাস

প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশ সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে নাগরিকের চিন্তা, বিবেক ও বাক্‌স্বাধীনতাকে অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে; যার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ তথ্য অধিকার। জাতিসংঘের বিভিন্ন সনদেও তথ্য অধিকারের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যেমন জাতিসংঘের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার-সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সনদ ১৯৬৬ (অনুচ্ছেদ ১৯) এবং জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদ ২০০৫ [অনুচ্ছেদ ১০ (৩)]। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) ১৬-তে উল্লিখিত টেকসই উন্নয়নসহ সর্বস্তরে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে তথ্যে প্রবেশগম্যতা একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। এসডিজি ১৬ দশমিক ১০-এ সদস্যরাষ্ট্রগুলোকে তথ্য অধিকার আইন কার্যকর করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

বাংলাদেশে ২০০৯ সালে প্রণীত তথ্য অধিকার আইনে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এ আইনে প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ তাদের গৃহীত সিদ্ধান্ত, কার্যক্রম কিংবা সম্পাদিত বা প্রস্তাবিত কর্মকাণ্ডের সব তথ্য নাগরিকদের কাছে সহজলভ্য হয় এভাবে সূচিবদ্ধ করে প্রকাশ ও প্রচার করবে এমন বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরবর্তী সময়ে তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা, ২০১০ এবং স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা, ২০১৪ প্রণীত হয়। এই প্রবিধানমালা ও নির্দেশিকা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত এবং সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বা বিভাগ, অধিদপ্তর, সংস্থা ও এর আওতাভুক্ত কার্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত মেয়াদ ও পদ্ধতি অনুযায়ী স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশ, প্রচার ও হালনাগাদ করার নির্দেশনা দেওয়া হয়।

জনগণের তথ্য পাওয়ার অধিকারকে নিশ্চিত করার মাধ্যমে সুশাসন ও জবাবদিহি অর্জন করা টিআইবির একটি কৌশল। ‘তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯’ প্রণয়নে টিআইবি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে এবং আইনটির যথাযথ বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ অংশীজন হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করে এসেছে। ইতিপূর্বে টিআইবি স্থানীয় পর্যায়ের সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট পর্যবেক্ষণ করে ঘাটতি চিহ্নিতকরণ, স্ব-উদ্যোগে তথ্য প্রকাশ ও প্রচারকে উৎসাহিত করাসহ বিভিন্ন অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের এক দশক

---

* ২০২১ সালের ৫ আগস্ট ঢাকায় ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশিত গবেষণার সারসংক্ষেপ।

অতিক্রান্ত হলেও সংশ্লিষ্ট অংশীজনের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যায়ন বা সুনির্দিষ্ট গবেষণার ঘাটতি রয়েছে। উল্লেখ্য, গ্লোবাল রাইট টু ইনফরমেশন রেটিংয়ে ১২৪টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ২৬তম হলেও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশে অগ্রগতি এখনো উল্লেখযোগ্য নয়। সংশ্লিষ্ট মুখ্য প্রতিষ্ঠানগুলোয় তথ্য প্রকাশ চর্চার দৃষ্টান্ত এবং আধুনিক প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের ইতিবাচক প্রভাবকে বিবেচনায় রেখে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের চর্চার মূল্যায়ন করার লক্ষ্যে গবেষণাটির উদ্যোগ গৃহীত হয়। এই গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের ব্যাপ্তি ও মাত্রার তারতম্য পর্যবেক্ষণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অবস্থানের র‍্যাংকিং করা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

গবেষণার সার্বিক উদ্দেশ্য তথ্য অধিকার আইনের আওতাভুক্ত সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা। গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে:

- তথ্য প্রকাশ সংশ্লিষ্ট বিধি ও নির্দেশিকা অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট তথ্যগুলো ওয়েবসাইটের মাধ্যমে স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশের বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা।
- ওয়েবসাইটে তথ্য প্রকাশের অবস্থা পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানগুলোর র‍্যাংকিং করা।
- স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা।
- চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণে সুপারিশ প্রস্তাব করা।

গবেষণার পরিধি

তথ্য অধিকার আইনের আলোকে বাছাইকৃত জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট এ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত। সরকারের সব মন্ত্রণালয়সহ এদের অধিভুক্ত জনগণের সেবা প্রদান কার্যক্রমের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত বিভিন্ন বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তরসহ সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিওকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তথ্য প্রকাশ সংশ্লিষ্ট বিধি ও নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। তবে আইনগত বাধ্যবাধকতা নেই এমন তথ্য পর্যবেক্ষণ এই গবেষণার অন্তর্ভুক্ত নয়।

গবেষণাপদ্ধতি

তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি : এটি একটি মিশ্র পদ্ধতির গবেষণা, যেখানে গুণগত ও পরিমাণগত উভয় ধরনের তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহে প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট ও এর বিভিন্ন তথ্য পর্যবেক্ষণ এবং মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। পরোক্ষ তথ্যের জন্য সংশ্লিষ্ট নথি বা প্রতিবেদন, আইন, বিধি, ওয়েবসাইট ও সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হয়েছে।

সারণি ১ : গবেষণার তথ্যের ধরন, উৎস ও পদ্ধতি

তথ্যের ধরন	তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি	তথ্যদাতা/উৎস	তথ্য সংগ্রহের মাধ্যম
প্রত্যক্ষ তথ্য	ওয়েবসাইট জরিপ	নমুনায়িত প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে নির্দেশক অনুযায়ী বিভিন্ন তথ্য পর্যবেক্ষণ এবং বিভিন্ন ডিভাইস থেকে ওয়েবসাইটে অভিগম্যতা পর্যবেক্ষণ	চেকলিস্ট
	মুখ্য তথ্যদাতার সঙ্গে সাক্ষাৎকার	সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা	চেকলিস্ট
পরোক্ষ তথ্য	নথি পর্যালোচনা	সংশ্লিষ্ট নথি বা প্রতিবেদন, আইন, বিধি, ওয়েবসাইট ও সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিবেদন ইত্যাদি	-

প্রতিষ্ঠান নমুনায়নের শর্ত ও পদ্ধতি : সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান নমুনায়নের ক্ষেত্রে প্রথমে সব মন্ত্রণালয় ও বিভাগ; জনগণের সেবা প্রদান কার্যক্রমের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত মন্ত্রণালয় ও বিভাগের অধিভুক্ত বিভিন্ন অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, দপ্তর, বোর্ড, ব্যুরো; সাংবিধানিক/সংবিধিবদ্ধ/বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ট্রাস্ট, ফাউন্ডেশন, সংস্থা, পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির তালিকা তৈরি করা হয়েছে। এরপর তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের ধরন অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে। সবশেষে প্রতিটি শ্রেণি থেকে দৈবচয়নের ভিত্তিতে ন্যূনতম ৫০ শতাংশ প্রতিষ্ঠান নমুনায়ন করা হয়েছে।

অন্যদিকে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নমুনায়নের ক্ষেত্রে প্রথমে এনজিওবিষয়ক ব্যুরো থেকে জানুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য অনুযায়ী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোর মধ্যে সর্বাধিক অনুদানপ্রাপ্ত (বৈদেশিক অনুদানের ভিত্তিতে) ১০০টি এনজিওর তালিকা সংগ্রহ করা হয়েছে। এরপর এই তালিকা থেকে দৈবচয়নের ভিত্তিতে নমুনায়ন (সেবা ও অধিপরামর্শ প্রদানকারী উভয় ধরনের এনজিও) করা হয়েছে (সারণি ২)। তবে প্রাপ্যতার ভিত্তিতে সরকারি ১৫৩টি প্রতিষ্ঠান ও ৩৯টি এনজিওর, মোট ১৯২টি প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটের ওপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

সারণি ২ : নমুনায়ন

নমুনায়িত প্রতিষ্ঠানের ধরন	তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের (সংখ্যা)	নমুনায়িত প্রতিষ্ঠান (সংখ্যা)
মন্ত্রণালয় ও বিভাগ	৫৭	৪৯*
মন্ত্রণালয় ও বিভাগের অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠান (অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, দপ্তর, বোর্ড, ব্যুরো)	৯০	৪৯

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন...

নমুনায়িত প্রতিষ্ঠানের ধরন	তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের (সংখ্যা)	নমুনায়িত প্রতিষ্ঠান (সংখ্যা)
সাংবিধানিক/ সংবিধিবদ্ধ/ বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান (কমিশন, কর্তৃপক্ষ, করপোরেশন)	৫৮	২৯
সরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ট্রাস্ট, ফাউন্ডেশন, সংস্থা ও লিমিটেড কোম্পানি	৪৪	৩১
এনজিও	১০০	৪৯**
মোট	৩৪৯	২০৭

** সব মন্ত্রণালয় (৪০টি) নমুনায় অন্তর্ভুক্ত।*

*** জাতীয় ২৭টি ও আন্তর্জাতিক ২২টি।*

বিশ্লেষণ কাঠামো

গবেষণায় ব্যবহৃত নির্দেশকগুলো মোট তিনটি ক্ষেত্রে বিভক্ত করা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯, তথ্য প্রকাশ ও প্রচার প্রবিধানমালা ২০১০ এবং স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা ২০১৪ অনুযায়ী গবেষণার নির্দেশকগুলো নির্ধারণ করা হয়েছে।

সারণি ৩ : গবেষণার ক্ষেত্র ও নির্দেশক

ক্ষেত্র	নির্দেশক
তথ্যের ব্যাপ্তি	১. স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা ২. দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তার নাম, পদবি ও যোগাযোগের নম্বর ৩. আপিল কর্মকর্তার নাম, পদবি ও যোগাযোগের নম্বর ৪. অভিযোগ দায়ের করার জন্য তথ্য কমিশনের কর্মকর্তাদের নাম, পদবি ও যোগাযোগের নম্বর ৫. সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীর নাম, পদবি ও যোগাযোগের নম্বর ৬. সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীর ক্ষমতা ও দায়িত্ব ৭. প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও দায়িত্ব ৮. প্রশাসনিক কার্যক্রমের তালিকা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগ ৯. পরামর্শক কমিটির সভার সিদ্ধান্ত ১০. সংশ্লিষ্ট আইন, বিধিবিধান ১১. সংশ্লিষ্ট নির্দেশনা, নীতিমালা, ম্যানুয়াল ১২. বার্ষিক প্রতিবেদন ১৩. বাজেট বরাদ্দ বা পরিকল্পনা ১৪. নিরীক্ষা প্রতিবেদন ১৫. সেবার ফি, সেবাপ্রাপ্তির পদ্ধতি ও সময়সীমার বিস্তারিত বিবরণ

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন...

ক্ষেত্র	নির্দেশক
	১৬. নাগরিক সনদ ১৭. মহামারি বা প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন তথ্য ১৮. তথ্যপ্রাপ্তির আবেদনের মাধ্যমে প্রদানকৃত তথ্যের হালনাগাদ বিবরণ ১৯. সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সেবা বা কার্যক্রম সম্পর্কে অভিযোগ দায়ের, নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তথ্য
তথ্যে প্রবেশগম্যতা	১. সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে বা পোর্টালে প্রকাশিত তথ্যে সহজে প্রবেশগম্যতা ২. যেকোনো ডিভাইসের মাধ্যমে প্রবেশগম্যতা ৩. নথিতে ব্যবহৃত ফন্ট বা ছবির প্রাপ্যতা ৪. নথিগুলো ডাউনলোড-সম্পর্কিত সুবিধা
তথ্যের উপযোগিতা	১. তথ্য প্রকাশের সময় ও তথ্য হালনাগাদকরণ ২. তথ্যের ব্যবহার উপযোগিতা

ক্ষেত্র ও নির্দেশকভেদে প্রতিষ্ঠানগুলোর স্কোরিং

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে স্কোরিং করা হয়েছে। নির্ধারিত তিনটি ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত মোট ২৫টি নির্দেশকে (তথ্যের ব্যাপ্তিতে ১৯টি, প্রবেশগম্যতায় ৪টি ও উপযোগিতায় ২টি নির্দেশক) তথ্য প্রকাশের মাত্রা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। প্রতিটি নির্দেশকের জন্য পূর্বনির্ধারিত শর্ত বা কোড অনুযায়ী (উচ্চ = ২; মধ্যম = ১; নিম্ন = ০ স্কেলে) স্কোর দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে মোট স্কোর পাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের প্রযোজ্য সবগুলো নির্দেশকের স্কোর যোগ করা হয়েছে। কোনো প্রতিষ্ঠানের সার্বিক মোট স্কোর পাওয়ার জন্য সবগুলো নির্দেশকের স্কোর করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের মোট সর্বোচ্চ স্কোরের (২৫টি নির্দেশকে সর্বোচ্চ মোট স্কোর ৫০) সাপেক্ষে প্রাপ্ত স্কোরের শতকরা হার বের করা হয়েছে। কোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য কোনো নির্দেশক প্রযোজ্য না হলে সেই নির্দেশকে কোনো স্কোর দেওয়া হয়নি এবং তা মোট স্কোর ও শতকরা হার থেকে বাদ রাখা হয়েছে। তবে এসব ক্ষেত্রে সব নির্দেশকের ভর বিবেচনায় সার্বিক স্কোর নিরূপণ করা হয়েছে। প্রাপ্ত চূড়ান্ত স্কোরের শতকরা হারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানের গ্রেডিং করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে তিনটি গ্রেডিংকে (সন্তোষজনক, অপর্যাপ্ত, উদ্বেগজনক) তিনটি রঙের মাধ্যমে (সবুজ, হলুদ ও লাল) উপস্থাপন করা হয়েছে (সারণি ৪)।

সারণি ৪ : প্রতিষ্ঠানের গ্রেডিং

গ্রেডিং	প্রাপ্ত স্কোরের শতকরা হার	ব্যবহৃত রং
সন্তোষজনক	৬৭% - ১০০%	সবুজ
অপর্যাপ্ত	৩৪% - ৬৬%	হলুদ
উদ্বেগজনক	০%- ৩৩%	লাল

তথ্য সংগ্রহকাল

আগস্ট ২০২০ থেকে জানুয়ারি ২০২১ পর্যন্ত সময়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। পরে সে সব তথ্য যাচাই-বাছাই করে এ প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

তথ্য প্রকাশে গৃহীত প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে তথ্য প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। এ ছাড়া তথ্য প্রাপ্তির আবেদন গ্রহণ এবং নিজস্ব ওয়েবসাইটে স্ব-উদ্যোগে প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার এটুআই প্রকল্পের কারিগরি সহায়তায় ২০১০ সালে জেলা তথ্য বাতায়নের মাধ্যমে তথ্য প্রকাশ কার্যক্রমের সূচনা করে। পরে ২০১৪ সালে জাতীয় পর্যায় থেকে ইউনিয়ন পর্যন্ত সরকারি ও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব প্রতিষ্ঠানের জন্য 'ন্যাশনাল পোর্টাল ফরম্যাট' নামে অভিন্ন কাঠামো তৈরি করা হয়। তথ্যে অভিগম্যতা বৃদ্ধিতে কিছু প্রাতিষ্ঠানিক চর্চার দৃষ্টান্তও দেখা যায়। যেমন বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে তথ্য প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের পাশাপাশি তথ্যপ্রাপ্তির আবেদন গ্রহণ এবং নিজস্ব ওয়েবসাইটে স্ব-উদ্যোগে প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ করা হচ্ছে। তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তার তালিকা, প্রয়োজনীয় ফরম্যাট এবং কমিশনের কার্যক্রমের নিয়মিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। জাতীয় ওয়েব পোর্টালের 'জেলা তথ্য বাতায়ন'-এর মাধ্যমেও বিভিন্ন তথ্য প্রকাশিত হচ্ছে। সরকারি প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটের পাশাপাশি বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ নিজস্ব ওয়েবসাইটে স্ব-উদ্যোগে প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণসহ 'তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা' প্রণয়ন করেছে ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ করছে।

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি

এই গবেষণায় প্রাপ্যতার ভিত্তিতে সরকারি ১৫৩টি প্রতিষ্ঠান ও ৩৯টি এনজিও, মোট ১৯২টি প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটের ওপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এই গবেষণায় নমুনায়িত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৭৬ শতাংশ সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং ২৪ শতাংশ এনজিও। সরকারি ও আইনের আওতাভুক্ত স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ মন্ত্রণালয় ও বিভাগ (৩১ শতাংশ); মন্ত্রণালয়ের অধিভুক্ত বিভাগীয় প্রতিষ্ঠান (৩১ শতাংশ), সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান (১৮ দশমিক ৪ শতাংশ) এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান (সংস্থা, ট্রাস্ট, ফাউন্ডেশন, পাবলিক কোম্পানি ইত্যাদি) (১৯ দশমিক ৬ শতাংশ)। অন্যদিকে এনজিওর মধ্যে ৪৪ শতাংশ আন্তর্জাতিক পর্যায়ের এবং ৬৬ শতাংশ জাতীয় পর্যায়ের এনজিও। এনজিওদের কাজের ধরন অনুযায়ী, নমুনায়িত এনজিওর মধ্যে ২২ দশমিক ২ শতাংশ এনজিও শুধু সেবা কার্যক্রম, ১৫ দশমিক ৬ শতাংশ এনজিও শুধু অধিপরামর্শ কার্যক্রম এবং ৬২ দশমিক ২ শতাংশ এনজিও এই উভয় ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সার্বিকভাবে নমুনায়িত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ৯২ দশমিক ৮ শতাংশ প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট রয়েছে, ৭ দশমিক ২ শতাংশ প্রতিষ্ঠানের কোনো ওয়েবসাইট পাওয়া

যায়নি। সরকারি প্রতিষ্ঠানের ৩ দশমিক ২ শতাংশ এবং এনজিওদের ২০ শতাংশের কোনো ওয়েবসাইট পাওয়া যায়নি।

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর স্কোর

নমুনায় অন্তর্ভুক্ত সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে প্রায় ৩৭ শতাংশ প্রতিষ্ঠান সন্তোষজনক (৬৭ শতাংশের ওপর) স্কোর পেয়েছে; প্রায় ৮ দশমিক ৫ শতাংশ সরকারি প্রতিষ্ঠানের স্কোর উদ্বেগজনক। পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী প্রথম দশটি র‍্যাংক বা অবস্থানে রয়েছে ৬৯টি প্রতিষ্ঠান, যাদের প্রাপ্ত স্কোর ৩৩ থেকে ৪২-এর মধ্যে। প্রথম স্থানে সার্বিকভাবে ৪২ স্কোর (৮৪ শতাংশ) পেয়ে যুগ্মভাবে রয়েছে খাদ্য মন্ত্রণালয়, পাট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয় এবং পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়। দ্বিতীয় স্থানে মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং তৃতীয় স্থানে রয়েছে যুগ্মভাবে কৃষি মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সেতু বিভাগ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়- মাদ্রাসা বোর্ড, শিল্প মন্ত্রণালয় ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়। সার্বিকভাবে সরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সর্বনিম্ন ৪ স্কোর (৮ শতাংশ) পেয়েছে আন্তঃবাহিনী নির্বাচন পর্ষদ। কোনো এনজিওই প্রথম ১০ অবস্থানে নেই। যুগ্মভাবে বেশ কয়েকটি করে প্রতিষ্ঠান একই স্কোর পেয়ে একই র‍্যাংকে অবস্থান করছে।

অন্যদিকে কোনো এনজিওই সন্তোষজনক স্কোর পায়নি; ৯৪ দশমিক ৯ শতাংশ এনজিওর স্কোর উদ্বেগজনক। এনজিওগুলোর মধ্যে প্রথম ১০টি অবস্থানে রয়েছে ১৯টি প্রতিষ্ঠান, যেগুলোর প্রাপ্ত স্কোর ৭ থেকে ২২-এর মধ্যে। সর্বোচ্চ স্কোর ২২ (৪৪ শতাংশ) পেয়ে প্রথম স্থানে আছে একটি জাতীয় পর্যায়ের এনজিও–কোস্টাল অ্যাসোসিয়েশন ফর সোশ্যাল ট্রান্সফরমেশন, দ্বিতীয় অবস্থানে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে গণউন্নয়ন কেন্দ্র। প্রথম ১০টি অবস্থানের মধ্যে ৬টি আন্তর্জাতিক এনজিও এবং তালিকার বাকি সব ওয়েবসাইট জাতীয় পর্যায়ের এনজিওর।

উদ্বেগজনক গ্রেডিংপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে গড় স্কোর ৮ (শতকরা হার ১৫), অপর্যাপ্ত গ্রেডিংপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে গড় স্কোর ২৭ (শতকরা হার ৫৪) এবং সন্তোষজনক গ্রেডিংপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে গড় স্কোর ৩৭ (শতকরা হার ৭৫)।

সার্বিকভাবে দেখা যায়, অধিকাংশ সরকারি প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট এনজিওর থেকে তুলনামূলক ভালো স্কোর পেয়েছে। অধিকাংশ সরকারি প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটের ডিজাইন ও প্রকাশিত তথ্যের ধরন খুব কাছাকাছি। কিন্তু এনজিওর ক্ষেত্রে এ রকম একক কোনো ডিজাইন বা ফরম্যাট দেখা যায় না। এ ছাড়া এখনো এনজিওর ক্ষেত্রে আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশের চর্চা ও দৃষ্টান্তের ঘাটতি লক্ষণীয়।

নমুনায়িত প্রতিষ্ঠানের ধরনভেদে ও নির্দেশকের ক্ষেত্রভেদে গ্রেডিং

নমুনায়িত প্রতিষ্ঠানের ধরনভেদে দেখা যায়, মন্ত্রণালয় ও বিভাগের অধিকাংশ ওয়েবসাইট সন্তোষজনক গ্রেডিংয়ে রয়েছে। অন্যান্য সরকারি ও আইনের আওতাভুক্ত স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান অপর্যাপ্ত অবস্থায় থাকলেও অধিকাংশ এনজিওর গ্রেডিং উদ্বেগজনক।

সারণি ৫ : প্রতিষ্ঠানের ধরনভেদে সার্বিকভাবে গ্রেডিং (প্রতিষ্ঠানের শতকরা হার)

প্রতিষ্ঠানের ধরন	সন্তোষজনক (৬৭-১০০)%	অপর্যাপ্ত (৩৪-৬৬)%	উদ্বেগজনক (০-৩৩)%
মন্ত্রণালয় ও বিভাগ	৭৫.৫	২৪.৫	-
মন্ত্রণালয় ও বিভাগের অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠান	১৭.৪	৭৬.১	৬.৫
সাংবিধানিক/সংবিধিবদ্ধ/ বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান	৪০.৭	৪৮.১	১১.২
সরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত *সংস্থা, ট্রাস্ট, ফাউন্ডেশন, পাবলিক কোম্পানি ইত্যাদি*	৩.২	৭৪.২	২২.৬
এনজিও	-	৫.১	৯৪.৯
সার্বিক	৩০.৬	৪৪.০	২৫.৪

নমুনায়িত সব প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে তথ্যের ব্যাপ্তি, প্রবেশগম্যতা ও উপযোগিতার পরিপ্রেক্ষিতে সার্বিকভাবে সর্বোচ্চ ৪৪ দশমিক ৩ শতাংশ প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটের অবস্থা অপর্যাপ্ত, যেখানে ওয়েবসাইটগুলো ৩৪-৬৬ শতাংশ স্কোর পেয়েছে।

চিত্র ১ : গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্ত গ্রেডিংয়ের বিন্যাস

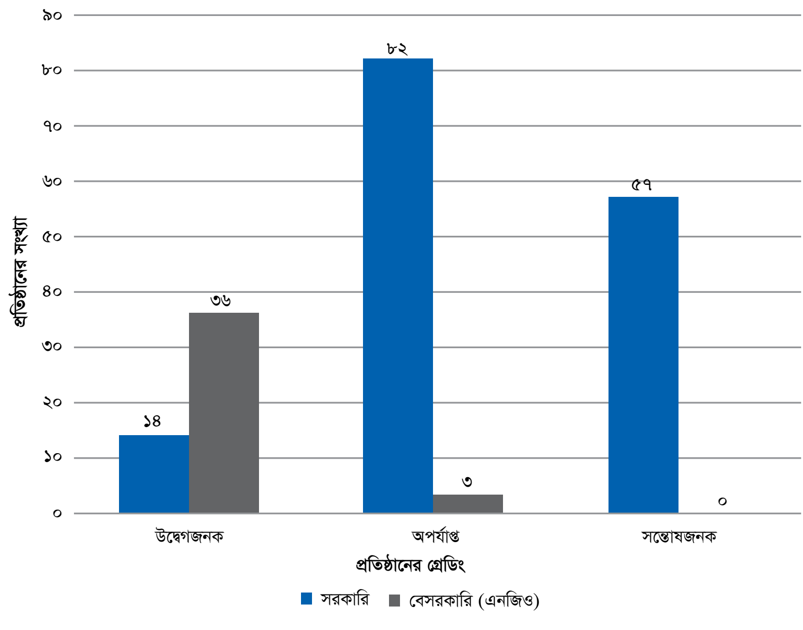

সারণি ৬ : ক্ষেত্রভেদে নমুনায়িত সব প্রতিষ্ঠানের গ্রেডিং (প্রতিষ্ঠানের শতকরা হার)

ক্ষেত্র	সন্তোষজনক (৬৭-১০০)%	অপর্যাপ্ত (৩৪-৬৬)%	উদ্বেগজনক (০-৩৩)%
তথ্যের ব্যাপ্তি	২২.৮	৪৫.৬	৩১.৬
তথ্যে প্রবেশগম্যতা	৭৭.২	২১.২	১.৬
তথ্যের উপযোগিতা	০.৬	৬৪.২	৩৫.২
সার্বিক	৩০.৭	৪৪.৩	২৫.০

নির্দেশকের ধরনভেদে প্রতিষ্ঠানের তথ্য প্রকাশের ব্যাপ্তি ও মাত্রা

নমুনায়িত সরকারি প্রতিষ্ঠানের তথ্যের ব্যাপ্তির ক্ষেত্রে নির্দেশকগুলোর মধ্যে ১১টি নির্দেশকে ৫০ শতাংশ বা তার অধিক প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটের স্কোর উচ্চ, মাত্র একটি নির্দেশকে ৭৬ দশমিক ৫ শতাংশ প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটের স্কোর মধ্যম এবং ৫টি নির্দেশকে ৫০ শতাংশ বা তার অধিক প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটের স্কোর নিম্ন। অন্যদিকে, একটি ব্যতীত সব নির্দেশকগুলোয় অধিকাংশ এনজিওর প্রাপ্ত স্কোর নিম্ন এবং এই নির্দেশকগুলোর মধ্যে ৫টি নির্দেশকে সরকারি অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটের স্কোরও নিম্ন।

নির্দেশকের ধরনভেদে সরকরি ও এনজিওর ওয়েবসাইটে তথ্য প্রকাশের মাত্রা বিশ্লেষণে দেখা যায়, প্রাতিষ্ঠানিক ও সেবা-সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশের মাত্রা অধিকাংশ সরকারি প্রতিষ্ঠানের (যথাক্রমে ৫৪ দশমিক ৯ এবং ৫৯ দশমিক ৪ শতাংশ) ওয়েবসাইটে সন্তোষজনক। ব্যবস্থাপনা-সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ অধিকাংশ সরকারি প্রতিষ্ঠানে (৪৫ দশমিক ৮ শতাংশ) অপর্যাপ্ত এবং কার্যক্রম ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ-সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশের মাত্রা অধিকাংশ সরকারি প্রতিষ্ঠানে (৫৪ দশমিক ২ শতাংশ) উদ্বেগজনক। অধিকাংশ এনজিওর (৮০ শতাংশের অধিক) ওয়েবসাইটে নির্দেশকের ধরনভেদে সব ধরনের তথ্য প্রকাশের মাত্রা উদ্বেগজনক।

কোভিড-সংশ্লিষ্ট কোনো সরাসরি সেবা বা সম্পৃক্ততা যেসব প্রতিষ্ঠানে নেই তারা তাদের ওয়েবসাইটে সেভাবে সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য দেয়নি। তবে সরকারের সাধারণ নির্দেশনা হোম পেজে প্রদর্শিত হয়েছে। সরকারের সাধারণ নির্দেশনার পাশাপাশি যেসব প্রতিষ্ঠানের (স্বাস্থ্যসেবা, বেসরকারি বিমান চলাচল, পর্যটন ইত্যাদি) ওয়েবসাইটে সরাসরি কোভিড-সম্পর্কিত প্রদেয় সেবা বা কোনো নির্দেশনা প্রদর্শিত হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে কোনো নিয়ন্ত্রণমূলক নীতি সরকারের পক্ষ থেকে ছিল না। এনজিওর ক্ষেত্রে কোভিডের কারণে ফিল্ড থেকে তথ্য সংগ্রহ সমস্যা হওয়ায় তথ্য হালনাগাদ বাধাগ্রস্ত হয়েছে। মাঠপর্যায়ে যাতায়াত বন্ধ থাকায় অনেক কার্যক্রম ব্যাহত হয়েছে। তবে এখন পরিবর্তিত পরিস্থিতি বিবেচনায় বিভিন্নভাবে তথ্য হালনাগাদের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

সারণি ৭ : একনজরে প্রতিষ্ঠানের ধরনভেদে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের চর্চা ও চ্যালেঞ্জ

প্রতিষ্ঠানের ধরন	সম্ভাবনা	চ্যালেঞ্জ
সরকারি প্রতিষ্ঠান	• ওয়েবসাইটের বাইরে অফিস প্রাঙ্গণে বোর্ড, সিটিজেন চার্টার, বিভিন্ন প্রকাশনার মাধ্যমে তথ্য প্রকাশ • সোশ্যাল নেটওয়ার্ক (ফেসবুক), পোস্টার, বিলবোর্ড, লিফলেট ইত্যাদির মাধ্যমেও তথ্য প্রকাশ • প্রায় সব প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটের ডিজাইন একই রকম, যেখানে বিধিমালা ও নির্দেশিকা অনুযায়ী তথ্যের ধরন বিন্যস্ত • তথ্য প্রকাশ ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়ের জন্য অধিকাংশ দপ্তরে দায়িত্বপ্রাপ্ত আইটি/ এমআইএস টিম	• হালনাগাদ তথ্য নির্দিষ্ট আইকনে আপলোড করার ক্ষেত্রে কার্যকর তদারকির ঘাটতি • সমন্বয়ের মাধ্যমে তথ্য সরবরাহ ও আপলোড নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে উদ্যোগের ঘাটতি • ওয়েবসাইটে তথ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে তথ্য কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ততা তুলনামূলক কম • অনেক ক্ষেত্রে আইটি বিভাগে ওয়েবসাইটের জন্য নির্দিষ্ট কর্মী না থাকা; যারা থাকেন, তাদের অনেকের দক্ষতার ঘাটতি
বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (এনজিও)	• বার্ষিক প্রতিবেদন, কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ড, লিফলেট, ব্রোসিওর ইত্যাদির মাধ্যমে তথ্য প্রকাশ • কাজের বিস্তারিত প্রতিবেদন ডিসির কার্যালয়ে প্রতি মাসে এবং প্রতিবছরে জমা প্রদান	• অধিকাংশ ওয়েবসাইট ইংরেজিতে; তবে কোনো কোনো এনজিওর কিছু তথ্য বাংলায় উপস্থাপিত • আন্তর্জাতিক এনজিওর নিজস্ব ও পৃথক ওয়েবসাইটের ঘাটতি • আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ কার্যক্রমের জন্য আন্তর্জাতিক ওয়েবসাইটের পেজে বিধি অনুযায়ী তথ্যের ধরন/ প্রকার অনুসরণ করার ক্ষেত্রে ঘাটতি

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন...

প্রতিষ্ঠানের ধরন	সম্ভাবনা	চ্যালেঞ্জ
	• কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে নতুন ওয়েবসাইট তৈরির কাজ চলমান, যা আরও তথ্যবহুল করার পরিকল্পনা	• ওয়েবসাইটে তথ্য প্রকাশের বিধিমালা সম্পর্কে অধিকাংশ এনজিওর তথ্য কর্মকর্তার ওয়াকিবহাল না থাকা; ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকেও নির্দেশনার ঘাটতি • অনেক ক্ষেত্রে ওয়েবসাইট ব্যবস্থাপনায় আইটি বিভাগের দক্ষতার ঘাটতি • কাজের বিস্তারিত প্রতিবেদন ডিসির কার্যালয়ে প্রতি মাসে এবং প্রতিবছরে জমা প্রদানের অজুহাতে ওয়েবসাইটে এসব তথ্য প্রকাশে উদ্যোগের ঘাটতি

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

এ গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, ওয়েবসাইটের মাধ্যমে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশে অগ্রগতি যথেষ্ট সন্তোষজনক নয়। তথ্যের প্রবেশগম্যতার ক্ষেত্রে ইতিবাচক অবস্থা লক্ষ করা গেলেও তথ্যের ব্যাপ্তি ও উপযোগিতার ক্ষেত্রে সব ধরনের প্রতিষ্ঠানে কার্যকর উদ্যোগ বাস্তবায়ন প্রয়োজন। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর ওয়েবসাইটে বিধিমালা অনুযায়ী অনেক তথ্য প্রকাশিত হলেও তথ্যের হালনাগাদকরণ এবং ধরন অনুযায়ী তথ্যের বিন্যাস, বিস্তৃতি ও সহজলভ্য তথ্যপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে এখনো ঘাটতি বিদ্যমান। অন্যদিকে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর ওয়েবসাইটে বিধিমালা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্যের ঘাটতি লক্ষণীয়। এ ছাড়া ওয়েবসাইটে তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোয় প্রয়োজনীয় ধারণার ঘাটতিও লক্ষণীয়।

সার্বিকভাবে বলা যায়, স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ও প্রচার এখনো প্রাতিষ্ঠানিকভাবে গুরুত্ব পাচ্ছে না। স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ও প্রচারকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে সরকার, নাগরিক সমাজ, বেসরকারি সংগঠন ও গণমাধ্যমের সমন্বিত প্রচারণাসহ প্রয়োজনীয় উদ্যোগের ঘাটতি লক্ষণীয়। আইন ও বিভিন্ন বিধিমালার মাধ্যমে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করা হলেও তার চর্চা আরও কার্যকর এবং জনমুখী করার সুযোগ রয়েছে।

সুপারিশ

তথ্যের ব্যাপ্তি বৃদ্ধিসংক্রান্ত সুপারিশ

১. কর্তৃপক্ষকে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ও প্রচার নির্দেশিকা প্রণয়ন এবং ওয়েবসাইটে তা প্রকাশ করতে হবে। নির্দেশিকার কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে তদারকি বৃদ্ধি করতে হবে।

২. বিধি অনুযায়ী নিম্নলিখিত তথ্য গুরুত্বসহকারে প্রকাশে আরও উদ্যোগী হতে হবে -

- সিদ্ধান্ত গ্রহণ-প্রক্রিয়া
- সেবা ও সেবা প্রদানকারীর তথ্য
- কর্মকর্তা-কর্মচারীর ক্ষমতা ও দায়িত্ব
- সভার সিদ্ধান্ত
- বার্ষিক বাজেট
- নিরীক্ষা প্রতিবেদন
- তথ্যপ্রাপ্তির আবেদনের মাধ্যমে কতজন, কী ধরনের তথ্য চেয়েছে, তার হালনাগাদ তথ্য।

৩. তথ্য অধিকার আইন কার্যকর হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত প্রাপ্ত আবেদনকৃত তথ্যের ধরন বিশ্লেষণের ভিত্তিতে তথ্যের ঘাটতি চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় তথ্য সংরক্ষণের ও তা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত তথ্য ও কার্যক্রম-সম্পর্কিত অভিযোগ দায়েরের জন্য ওয়েবপেজে সুনির্দিষ্ট স্থান রাখতে হবে এবং অনলাইনের মাধ্যমে কার্যকর নিষ্পত্তি ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

তথ্যে প্রবেশগম্যতা বৃদ্ধিসংক্রান্ত সুপারিশ

৫. ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য ইংরেজির পাশাপাশি বাংলায় ও নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রচলিত ফন্টে (ইউনিকোড) প্রকাশ করতে হবে।

৬. ওয়েবসাইট ব্যবস্থাপনা বিভাগের জনবলের কারিগরি ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধি করতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হবে।

৭. এনজিও পর্যায়ে ওয়েবসাইটের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীসহ প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মকর্তাদের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ও প্রচার সম্পর্কে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে সুনির্দিষ্ট প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হবে।

তথ্যের উপযোগিতা বৃদ্ধিসংক্রান্ত সুপারিশ

৮. ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে এবং হালনাগাদকরণের তারিখ উল্লেখ করতে হবে।

৯. প্রতিবন্ধীদের সংশ্লিষ্ট সেবা-সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য প্রকাশ করতে হবে; ওয়েবসাইটকে প্রতিবন্ধীবান্ধব করার উদ্দেশ্যে ভয়েস অ্যাকটিভেটেড ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।

সার্বিক সমন্বয়সংক্রান্ত সুপারিশ

১০. প্রাতিষ্ঠানিক স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে তথ্য কমিশনসহ তথ্য অধিকার অ্যাকটিভিস্ট ও গণমাধ্যমের পক্ষ থেকে সমন্বিত প্রচারণার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ বৃদ্ধি করতে হবে।

১১. তথ্য প্রকাশ ও প্রচারে প্রযুক্তির কার্যকর ব্যবহার, প্রতিষ্ঠানগুলোর দক্ষতা ও সংগতি পর্যবেক্ষণের জন্য তথ্য কমিশনের ক্ষমতা ও তদারকি বাড়াতে হবে। তদারকি কার্যক্রমে নাগরিক সমাজ ও জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে।

পরিশিষ্ট: নমুনায়িত সব প্রতিষ্ঠানের র‍্যাংকিং

ক্রম	র‍্যাংকিং	প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রতিষ্ঠানের ধরন	প্রাপ্ত সার্বিক স্কোর	শতকরা হার
১.	১	খাদ্য মন্ত্রণালয়	সরকারি	৪২	৮৪
২.		পাট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয়	সরকারি	৪২	৮৪
৩.		পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সরকারি	৪২	৮৪
৪.	২	মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়	সরকারি	৪১	৮২
৫.	৩	কৃষি মন্ত্রণালয়	সরকারি	৪০	৮০
৬.		বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সরকারি	৪০	৮০
৭.		বাংলাদেশ সেতু বিভাগ	সরকারি	৪০	৮০
৮.		প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	সরকারি	৪০	৮০
৯.		শিক্ষা মন্ত্রণালয়-মাদ্রাসা বোর্ড	সরকারি	৪০	৮০
১০.		শিল্প মন্ত্রণালয়	সরকারি	৪০	৮০
১১.		সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	সরকারি	৪০	৮০
১২.	৪	বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩৯	৭৮
১৩.		সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩৯	৭৮
১৪.		ভূমি মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩৯	৭৮
১৫.		ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩৯	৭৮
১৬.		দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩৯	৭৮
১৭.		নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩৯	৭৮
১৮.		জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর	সরকারি	৩৯	৭৮
১৯.		ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ	সরকারি	৩৯	৭৮
২০.	৫	প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩৮	৭৬

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন...

ক্রম	র‍্যাংকিং	প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রতিষ্ঠানের ধরন	প্রাপ্ত সার্বিক স্কোর	শতকরা হার
২১.		অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	সরকারি	৩৮	৭৬
২২.		পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	সরকারি	৩৮	৭৬
২৩.		তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিভাগ	সরকারি	৩৮	৭৬
২৪.		সমাজসেবা অধিদপ্তর	সরকারি	৩৮	৭৬
২৫.		যৌথ মূলধনী কোম্পানি ও ফার্মস নিবন্ধক	সরকারি	৩৮	৭৬
২৬.		রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	সরকারি	৩৮	৭৬
২৭.		বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন	সরকারি	৩৮	৭৬
২৮.	৬	পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩৭	৭৪
২৯.		রেলপথ মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩৭	৭৪
৩০.		বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩৭	৭৪
৩১.		দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	সরকারি	৩৭	৭৪
৩২.		শিশুকল্যাণ ট্রাস্ট	সরকারি	৩৭	৭৪
৩৩.	৭	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩৬	৭২
৩৪.		পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩৬	৭২
৩৫.		শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩৬	৭২
৩৬.		ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩৬	৭২
৩৭.		বিদ্যুৎ বিভাগ	সরকারি	৩৬	৭২
৩৮.		স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ	সরকারি	৩৬	৭২
৩৯.		নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর	সরকারি	৩৬	৭২
৪০.		পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর	সরকারি	৩৬	৭২
৪১.		ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের কার্যালয়	সরকারি	৩৬	৭২

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন...

ক্রম	র‍্যাংকিং	প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রতিষ্ঠানের ধরন	প্রাপ্ত সার্বিক স্কোর	শতকরা হার
৪২.		বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন করপোরেশন	সরকারি	৩৬	৭২
৪৩.	৮	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয় (জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিভাগ)	সরকারি	৩৫	৭০
৪৪.		অর্থ মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩৫	৭০
৪৫.		যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩৫	৭০
৪৬.		চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ	সরকারি	৩৫	৭০
৪৭.		বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন	সরকারি	৩৫	৭০
৪৮.		বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস করপোরেশন	সরকারি	৩৫	৭০
৪৯.		তথ্য কমিশন	সরকারি	৩৫	৭০
৫০.	৯	তথ্য মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩৪	৬৮
৫১.		আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩৪	৬৮
৫২.		পরিকল্পনা বিভাগ	সরকারি	৩৪	৬৮
৫৩.		সড়ক পরিবহন ও সহাসড়ক বিভাগ	সরকারি	৩৪	৬৮
৫৪.		শ্রম অধিদপ্তর	সরকারি	৩৪	৬৮
৫৫.		বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড	সরকারি	৩৪	৬৮
৫৬.		বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ	সরকারি	৩৪	৬৮
৫৭.		টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	সরকারি	৩৪	৬৮
৫৮.	১০	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩৩	৬৬
৫৯.		কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর	সরকারি	৩৩	৬৬
৬০.		বন অধিদপ্তর	সরকারি	৩৩	৬৬

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন...

ক্রম	র‍্যাংকিং	প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রতিষ্ঠানের ধরন	প্রাপ্ত সার্বিক স্কোর	শতকরা হার
৬১.		ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	সরকারি	৩৩	৬৬
৬২.		টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর	সরকারি	৩৩	৬৬
৬৩.		প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়	সরকারি	৩৩	৬৬
৬৪.		বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড	সরকারি	৩৩	৬৬
৬৫.		বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড	সরকারি	৩৩	৬৬
৬৬.		ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স	সরকারি	৩৩	৬৬
৬৭.		বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেড	সরকারি	৩৩	৬৬
৬৮.		বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট	সরকারি	৩৩	৬৬
৬৯.		বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	সরকারি	৩৩	৬৬
৭০.	১১	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩২	৬৪
৭১.		মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩২	৬৪
৭২.		মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ	সরকারি	৩২	৬৪
৭৩.		খাদ্য অধিদপ্তর	সরকারি	৩২	৬৪
৭৪.		বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর	সরকারি	৩২	৬৪
৭৫.		এনজিওবিষয়ক ব্যুরো	সরকারি	৩২	৬৪
৭৬.		বাংলাদেশ টেলিভিশন	সরকারি	৩২	৬৪
৭৭.		জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা	সরকারি	৩২	৬৪
৭৮.		পানিসম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা	সরকারি	৩২	৬৪
৭৯.		নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	সরকারি	৩২	৬৪
৮০.	১২	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩১	৬২
৮১.		ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩১	৬২
৮২.		মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩১	৬২

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন...

ক্রম	র‍্যাংকিং	প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রতিষ্ঠানের ধরন	প্রাপ্ত সার্বিক স্কোর	শতকরা হার
৮৩.		মৎস্য অধিদপ্তর	সরকারি	৩১	৬২
৮৪.		জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	সরকারি	৩১	৬২
৮৫.		জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো	সরকারি	৩১	৬২
৮৬.		ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড	সরকারি	৩১	৬২
৮৭.		বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন	সরকারি	৩১	৬২
৮৮.		ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন	সরকারি	৩১	৬২
৮৯.		দুর্নীতি দমন কমিশন	সরকারি	৩০	৬০
৯০.	১৩	গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩০	৬০
৯১.		শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর	সরকারি	৩০	৬০
৯২.		বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর	সরকারি	৩০	৬০
৯৩.		বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড	সরকারি	৩০	৬০
৯৪.		বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড	সরকারি	৩০	৬০
৯৫.		কৃষি তথ্য সার্ভিস	সরকারি	৩০	৬০
৯৬.	১৪	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সরকারি	২৯	৫৮
৯৭.		গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর	সরকারি	২৯	৫৮
৯৮.		স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	সরকারি	২৯	৫৮
৯৯.		বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর	সরকারি	২৯	৫৮
১০০.		রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো	সরকারি	২৯	৫৮
১০১.		বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ করপোরেশন	সরকারি	২৯	৫৮
১০২.	১৫	প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক	সরকারি	২৮	৫৬
১০৩.	১৬	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সরকারি	২৭	৫৪

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন...

ক্রম	র‍্যাংকিং	প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রতিষ্ঠানের ধরন	প্রাপ্ত সার্বিক স্কোর	শতকরা হার
১০৪.		বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর	সরকারি	২৭	৫৪
১০৫.		আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর	সরকারি	২৭	৫৪
১০৬.		বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো	সরকারি	২৭	৫৪
১০৭.		বাংলাদেশ কোস্টগার্ড	সরকারি	২৭	৫৪
১০৮.		বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড	সরকারি	২৭	৫৪
১০৯.		পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড	সরকারি	২৭	৫৪
১১০.		বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড	সরকারি	২৭	৫৪
১১১.	১৭	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সরকারি	২৬	৫২
১১২.		প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর	সরকারি	২৬	৫২
১১৩.		সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড	সরকারি	২৬	৫২
১১৪.		জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন	সরকারি	২৬	৫২
১১৫.	১৮	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর	সরকারি	২৫	৫০
১১৬.		ভূমি আপিল বোর্ড	সরকারি	২৫	৫০
১১৭.		বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ	সরকারি	২৫	৫০
১১৮.	১৯	আইন ও বিচার বিভাগ	সরকারি	২৪	৪৮
১১৯.		পাট অধিদপ্তর	সরকারি	২৪	৪৮
১২০.		জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন	সরকারি	২৪	৪৮
১২১.	২০	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	সরকারি	২৩	৪৬
১২২.		বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন করপোরেশন	সরকারি	২৩	৪৬

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন...

ক্রম	র‍্যাংকিং	প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রতিষ্ঠানের ধরন	প্রাপ্ত সার্বিক স্কোর	শতকরা হার
১২৩.		বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন	সরকারি	২৩	৪৬
১২৪.	২১	কারা অধিদপ্তর	সরকারি	২২	৪৪
১২৫.		নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড	সরকারি	২২	৪৪
১২৬.		বাংলাদেশ স্কাউটস	সরকারি	২২	৪৪
১২৭.		ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি	সরকারি	২২	৪৪
১২৮.		বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	সরকারি	২২	৪৪
১২৯.		কোস্টাল অ্যাসোসিয়েশন ফর সোশ্যাল ট্রান্সফরমেশন	এনজিও	২২	৪৪
১৩০.	২২	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড	সরকারি	২১	৪২
১৩১.		তদন্ত সংস্থা আন্তঅপরাধ ট্রাইব্যুনাল	সরকারি	২১	৪২
১৩২.	২৩	বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা	সরকারি	২০	৪০
১৩৩.		বেসরকারি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল	সরকারি	২০	৪০
১৩৪.		প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	সরকারি	২০	৪০
১৩৫	২৪	বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ	সরকারি	১৯	৩৮
১৩৬.		ঢাকা আহছানিয়া মিশন	এনজিও	১৯	৩৮
১৩৭.	২৫	বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর	সরকারি	১৮	৩৬
১৩৮.		বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ	সরকারি	১৮	৩৬
১৩৯.	২৬	প্রস্তাবিত উপকূলীয় ও চরভূমি পুনরুদ্ধার, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন পরিদপ্তর	সরকারি	১৭	৩৪
১৪০.		রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন	সরকারি	১৭	৩৪

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন...

ক্রম	র‍্যাংকিং	প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রতিষ্ঠানের ধরন	প্রাপ্ত সার্বিক স্কোর	শতকরা হার
১৪১.		যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড	সরকারি	১৭	৩৪
১৪২.		বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন করপোরেশন	সরকারি	১৭	৩৪
১৪৩.	২৭	পরিকল্পনা কমিশন	সরকারি	১৬	৩২
১৪৪.		গণউন্নয়ন কেন্দ্র	এনজিও	১৬	৩২
১৪৫.	২৮	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	সরকারি	১৫	৩০
১৪৬.		রিসোর্স ইন্টেগ্রেশন সেন্টার	সরকারি	১৫	৩০
১৪৭.		বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি	এনজিও	১৫	৩০
১৪৮.		বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ	এনজিও	১৫	৩০
১৪৯.	২৯	সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ	এনজিও	১৪	৩২
১৫০.	৩০	বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড	সরকারি	১৩	২৬
১৫১.		নির্বাচন কমিশন	সরকারি	১৩	২৬
১৫২.	৩১	শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট	সরকারি	১১	২২
১৫৩.		দুস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্র	এনজিও	১১	২২
১৫৪.	৩২	অ্যাকশন অন ডিস্যাবিলিটি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট	এনজিও	১০	২০
১৫৫.	৩৩	গ্লোবাল ওয়ান	এনজিও	৯	১৮
১৫৬.	৩৪	অভিবাসী কর্মী উন্নয়ন প্রোগ্রাম	এনজিও	৮	১৭
১৫৭.		বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর	এনজিও	৮	১৬
১৫৮.		আইন কমিশন	সরকারি	৮	১৬
১৫৯.		কনসার্ন ওয়ার্ল্ডওয়াইড	এনজিও	৭	১৫
১৬০.	৩৫	খ্রিষ্টিয়ান সার্ভিস সোসাইটি	এনজিও	৭	১৫
১৬১.		মেরী স্টোপস বাংলাদেশ	এনজিও	৭	১৫
১৬২.		ইসলামিক রিলিফ ইউকে	এনজিও	৭	১৫

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন...

ক্রম	র‍্যাংকিং	প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রতিষ্ঠানের ধরন	প্রাপ্ত সার্বিক স্কোর	শতকরা হার
১৬৩.		বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী বোর্ড	সরকারি	৭	১৪
১৬৪.		বাংলাদেশ নৌবাহিনী	সরকারি	৭	১৪
১৬৫.		শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনাল	সরকারি	৭	১৪
১৬৬.		ম্যানেজমেন্ট সায়েন্স ফর হেলথ	সরকারি	৭	১৪
১৬৭.		ওয়ার্ল্ড রিনিউ	এনজিও	৭	১৪
১৬৮.		ইসলাহুল মুসলিমেন পরিষদ	এনজিও	৭	১৪
১৬৯.	৩৬	ইন্টারন্যাশনাল রেসকিউ কমিটি	এনজিও	৬	১৩
১৭০.		সোসাইটি ফর সোশ্যাল অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল সাপোর্ট	এনজিও	৬	১৩
১৭১.		ইন্টেগ্রেটেড সার্ভিসেস ফর ডেভেলপমেন্ট	এনজিও	৬	১৩
১৭২.		ক্ষুদ্র, মাইক্রো ও কুটিরশিল্প ফাউন্ডেশন	সরকারি	৬	১২
১৭৩.	৩৭	প্রজন্ম রিসার্চ ফাউন্ডেশন	এনজিও	৫	১২
১৭৪.		স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স	এনজিও	৫	১০
১৭৫.		কমপ্যাশন বাংলাদেশ	এনজিও	৫	১০
১৭৬.		ওয়ার্ল্ডভিশন বাংলাদেশ	এনজিও	৫	১০
১৭৭.		মেডিসিন স্যানস ফ্রন্টিয়ার্স-হল্যান্ড	এনজিও	৫	১০
১৭৮.		অ্যাকশন কান্ট্রি লা ফেইম	এনজিও	৫	১০
১৭৯.		সেভ দ্য চিলড্রেন	এনজিও	৫	১০
১৮০.		ফ্রেন্ডশিপ	এনজিও	৫	১০
১৮১.		স্মল কাইন্ডনেস বাংলাদেশ	এনজিও	৫	১০
১৮২.		বাসকো ফাউন্ডেশন	এনজিও	৫	১০
১৮৩.		হিউম্যান এইড অ্যান্ড রিলিফ অর্গানাইজেশন	এনজিও	৫	১০
১৮৪.		ইসলামিক এইড বাংলাদেশ	এনজিও	৫	১০

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন...

ক্রম	র‍্যাংকিং	প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রতিষ্ঠানের ধরন	প্রাপ্ত সার্বিক স্কোর	শতকরা হার
১৮৫.	৩৮	আল মানাহিল ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ	এনজিও	৪	৯
১৮৬.		আন্তঃবাহিনী নির্বাচন পর্ষদ	সরকারি	৪	৮
১৮৭.		কাতার চ্যারিটি	এনজিও	৪	৮
১৮৮.		হেলভেটাস ইন্টারন্যাশনাল	এনজিও	৪	৮
১৮৯.		সলিডারিটিস ইন্টারন্যাশনাল	এনজিও	৪	৮
১৯০.		প্রিপ ট্রাস্ট	এনজিও	৪	৮
১৯১.		গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র	এনজিও	৪	৮
১৯২.		রিলিফ ইন্টারন্যাশনাল	এনজিও	৪	৮

স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় উপজেলা নারী নির্বাহী কর্মকর্তার চ্যালেঞ্জ ও করণীয়*

নাহিদ শারমীন

ভূমিকা

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) উপজেলার প্রধান নির্বাহী হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করেন। ইউএনও বাংলাদেশের সিভিল সার্ভিসের পদমর্যাদা ক্রমানুসারে সিনিয়র সহকারী সচিব পদমর্যাদার একটি পদ। ১৯৮২ সালে প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসকরণের লক্ষে প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস কমিটি (CARR- Committee for Administrative Reorganization/ Reform) গঠিত হয়। এই কমিটি বিকেন্দ্রীকরণ প্রশাসনের ওপর অধিক গুরুত্ব প্রদান এবং স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য থানা পরিষদ গঠনের সুপারিশ করে। এ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী থানা নির্বাহী কর্মকর্তা পদটির প্রবর্তন করা হয়। পরবর্তী সময়ে উন্নীত থানার নামকরণ করা হয় উপজেলা এবং সেই অনুসারে থানা নির্বাহী কর্মকর্তাকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে নামকরণ করা হয়। উপজেলা পরিষদে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার আগপর্যন্ত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা সরকার মনোনীত কোনো কোনো ব্যক্তি চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলে ইউএনও সর্বক্ষেত্রে চেয়ারম্যানকে সহযোগিতা এবং তার পরামর্শ অনুসারে কাজ করবেন।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার প্রধান দায়িত্বাবলী

উপজেলা প্রশাসনের প্রধান হিসেবে উপজেলা পরিষদ, অর্থাৎ স্থানীয় সরকারের প্রতিষ্ঠানের কাজে সহায়তা করা এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে স্থানীয় সরকারের কার্যক্রম অবহিত করা ইউএনওর মূল দায়িত্ব। উপজেলা পরিষদ ম্যানুয়াল ২০১৩ অনুযায়ী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার প্রধান দায়িত্বাবলী নিচে দেওয়া হলো। গবেষণার ফলাফল বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে নিচের কার্যাবলী চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে (বিস্তারিত গবেষণার ফলাফল অংশে দেওয়া হয়েছে)।

- উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানকে নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগে সহায়তা ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবেন।
- উপজেলা পরিষদের কার্যক্রমে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবেন। দাপ্তরিক দায়িত্ব হিসেবে পরিষদের সভায় এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে স্থায়ী কমিটির সভায় উপস্থিত থেকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন, তবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না।

---

* ২০২১ সালের ৪ নভেম্বর ঢাকায় ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশিত গবেষণার সারসংক্ষেপ।

- উপজেলা পরিষদের সভায় গৃহীত কোনো সিদ্ধান্ত সরকারের কাছে প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলে স্থানীয় সরকার বিভাগকে অবহিত করবেন। এ ছাড়া কোনো অস্বাভাবিক বিষয় বা পরিস্থিতি গোচরীভূত হলে স্থানীয় সরকার বিভাগকে অবহিত করবেন।
- উপজেলা পরিষদে ন্যস্তকৃত কর্মকর্তাদের কার্যাদি সম্পাদনে সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করবেন।
- উপজেলা পর্যায়ের সব উন্নয়নমূলক ও প্রশাসনিক কার্যাবলী তদারকিতে চেয়ারম্যানকে সহায়তা করবেন এবং সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে ও বাস্তবায়নে পরিষদকে সহায়তা করবেন।
- পরিষদের তহবিল পরিচালনায় আর্থিক বিধিবিধানের আলোকে ব্যয়ের যথার্থতা যাচাই করবেন এবং উপজেলা পরিষদের বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদনে পরিষদকে সহায়তা করবেন। বাজেট অনুমোদনের পর তিনি স্থানীয় উন্নয়নমূলক ও প্রকল্পের ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থছাড়ের ব্যবস্থা নেবেন এবং পরিষদকে উন্নয়ন ও অনুন্নয়নমূলক ব্যয় অনুমোদনে পরামর্শ দেবেন। উপজেলায় সরকার কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ সরকারের উন্নয়ন তহবিল থেকে ছাড় করার ব্যাপারে পরিষদকে সহায়তা করবেন।
- পরিষদের নির্দেশনার আলোকে প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে খাদ্যসহ ত্রাণসামগ্রী গ্রহণ ও বিতরণের দায়িত্ব পালন করবেন।
- সরকারি নির্দেশনার প্রয়োগ নিশ্চিত করবেন।

গবেষণার যৌক্তিকতা

সংবিধানের ২৮ অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রীয় জীবনে নারী ও পুরুষের সমতার নীতির স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং অনুচ্ছেদ ২৯-এ চাকরিতে নারী-পুরুষের সুযোগের সমতা নিশ্চিত করা হয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০১৬-২০২০) লিঙ্গসমতা ও নারীর ক্ষমতায়নকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ২০১১ সালে বাংলাদেশ সরকার জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি গ্রহণ করে, যার অন্যতম লক্ষ্য নারীর অধিকারচর্চা ও যথাযথ ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা। বাংলাদেশ নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য দূর করার জন্য ১৯৮৪ সালে UN Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women-CEDAW অনুমোদন করে। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের ১৭টি অভীষ্টের মধ্যে বাংলাদেশ সরকার ৮টিকে অধিকতর সমন্বিত অভীষ্ট হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ৮টি লক্ষ্যের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-৫ নারীর অধিকার ও লিঙ্গসমতা-সম্পর্কিত। এ ছাড়া বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, স্থানীয় পর্যায়ে নারী জনপ্রতিনিধিরা কাজ করতে গিয়ে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হন, যা নারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে।

ওই সব বিষয় বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশে নারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়ে অধিকতর গবেষণা প্রয়োজন। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে নারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যক্রমে চ্যালেঞ্জ-সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট গবেষণার স্বল্পতা রয়েছে। বাংলাদেশের প্রশাসনে পিতৃতান্ত্রিকতার প্রভাবে নারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কোনো চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন কি না, তা জানার জন্য গবেষণার প্রয়োজন।

টিআইবি ২০১৮ সাল থেকে নারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের জন্য 'এসডিজি, সুশাসন এবং নারী' শীর্ষক একটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এই প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতায় স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যক্রম পরিচালানায় চ্যালেঞ্জ তুলে ধরার জন্য গবেষণাটি করা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য ও আওতা

স্থানীয় পর্যায়ে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে নারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কী ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেন তা বিশ্লেষণ করাই হচ্ছে গবেষণার উদ্দেশ্য। এই গবেষণায় উপজেলা পরিষদে সাচিবিক সহায়তা প্রদান, উপজেলা চেয়ারম্যানকে সহায়তা প্রদান, উপজেলা পরিষদসহ অন্যান্য বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে সমন্বয় সাধন এবং উপজেলা প্রশাসনের সরকারি নির্দেশনাবলী পালনসংক্রান্ত চ্যালেঞ্জগুলো বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

গবেষণাপদ্ধতি

এই গবেষণায় গুণগত ও পরিমাণগত উভয় গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য KOBO TOOL ব্যবহার করা হয়। জুন ২০২০-এর তথ্য অনুযায়ী ৪৮৫ উপজেলার মধ্যে ১৪৯টিতে নারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্মরত ছিলেন। কর্মরত সব নারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে জরিপের জন্য প্রশ্নপত্র ই-মেইলে পাঠানো হয়, তার মধ্যে ৪৫ জন জরিপে অংশগ্রহণ করেন। ওই ৪৫ জন নারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে গবেষণার নমুনা হিসেবে বিবেচনা করে পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

জরিপের গুণগত তথ্য সংগ্রহ করার জন্য মুখ্য তথ্যদাতা হিসেবে নারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, উপজেলা পর্যায়ে অন্যান্য সরকারি অফিসের কর্মকর্তা, প্রশাসন ক্যাডারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার সরাসরি সাক্ষাৎকার প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে নেওয়া হয়। গবেষণায় পরোক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে আইন, বিধিমালা, ম্যানুয়াল, বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন, বই, প্রবন্ধ, অনলাইন ও প্রিন্ট সংবাদপত্র, সরকারি বিভিন্ন ওয়েবসাইটের সাহায্য নেওয়া হয়।

এই গবেষণার মাঠপর্যায়ের তথ্য ২০২০ সালের জুন থেকে ২০২১ সালের মার্চ পর্যন্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

গবেষণার ফলাফল

উপজেলার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে উপজেলা পরিষদে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। এই গবেষণায় উপজেলা পরিষদে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের কার্যক্রমকে চার ভাগে ভাগ করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে– উপজেলা পরিষদে সাচিবিক সহায়তা প্রদান, উপজেলা চেয়ারম্যানকে সহায়তা প্রদান, উপজেলা পরিষদসহ অন্যান্য বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে সমন্বয় সাধন এবং উপজেলা প্রশাসনের সরকারি নির্দেশনাবলী পালনসংক্রান্ত কার্যক্রম।

উপজেলা পরিষদে সাচিবিক সহায়তা প্রদানসংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ

উপজেলা পরিষদে সাচিবিক সহায়তা প্রদানসংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নারী ইউএনওরা অবৈধ আর্থিক সুবিধা অনুমোদনসংক্রান্ত চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন। এ ধরনের অবৈধ আর্থিক সুবিধা অনুমোদনসংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ প্রধানত নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় রাজনীতিবিদদের কাছ থেকে আসে। জরিপে অংশগ্রহণকারী ৩৪ দশমিক ৩ শতাংশ ইউএনও জানিয়েছেন, ত্রাণসামগ্রী বিতরণে অনিয়ম করার জন্য তাদের ওপর চাপ প্রয়োগ করা হয়। এ ধরনের চাপ প্রয়োগের ফলে অতিরিক্ত ত্রাণসামগ্রীর জন্য সুপারিশ করতে বাধ্য হতে হয় বলেছেন ২০ শতাংশ ইউএনও। এ ছাড়া ৩১ দশমিক ৪ শতাংশ ইউএনও জানিয়েছেন, ব্যয়ের যথার্থতা যাচাই না করার জন্য তাদের বিভিন্ন মহল থেকে চাপ প্রয়োগ করা হয় এবং ভুয়া ব্যয়ের বিল অনুমোদন দিতে বাধ্য করা হয় বলে উল্লেখ করেছেন ২৮ দশমিক ৬ শতাংশ ইউএনও। উপজেলা পরিষদের ক্রয়সংক্রান্ত কাজে অনিয়ম করার জন্য চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয় বলেছেন ২৫ দশমিক ৭ শতাংশ ইউএনও। উল্লেখ্য, ২৩ দশমিক ৫৪ শতাংশ ইউএনও বলেছেন, কাজ সম্পাদন করার ক্ষেত্রে তারা সহকর্মীদের থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পান না।

উপজেলা চেয়ারম্যানকে সহায়তা প্রদানসংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ

উপজেলা চেয়ারম্যানকে সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে নারী ইউএনও যেসব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন, তার মধ্যে চেয়ারম্যানের কাছ থেকে যথাযথ সহযোগিতা না পাওয়া (৪০ দশমিক ৫ শতাংশ) অন্যতম। ৩১ দশমিক ৪ শতাংশ ইউএনও জানিয়েছেন, উপজেলায় দুর্নীতিবিরোধী কাজের ক্ষেত্রে তারা প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হন। এ ছাড়া প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ইউএনও (৩১ দশমিক ৪ শতাংশ) জানিয়েছেন, তাদের বিভিন্ন মহল থেকে অনৈতিক কাজের জন্য চাপ প্রয়োগ করা হয়। উপজেলার কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে ইউএনওরা (৩১ শতাংশ) রাজনৈতিক প্রভাবের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন। গবেষণায় আরও দেখা যায়, উপজেলা পরিষদের বিভিন্ন জনসেবামূলক কাজ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে ২৫ দশমিক ৭ শতাংশ ইউএনও বাধার সম্মুখীন হন। এ ছাড়া উন্নয়ন কার্যাবলী তদারকিসহ বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের সময় ৫ দশমিক ৭ শতাংশ ইউএনও যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। উল্লেখ্য, এসব দায়িত্ব ইউএনও পালন করেন চেয়ারম্যানের কার্যক্রমকে সহজতর করার জন্য।

সমন্বয় সাধনসংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ

সরকারের বিভিন্ন বিভাগের দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয়ের ক্ষেত্রে অনেক বেশি জটিলতার সম্মুখীন হতে হয় বলে জানিয়েছেন জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৩১ শতাংশ ইউএনও। এ ছাড়া উপজেলার আইনশৃঙ্খলার অবনতি হলে যথাযথ সময়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী থেকে সহযোগিতা পান না বলেছেন ৩১ শতাংশ ইউএনও। এ ছাড়া বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করার ক্ষেত্রে ওপরমহলের (স্থানীয় সাংসদ, মন্ত্রী, সচিব) প্রভাব মোকাবিলা করা ইউএনওদের (১১ দশমিক ৯ শতাংশ) কাছে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে জেলা প্রশাসন থেকে যথাসময়ে সহযোগিতা পান না বলে

মন্তব্য করেছেন ৭ দশমিক ১০ শতাংশ ইউএনও। একজন ইউএনও বলেছেন, 'মাদকসেবীদের ধরার জন্য পুলিশ চেয়েছিলাম, কিন্তু দেওয়া হয়নি। বলা হলো, এখন যারা আছে সবাই ব্যস্ত। এ রকম হলে কীভাবে সমন্বয় হবে?'

সরকারি নির্দেশ পালনসংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ

দুর্যোগ মোকাবিলা

গবেষণায় দেখা যায়, ৯৮ শতাংশ ইউএনও দুর্যোগ মোকাবিলায় চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছেন। জরিপের তথ্য অনুযায়ী, ৪৮ দশমিক ৯ শতাংশ ইউএনও দুর্যোগ মোকাবিলা করতে গিয়ে সরকারের বিভিন্ন বিভাগ বা দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন। এ ছাড়া ৩৫ দশমিক ৬ শতাংশ ইউএনওকে ত্রাণ বিতরণে অনিয়ম করাসংক্রান্ত এর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়। জরিপে অংশগ্রহণকারী ১৭ দশমিক ৮ শতাংশ ইউএনও বলেছেন, তারা দুর্যোগ মোকাবিলা করার সময় জনগণের সহযোগিতা পান না।

করোনা মোকাবিলায় চ্যালেঞ্জ

জরিপে দেখা যায়, ৯১ শতাংশ ইউএনও করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছেন, যাদের মধ্যে ৭৪ দশমিক ৩ শতাংশ জানিয়েছেন, করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য তাদের প্রয়োজনীয় বাজেট ছিল না। ২৮ দশমিক ৬ শতাংশ ইউএনও বলেছেন, লকডাউন সফল করতে তারা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তা পাননি। এ ছাড়া করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য পিপিই, মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজারের মতো সামাজিক সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণে দুর্নীতির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেন ২২ দশমিক ৯ শতাংশ ইউএনও। ২০ শতাংশ ইউএনও জানিয়েছেন, তারা করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোর সহায়তা পান না। মেডিকেলের সুরক্ষা সরঞ্জাম ক্রয়ের দুর্নীতির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার কথা জানিয়েছেন ৫ দশমিক ৭ শতাংশ ইউএনও।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ

স্থানীয় পর্যায়ে দুর্নীতি প্রতিরোধের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ৮৯ দশমিক ১ শতাংশ ইউএনও পদক্ষেপ নিয়েছেন। কিন্তু গবেষণায় দেখা যায়, দুর্নীতির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করায় প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছিলেন ৪৩ দশমিক ৫ শতাংশ ইউএনও। ৪৮ দশমিক ৫ শতাংশ ইউএনও জানিয়েছেন, দুর্নীতির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিলে স্থানীয় পর্যায় (প্রভাবশালী ব্যক্তি, স্থানীয় রাজনীতিবিদ) থেকে চাপ প্রয়োগ করা হয়। এ ছাড়া ৪৫ দশমিক ৫ শতাংশ ইউএনও বলেছেন, দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলে তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ দাঁড় করিয়ে উল্টো চাপ প্রয়োগ করা হয়। ১৮ দশমিক ২ শতাংশ ইউএনও আরও উল্লেখ করেছেন, দুর্নীতিবিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তারা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী থেকে সহযোগিতা পান না। একইভাবে ৯ দশমিক ১ শতাংশ ইউএনও জানিয়েছেন, তারা উপজেলা চেয়ারম্যানের কাছ থেকে দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমে সহযোগিতা পান না। একজন ইউএনও বলেন, 'সরকারি

জলমহাল ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে একজন দরদাতার কাগজপত্র সরকারি বিধি অনুযায়ী যথাযথ না থাকায় তাকে ইজারা দেওয়া হয়নি। তখন আমার বিরুদ্ধে বিভিন্ন জায়গায় মিথ্যা অভিযোগ করে চাপ সৃষ্টির চেষ্টা করে।'

দুর্নীতি প্রতিরোধে পদক্ষেপের ধরন

দুর্নীতির শিকার হলে অভিযোগ করার জন্য উৎসাহ প্রদান করেছেন ৫৭ দশমিক ৮ শতাংশ ইউএনও। ৩৫ দশমিক ৬ শতাংশ ইউএনও জানিয়েছেন, উপজেলা প্রশাসনকে দুর্নীতিমুক্ত করার জন্য তারা প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। কারও দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত হলে তাকে শাস্তি প্রদান করা হয় বলে জানিয়েছেন ২৮ দশমিক ৯ শতাংশ ইউএনও। উপজেলায় দুর্নীতিবিরোধী বিভিন্ন অভিযান পরিচালনা করেন ২৮ দশমিক ৯ শতাংশ ইউএনও। এ ছাড়া উপজেলায় দুর্নীতির প্রবণতা কমিয়ে আনার জন্য নৈতিকতা কমিটি গঠন এবং দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে মন্ত্রণালয়ে অভিযোগ করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন যথাক্রমে ২২ দশমিক ২ শতাংশ ও ৪ দশমিক ৫ শতাংশ নারী ইউএনও।

দায়িত্ব পালনে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করা ব্যক্তিরা

জরিপে দেখা যায়, ৫৯ দশমিক ৫ শতাংশ ইউএনও দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এবং সাংবাদিকের দ্বারা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছেন। এ ছাড়া কাজ সম্পাদনের সময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী থেকে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন ৫০ শতাংশ ইউএনও। দায়িত্ব পালনের সময় স্থানীয় রাজনীতিবিদদের কারণে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়েছে বলেছেন ৪৭ দশমিক ৬ শতাংশ ইউএনও। উপজেলা পরিষদের অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তার দ্বারা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন ৪০ দশমিক ৫ শতাংশ ইউএনও। ইউএনওরা জেলা প্রশাসক (৩৮ দশমিক ১ শতাংশ) ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (৪ দশমিক ৮ শতাংশ) দ্বারা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন। জরিপের তথ্য অনুযায়ী, কাজ বাস্তবায়নের সময় সাধারণ জনগণের থেকে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন ২৮ দশমিক ৬ শতাংশ ইউএনও।

নারী ইউএনওর দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার উপায়

জরিপে অংশ নেওয়া সব নারী ইউএনও জানিয়েছেন, যেকোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তারা নিজেরা চেষ্টা করেন। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা হিসেবে জেলা প্রশাসনের সহায়তা নেন ৮০ শতাংশ ইউএনও এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তা নেন যথাক্রমে ৩৩ দশমিক ৩ শতাংশ ও ২২ দশমিক ২ শতাংশ ইউএনও। চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় স্থানীয় সাংসদের সহায়তা নেওয়ার কথা জানিয়েছেন ৩১ দশমিক ১ শতাংশ ইউএনও।

নারী ইউএনওর সঙ্গে দায়িত্ব পালনসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অভিজ্ঞতা

উপজেলা পরিষদে কর্মরত হস্তান্তরিত বিভাগের কর্মকর্তাদের মধ্যে উপজেলার সব কার্যক্রম সঠিকভাবে পালনের ক্ষেত্রে নারী ইউএনওর দক্ষতা ও যোগ্যতা নিয়ে ইতিবাচক ও নেতিবাচক

দুই ধরনের অভিজ্ঞতা রয়েছে। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত তথ্যদাতাদের মতে, নারী ইউএনও দ্রুত কাজের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না, নারী হওয়ার কারণে সব সময়, সব স্থানে যেতে পারেন না। নিরাপত্তাহীনতার চ্যালেঞ্জ পুরুষের তুলনায় নারীর তুলনামূলকভাবে বেশি বলে তথ্যদাতারা উল্লেখ করেন। তথ্যদাতারা আরও জানান, নারী ইউএনওরা কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণে আগ্রহী কম এবং তারা জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় কম দক্ষ। একজন উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা নারী ও পুরুষ ইউএনওর কর্মদক্ষতা ও যোগ্যতা তুলনামূলক বিশ্লেষণে উদাহরণস্বরূপ বলেছেন, কোথাও আগুন লাগলে একজন পুরুষ যত তাড়াতাড়ি আসতে পারেন, তত তাড়াতাড়ি একজন নারী ইউএনও আসতে পারেন না। কোনো ধরনের 'পাবলিক বিস্ফোরণ' হলে নারীরা সেভাবে মোকাবিলা করতে পারেন না। ওপরের আলোচনার প্রতিফলন পাওয়া যায়, একজন নারী ইউএনওর কথা থেকে। তিনি বলেন, 'আমরা এখনো কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হই। নারীরা কাজ করতে পারেন না, কথা বলতে পারেন না, নিজেকে উপস্থাপন করতে জানেন না, এখনো অনেকের মধ্যে এ ধারণা আছে। এর মধ্য দিয়েই আমরা কাজ করছি।'

তবে জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকরা কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ ইউএনওদের মধ্যে দক্ষতা ও যোগ্যতার কোনো পার্থক্য নেই বলেছেন। নারীদের ক্ষেত্রে পারিবারিক দায়িত্ব পুরুষদের তুলনায় বেশি থাকে বলে তারা মনে করেন। এর বাইরে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা নারী ইউএনও নিয়ে কিছু ইতিবাচক অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন। তারা স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির সঙ্গে কাজ সম্পাদন করেন এবং কর্মস্থলে তখন লাল ফিতার দৌরাত্ম্য কম থাকে। এ ছাড়া কাজ সম্পাদনে তাদের কাছ থেকে সহযোগিতা পাওয়া যায়।

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

নারী ইউএনওর নিরাপত্তাব্যবস্থার অপ্রতুলতা : জেন্ডার চাহিদা বিবেচনায় রেখে মাঠপর্যায়ে উন্নয়নকাজের পরিদর্শন ও আইনশৃঙ্খলা উন্নয়নের মতো বিশেষ পরিস্থিতিতে নারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের বিশেষ কোনো নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেই। পুলিশ প্রশাসনের কাছে নিরাপত্তার জন্য পুলিশ ফোর্সের চাহিদা জানাতে হয়। সুতরাং পুলিশ প্রশাসন কোনো কারণে যদি ফোর্স দিতে না পারে, তখন তাদের করার কিছু থাকে না। বাংলাদেশের কুসংস্কারচ্ছন্ন সামাজিক ধ্যান-ধারণা এবং শক্তিশালী আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অভাবের কারণে তুলনামূলকভাবে নারীরা পুরুষদের তুলনায় অনেক বেশি ঝুঁকির সম্মুখীন হন।

তথাকথিত জেন্ডার ধারণার প্রবণতা : নারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সহকর্মী, উপজেলার অন্যান্য কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধিদের মাঝে নারীদের নিয়ে নেতিবাচক জেন্ডার ধারণা বিদ্যমান। তারা মনে করেন, দুর্যোগ মোকাবিলা, জরুরি পরিস্থিতিতে কাজ করার মতো মাঠপর্যায়ের কাজে নারীরা খুব দক্ষ নন। এ ছাড়া তারা মনে করেন, নারীরা কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। এর দ্বারা বোঝা যায়, এ দেশের পুরুষদের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় এখনো পিতৃতান্ত্রিক মনোভাব বিদ্যমান। ফলে তারা কাজের যে কোনো লিঙ্গ নেই, কাজ যে সবার জন্য এক, তারা তা মনে

করেন না। এ সমাজ সুস্থ, নিরাপদ এবং জেন্ডারবান্ধব কর্মপরিবেশ না দেওয়ার ফলে নারীরা এখনো যথাযথভাবে কাজ সম্পাদন করতে পারেন না।

আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সহযোগিতা না পাওয়া : আগে বলা হয়েছে উপজেলা প্রশাসনের কাছে চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ ফোর্সের সহযোগিতা পাওয়ার কথা থাকলেও অনেক সময় তারা পান না। ফলে অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে যেতে চাইলেও যেতে পারেন না। কিন্তু এসব অভিযান স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ ছাড়া এ দেশের পারিপার্শ্বিক ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির কারণে নারীদের জন্য এসব অভিযানে, যেমন দুর্নীতি প্রতিরোধ অভিযান, সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান, মাদকবিরোধী অভিযান, লকডাউন বাস্তবায়ন, প্রভৃতি কাজে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী থেকে পর্যাপ্ত ও যথাসময়ে সহযোগিতা পাওয়া অত্যন্ত জরুরি হলেও তারা তা পান না।

কার্যক্রম পরিচালনায় রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ : কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে ইউএনওরা রাজনীতিবিদদের কাছ থেকে পিতৃতান্ত্রিক মনোভাবের মুখোমুখি হন। ত্রাণসামগ্রী বিতরণ ও বিভিন্ন প্রকল্পের কাজের পরিকল্পনা ও সম্পাদনকালীন স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের রাজনীতিবিদদের থেকে অনিয়ম করার জন্য চাপ প্রয়োগ করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে শারীরিকভাবে লাঞ্ছনার শিকার হতে হয়। এ ছাড়া ইউএনওরা দুর্নীতিবিরোধী কাজের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন এবং অনেক সময় তাদের অনৈতিক কাজ করতে চাপ প্রয়োগ করা হয়।

উপজেলা পরিষদ ও অন্যান্য কর্মকর্তার কাছ থেকে সহযোগিতা না পাওয়া : উপজেলা প্রশাসনের প্রধান হিসেবে স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য উপজেলা পরিষদ থেকে সহযোগিতা না পাওয়ার ফলে অনেক কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা যায় না। বাংলাদেশের উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন প্রাশাসনিক দপ্তরের মাঝে সমন্বয়হীনতা রয়েছে। এই সমন্বয়হীনতার চ্যালেঞ্জ ইউএনওদের মোকাবিলা করতে হয়। জরুরি প্রয়োজনের সময়, যেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা, বিভিন্ন সরকারি অফিসের মধ্যে সমন্বয়ের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত জটিলতার সম্মুখীন হন। এ ছাড়া নানা ধরনের উন্নয়নমূলক কাজে উপজেলা পরিষদ থেকে যথাযথ সহযোগিতা পান না, যেহেতু উপজেলা পরিষদের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা কিছু ক্ষেত্রে সাধারণ জনগণের সুবিধার বিষয় বিবেচনা না করে নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থকে প্রাধান্য দেন।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে নারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার চ্যালেঞ্জ ও ভূমিকা : 'রূপকল্প ২০২১'-এ দুর্নীতি দমনকে একটি আন্দোলন হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করেছে, যেখানে স্থানীয় সরকারকে একটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে উল্লেখ করে একটি স্বচ্ছ ও দায়বদ্ধ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠার বিষয়টিকে লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু ইউএনওরা দুর্নীতির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে গিয়ে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন, যা বিস্তারিত আগে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে ক্ষমতাধর রাজনৈতিক ব্যক্তি এবং প্রভাবশালী ব্যক্তি, যারা বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে বেশিরভাগ

ক্ষেত্রে পুরুষ, তাদের পক্ষ থেকে চাপ প্রয়োগ করা হলে নারী হওয়ার জন্য মোকাবিলা করা কঠিন হয়ে পড়ে। যার ফলে তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ দেওয়া হয়। মূলত বাংলাদেশে উপজেলা পরিষদে দুর্নীতি ও সমন্বয়হীনতার চ্যালেঞ্জ একটি সার্বিক সমস্যা।

সংবাদকর্মীদের থেকে চ্যালেঞ্জ : সংবাদমাধ্যম হচ্ছে রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ। সুতরাং ইউএনও যদি সংবাদকর্মীদের থেকে সহযোগিতার পরিবর্তে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন, তাহলে তা সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এ ছাড়া ইউএনওরা সংবাদকর্মীদের থেকে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হলে, বিশেষকরে নারীদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ ইউএনওর চরিত্রে কালিমা লেপন করা হলে বাংলাদেশের পারিপার্শ্বিকতার কারণে পুরুষদের থেকে নারীরা শুধু লৈঙ্গিক পরিচয়ের কারণে পরিবার ও সমাজ থেকে বেশি সমালোচনার মুখোমুখি হন।

নারী ইউএনওদের জরিপে অংশগ্রহণে অনাগ্রহ : গবেষণার অন্তর্ভুক্ত জরিপে ১৪৯ জনের মধ্যে অংশগ্রহণ করেছেন ৪৫ জন। এ থেকে ধারণা পাওয়া যায়, নারীরা হয়তো তাদের চ্যালেঞ্জের বিষয়টি বলতে অনাগ্রহী।

সুপারিশ

ওপরের বিশ্লেষণ থেকে ধারণা করা যায়, নারী ইউএনওরা স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে নানা ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছেন। তাই নিচের সুপারিশগুলো বাস্তবায়িত হলে স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নারী ইউএনও আরও কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবেন, যার মাধ্যমে উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন সাধিত হবে।

১. নারী ইউএনওদের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব দূর করার জন্য উপজেলা পরিষদের জনপ্রতিনিধি ও উপজেলা পরিষদের অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তাকে নিয়ে নারীর প্রতি সংবেদনশীল আচরণের ওপর প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হবে। এ ছাড়া সরকারি কর্মকর্তাদের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনে (এসিআর) জেন্ডার সংবেদশীলতাকে একটি সূচক হিসেবে রাখা যেতে পারে।

২. উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানকে সাচিবিক সহায়তা প্রদানসংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে ইউএনও ও চেয়ারম্যানদের নিয়ে ওরিয়েন্টেশনের আয়োজন করা, যার মূল লক্ষ্য হবে একে অন্যের প্রতিপক্ষ নয়; বরং সহযোগী এটা অনুধাবন করানো।

৩. দুর্নীতি প্রতিরোধে নারী ইউএনওর পদক্ষেপের জন্য জেলা পর্যায়ে তাকে সম্মানিত করা এবং পুরস্কারের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৪. উন্নয়নমূলক কাজ সম্পাদন ও দুর্নীতি প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে কোনো নারী ইউএনও সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর আক্রমণ ও ষড়যন্ত্রের শিকার হলে তাকে আইনগত সহায়তা দেওয়া ও নিরাপত্তা প্রদান করতে হবে।

৫. সংবাদমাধ্যমগুলো স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য যথাসাধ্য সঠিক সংবাদ প্রচারের মাধ্যমে ইউএনওর কার্যক্রম সম্পাদনের ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদান করবে।

৬. মন্ত্রণালয়ের নীতিগত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের রাজনীতিবিদদের স্থানীয় উন্নয়নমূলক কাজে চাপ প্রয়োগ বন্ধ করার জন্য পরিপত্র জারি করতে হবে।

৭. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নারী ইউএনওর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ওপর নারী ইউএনওদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৮. নারী ইউএনওকে নিরাপত্তা ও সহযোগিতা প্রদান করার জন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে তৎপর হতে হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সেবা খাত

মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়*

তাসলিমা আক্তার

গবেষণার প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশের শিক্ষা প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা এই তিনটি প্রধান ধাপে বিভক্ত। সাধারণ, কারিগরি ও মাদ্রাসা–এ তিনটি ধারার অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার প্রশাসনিক, ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর। বিভিন্ন ধারায় পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর অধিকাংশ (প্রায় ৬১ শতাংশ) সাধারণ ধারায় পরিচালিত প্রতিষ্ঠান। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরাধীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর প্রায় ৮২ শতাংশ মাধ্যমিক স্তরের প্রতিষ্ঠান।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনায় মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরাধীন উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় শিক্ষা কার্যালয়ের মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে সরকারের বিভিন্ন ইতিবাচক উদ্যোগ সত্ত্বেও মাধ্যমিক শিক্ষার বিভিন্ন কার্যক্রমে সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতির চিত্র বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন, বিশেষজ্ঞদের মতামত এবং গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে ফুটে ওঠে। টিআইবি পরিচালিত জাতীয় খানা জরিপ ২০১৭ অনুযায়ী, ৪২ দশমিক ৯ শতাংশ খানা সরকারি ও এমপিওভুক্ত শিক্ষাসেবা নিতে গিয়ে দুর্নীতির শিকার হয়। বিভিন্ন গণমাধ্যমে ও অন্যান্য প্রকাশিত প্রতিবেদনে শিক্ষক নিয়োগ, এমপিওভুক্তি, পাঠদান অনুমোদন ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনিয়ম-দুর্নীতির তথ্য প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া কোভিড-১৯ অতিমারির পরিপ্রেক্ষিতে মাধ্যমিক শিক্ষা খাতে সংকট তৈরি হয়েছে।

সার্বিকভাবে মাধ্যমিক শিক্ষার কার্যক্রমে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ, অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন, মাত্রা, কারণ ও প্রভাব নিয়ে কাঠামোবদ্ধ গবেষণার ঘাটতি লক্ষ করা যায়। শিক্ষা খাত টিআইবির গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রমের অগ্রাধিকারমূলক একটি খাত। টিআইবি দীর্ঘদিন ধরে প্রাথমিক শিক্ষা খাতে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে নাগরিক উদ্যোগ, গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। উচ্চশিক্ষা নিয়েও টিআইবির গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম রয়েছে। শিক্ষা খাতে টিআইবির কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় মাধ্যমিক শিক্ষার বিভিন্ন কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, অনিয়ম-দুর্নীতি ও অন্যান্য চ্যালেঞ্জ গভীরভাবে বিশ্লেষণের লক্ষ্যে বর্তমান গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে।

---

* ২০২১ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর ঢাকায় ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশিত গবেষণার সারসংক্ষেপ।

গবেষণার উদ্দেশ্য ও পরিধি

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য মাধ্যমিক শিক্ষা (সাধারণ ধারা) কার্যক্রম বাস্তবায়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনা করা। গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে :

- মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা;
- মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির ঘাটতি চিহ্নিত করা;
- মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন ও মাত্রা চিহ্নিত করা; এবং
- বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ উত্তরণে সুপারিশ প্রস্তাব করা।

এই গবেষণায় মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরাধীন সাধারণ ধারার ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গবেষণায় এমপিওভুক্ত এবং সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, আঞ্চলিক কার্যালয়, জেলা শিক্ষা অফিস ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রম এবং ওই কার্যক্রম পরিচালনায় মাউশি অধিদপ্তরের সহযোগী সংস্থা ও অংশীজনদের প্রাসঙ্গিক কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত।

গবেষণাপদ্ধতি

এটি মূলত একটি গুণগত গবেষণা, তবে সীমিত ক্ষেত্রে পরিমাণগত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। প্রাথমিক উৎস থেকে গুণগত তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। গুণগত তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতির মধ্যে ছিল মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার। মুখ্য তথ্যদাতার মধ্যে রয়েছেন মাউশি অধিদপ্তর ও এর অধীন বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা শিক্ষা কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারী, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারী, ব্যবস্থাপনা কমিটি বা গভর্নিং বডির সদস্য, শিক্ষক সমিতির সদস্য, মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রমে সম্পৃক্ত অন্যান্য অংশীজন, শিক্ষা বিশেষজ্ঞ এবং গণমাধ্যমকর্মী (মোট ৩২৫ জন)।

প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহে কেন্দ্রীয়সহ মাউশির বিভিন্ন পর্যায়ের (বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা) কার্যালয় থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এ ছাড়া দেশের ১৮টি উপজেলায় অবস্থিত মোট ৫৪টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (প্রতি উপজেলায় দুটি বেসরকারি এমপিওভুক্ত ও একটি সরকারি) থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্বাচনে নতুন ও পুরোনো এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সরকারি বা সাম্প্রতিক সময়ে জাতীয়করণকৃত প্রতিষ্ঠান, ভৌগোলিক অবস্থান ইত্যাদি বিবেচনা করা হয়। গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফল সুশাসনের নির্দেশকের (সক্ষমতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধ) আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়।

জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০, বিভিন্ন নীতিমালা, বিধিমালা, প্রজ্ঞাপন, প্রাতিষ্ঠানিক বার্ষিক প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইট ও প্রকাশিত প্রতিবেদন পরোক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। ২০১৯ সালের মে-অক্টোবর পর্যন্ত মাঠপর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। পরবর্তী সময়ে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত পরোক্ষ উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়।

গবেষণার ফলাফল

শিক্ষা খাতসংশ্লিষ্ট আইনি ও নীতিগত সক্ষমতা

শিক্ষা প্রশাসনে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও গতিশীলতা আনয়নে এবং শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতকরণে জাতীয় শিক্ষানীতিতে (২০১০) বিভিন্ন কৌশল নির্ধারণ করা হলেও নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে কার্যকর উদ্যোগের ঘাটতি রয়েছে।

নতুন শিক্ষা কাঠামোয় মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বাস্তবায়নে শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার পুনর্বিন্যাস করা হবে বলা হলেও এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনো পরিকল্পনা বা রূপরেখা তৈরি করা হয়নি। শিক্ষাসংক্রান্ত সব আইন, বিধিবিধান ও আদেশাবলী একত্র করে শিক্ষানীতির আলোকে একটি সমন্বিত শিক্ষা আইন প্রবর্তন সম্পর্কে বলা হয়েছে। দীর্ঘ প্রায় দশ বছর খসড়া শিক্ষা আইনটি নিয়ে কাজ করা হলেও আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রতায় এটি এখনো কার্যকর হয়নি। নির্বাহী আদেশ ও নির্দেশে মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

দেশের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠানগুলো পরিদর্শন করে র‍্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে উন্নয়নে পরামর্শ প্রদানে যথাযথ ক্ষমতা ও দক্ষতাসম্পন্ন একটি 'প্রধান শিক্ষা পরিদর্শক'-এর অফিস স্থাপন, মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসনে যথাযথ জবাবদিহির ব্যবস্থা নিশ্চিতে 'পৃথক মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর' গঠন, শিক্ষানীতির সময়োপযোগী ও প্রয়োজনে পরিবর্তন করার সুপারিশ তৈরি করা এবং শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষাসংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের পরামর্শকারী সংস্থা হিসেবে আইনের মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসিত সংবিধিবদ্ধ একটি 'স্থায়ী জাতীয় শিক্ষা কমিশন' গঠন সম্পর্কে বলা হলেও এখন পর্যন্ত কোনো কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। যদিও সম্প্রতি 'জাতীয় শিক্ষা কমিশন' গঠনের কাজ শুরু করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নির্বাচনে সরকারি কর্ম কমিশনের অনুরূপ 'বেসরকারি শিক্ষক নির্বাচন কমিশন' গঠন সম্পর্কে বলা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে 'শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ' গঠন করা হয়। শিক্ষকদের বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুবিধার সুপারিশে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করা, শিক্ষকদের জন্য নৈতিক আচরণ বিধিমালা প্রণয়ন করা, পেশাগত আচরণবিধি লঙ্ঘনে অভিযুক্ত শিক্ষকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শাস্তিমূলক পদক্ষেপ সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা হবে বলা হলেও অদ্যাবধি শিক্ষকদের আর্থিক সুবিধা ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি এবং কার্যকর জবাবদিহি নিশ্চিতে উদ্যোগের ঘাটতি রয়েছে।

শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ বেগবানে প্রতি বিভাগে একটি করে 'আঞ্চলিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি' প্রতিষ্ঠা করা, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের দক্ষতা মূল্যায়নে নিবিড় পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং কোনো দুর্বলতা পরিলক্ষিত হলে বিশেষ ব্যবস্থায় তা দূর করা হবে বলা হলেও অদ্যাবধি কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করতে দেখা যায়নি।

ধারাবাহিকভাবে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জন মূল্যায়নে পদ্ধতি নিরূপণ করা ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ সম্পর্কে বলা হলেও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। এতে শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষের পাঠ আত্মস্থ করতে পারছে কি না, তা যাচাইয়ে কার্যকর ব্যবস্থা না থাকায় গুণগত শিক্ষার ভিত তৈরিতে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হচ্ছে। সম্প্রতি নতুন শিক্ষাক্রমের রূপরেখা প্রণয়ন করা হলেও এটি বাস্তবায়নে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতায় চ্যালেঞ্জের (অধিক যোগ্যতা ও দক্ষতাসম্পন্ন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনুপাতে) ঝুঁকি রয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থী অনুপাত পর্যায়ক্রমে ২০১৮ সালের মধ্যে ১:৩০– এ উন্নীত করার কথা বলা হলেও অদ্যাবধি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর নির্ধারিত অনুপাত প্রত্যাশিত পর্যায়ে পৌঁছেনি। এতে শ্রেণিকক্ষে সব শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষকের মনোযোগ দেওয়া যেমন সম্ভব হচ্ছে না, শিক্ষার্থীরাও যথাযথ শিক্ষা নিতে পারছে না। বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১৮ সালের তথ্যানুযায়ী, মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থী অনুপাত ১:৪৫।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের উপবৃত্তি প্রকল্প থেকে একটি খসড়া নিয়োগবিধি দিয়ে রাজস্ব খাতে পদায়ন করা হয়, যা 'উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের গেজেটেড অফিসার ও নন-গেজেটেড কর্মচারীদের নিয়োগ বিধিমালা-২০০৬' নামে পরিচিত। তবে দীর্ঘ প্রায় ১৫ বছরেও চূড়ান্ত নিয়োগবিধি অনুমোদন পায়নি। এতে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তারা টাইম স্কেল, পেনশন-সুবিধা ও পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা

আর্থিক : শিক্ষা খাতে একটি দেশের মোট জিডিপির ৬ শতাংশ অথবা মোট বাজেটের ২০ শতাংশ বরাদ্দ রাখা উচিত বলে পরামর্শ দিয়েছে জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা ইউনেসকো। কিন্তু বাংলাদেশের গত দশ বছরের জাতীয় বাজেটে শিক্ষা খাতের বরাদ্দ পর্যালোচনায় দেখা যায় শতকরা হিসাবে এটি ১০ থেকে ১২ শতাংশের মধ্যে রয়েছে। বাংলাদেশের শিক্ষা খাতে জিডিপির সাপেক্ষে বরাদ্দ অনেক কম, যা ২ থেকে প্রায় ৩ শতাংশ। অথচ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো শিক্ষা খাতে জিডিপির প্রায় ৩ থেকে ৬ শতাংশ পর্যন্ত বরাদ্দ দিয়ে থাকে।

জাতীয় বাজেটে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের গত পাঁচ অর্থবছরের মোট বরাদ্দের দিকে তাকালে দেখা যায়, এটি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়নি। টাকার অঙ্কে বরাদ্দ ক্রমান্বয়ে বাড়লেও শতকরা হিসাবে এটি গড়ে প্রায় সাড়ে ৫ থেকে সাড়ে ৬ শতাংশের মধ্যে রয়েছে।

এমপিওভুক্ত শিক্ষক ও কর্মচারীর আর্থিক সুবিধা : এমপিওভুক্ত শিক্ষক ও কর্মচারীরা সরকারের কাছ থেকে মূল বেতনের শতভাগ বেতন-ভাতা, বাড়ি ভাড়া ও চিকিৎসা ভাতা, দুটি উৎসব ভাতা, বৈশাখী ভাতা, প্রতিবছর ৫ শতাংশ হারে ইনক্রিমেন্ট এবং অবসর ও কল্যাণ ট্রাস্ট ভাতা পেয়ে থাকেন। তবে এসব আর্থিক সুবিধা কোনো কোনো ক্ষেত্রে আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে পর্যাপ্ত নয়। শিক্ষক ও কর্মচারী উভয়ের জন্য বাড়ি ভাড়া ১ হাজার টাকা এবং চিকিৎসা ভাতা ৫০০ টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে পদমর্যাদা ও স্কেল অনুযায়ী চিকিৎসা ভাতা ও বাড়ি ভাড়া

নির্ধারণ করা হয়নি। উৎসব ভাতা ২০০৪ সাল থেকে দেওয়া শুরু হলেও দীর্ঘ প্রায় ১৭ বছর এটি বাড়ানো হয়নি।

অষ্টম বেতনকাঠামোয় (২০১৫ সালে) সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ইনক্রিমেন্ট ৫ শতাংশ ও বৈশাখী ভাতা মূল বেতনের ২০ শতাংশ দেওয়া হলেও বেসরকারি এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিলেন। পরবর্তী সময়ে শিক্ষকদের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে জুলাই ২০১৮ থেকে এটি কার্যকর করা হয়। এ ছাড়া অবসর ভাতা তহবিলে পর্যাপ্ত অর্থ না থাকায় এমপিওভুক্ত অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও কর্মচারীর এককালীন অবসর ভাতা পেতেও বর্তমানে তিন থেকে চার বছর পর্যন্ত বিলম্ব হচ্ছে। প্রত্যেক শিক্ষক ও কর্মচারীর বেতন থেকে চাঁদা কর্তন ও বিভিন্ন সময়ে সরকার কর্তৃক অনুদান দিলেও তা অবসর তহবিলের ঘাটতি পূরণে পর্যাপ্ত নয়।

মানবসম্পদ : শিক্ষা খাতের উন্নয়নে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ মাঠপর্যায়ের তদারকি ও তত্ত্বাবধান করা। কিন্তু জনবল ঘাটতির কারণে এর কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। মাউশি অধিদপ্তরাধীন এবং এর সহযোগী সংস্থার অনুমোদিত জনবলের বিপরীতে পদের শূন্যতা রয়েছে, যেমন উপজেলা বা থানা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার অনুমোদিত পদের ১২ শতাংশ পদ, ৬৪ শতাংশ উপজেলায় সহকারী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার পদ, একাডেমিক সুপারভাইজারের প্রায় ৩ শতাংশ পদ, প্রায় ৩৮ শতাংশ জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার পদ এবং জেলা ও আঞ্চলিক কার্যালয়সহ সহকারী পরিদর্শকের অনুমোদিত পদের বিপরীতে ১১ দশতাংশ পদ শূন্য। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের রাজস্ব খাতে পদায়নে নিয়োগবিধি অনুমোদন না হওয়া, প্রকল্পাধীন নিয়োগ, সহকারী জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের ফিডার সার্ভিস পূর্ণ না হওয়ায় মাঠপর্যায়ের শূন্য পদগুলো দ্রুত পূরণ সম্ভব হচ্ছে না।

এ ছাড়া মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষায় নিয়মিত তদারকি ও মূল্যায়নে মনিটরিং অ্যান্ড ইভাল্যুয়েশন উইংয়ে মনিটরিং কর্মকর্তা রয়েছেন মাত্র দুজন। বেসরকারি এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর পরিদর্শন ও নিরীক্ষায় পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরে অনুমোদিত জনবলের বিপরীতে শূন্যপদ রয়েছে প্রায় ৫৮ শতাংশ। পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর ১৯৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত এবং ১৩০ জনবল নিয়ে এর কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তী সময়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অধিকতর বৃদ্ধি পেলেও এর জনবল বৃদ্ধি পায়নি।

পদোন্নতি বা উচ্চতর গ্রেড প্রাপ্তি

মাধ্যমিক শিক্ষা খাতে শিক্ষকদের পদোন্নতিতে দীর্ঘসূত্রতা রয়েছে। দীর্ঘদিন পদোন্নতি না হওয়ায় শিক্ষকদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়, পাঠদানে উৎসাহ হ্রাস পায়, তাঁরা মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন, আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। বেসরকারি এমপিওভুক্ত প্রভাষকদের চাকরিজীবনে প্রভাষক থেকে সর্বোচ্চ সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতির সুযোগ রয়েছে। প্রভাষক পদে চাকরির আট বছর পূর্তিতে ৫:২ অনুপাতে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পেয়ে থাকেন। অনুপাত প্রথার কারণে একই যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ প্রভাষক সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন এবং প্রভাষক পদে থেকে অবসর গ্রহণ করতে হচ্ছে। পদোন্নতিবঞ্চিত প্রভাষকদের চাকরির অভিজ্ঞতা ও বেতন গ্রেড সুবিধাও

সীমিত করা হয়েছে। গ্রেডপ্রাপ্তিতে চাকরির অভিজ্ঞতা ১০ বছর করা হয়েছে, যা আগে ছিল আট বছর। গ্রেডের প্রাপ্যতার ক্ষেত্রে নবম থেকে অষ্টম করা হয়েছে, যা আগে ছিল নবম থেকে সপ্তম গ্রেডে। এ ছাড়া এমপিওভুক্ত সহকারী শিক্ষক পদ থেকে উচ্চক্রম অনুযায়ী পদসংখ্যা কম হওয়ায় অধিকাংশ শিক্ষকের পদোন্নতির সুযোগ সীমিত এবং সহকারী শিক্ষক পদ থেকে অবসর গ্রহণ করে থাকেন। বর্তমানে 'সহকারী অধ্যাপক' পদটিকে পরিবর্তন করে 'জ্যেষ্ঠ প্রভাষক' পদ করা হয়েছে।

শিক্ষা ক্যাডারে ব্যাচভিত্তিক পদোন্নতি না হয়ে বিষয়ভিত্তিক পদোন্নতি দেওয়ায় ব্যাচ অনুযায়ী সব শিক্ষকের পদোন্নতির সুযোগ থাকে না। সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদ থেকে উচ্চক্রম অনুযায়ী পদসংখ্যা কম হওয়ায় অধিকাংশ শিক্ষকের পদোন্নতির সুযোগ সীমিত এবং সহকারী শিক্ষক পদ থেকে অবসর গ্রহণ করে থাকেন। তবে ইতিমধ্যে সহকারী শিক্ষক পদ থেকে সহকারী প্রধান শিক্ষক পদের মধ্যবর্তী 'সিনিয়র শিক্ষক' পদ সৃজন করা হয়েছে এবং ৫ হাজার ৪৫২ জন শিক্ষককে সিনিয়র শিক্ষক পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে।

প্রশিক্ষণ

শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন প্রকল্প থেকে আইসিটি, বিষয়ভিত্তিক, সৃজনশীল ইত্যাদি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের কার্যকর প্রয়োগে ঘাটতি রয়েছে। যেমন বেসিক টিচার্স প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে শিক্ষকের কাছে ব্যক্তিগত ল্যাপটপ না থাকায় হাতে-কলমে শিখতে পারছেন না। সহকারী শিক্ষকদের আইসিটিবিষয়ক সিপিডি (continuous professional development) প্রশিক্ষণে প্র্যাকটিক্যাল প্রয়োগ অপেক্ষা মৌখিক প্রশিক্ষণের ওপর অধিক গুরুত্বারোপ করা হয়। ইন-হাউস প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে পরবর্তী সময়ে নিজস্ব প্রতিষ্ঠানে সঠিকভাবে প্রয়োগে দুর্বলতা রয়েছে। জানা যায়, ছয় দিনের ইন-হাউস প্রশিক্ষণটি কোথাও তিন দিনে, কোথাও আধা বেলা করে তিন থেকে ছয় দিনে নামেমাত্র অনুষ্ঠিত হয়েছে। সব ক্ষেত্রে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম (এমএমসি) না থাকায় এবং এমএমসির উপকরণ নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ না হওয়ায় মাল্টিমিডিয়া ক্লাস এবং ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরির চর্চার ঘাটতিতে মানসম্পন্নভাবে মাল্টিমিডিয়া ক্লাস পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না।

এ ছাড়া বিষয়ভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন তৈরিতে শিক্ষকদের সক্ষমতার ঘাটতি রয়েছে। সৃজনশীল প্রশ্ন তৈরিতে প্রশিক্ষণের সময় পর্যাপ্ত না হওয়ায় শিক্ষকরা প্রশিক্ষণটির ওপর পরিপূর্ণ দক্ষতা অর্জন করতে পারছেন না। তা ছাড়া সৃজনশীল বিষয়টি কঠিন হওয়া এবং শিক্ষক পর্যাপ্ত যোগ্য না হওয়ায় নিজেরা সঠিকভাবে সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্ন প্রণয়ন করতে পারছেন না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানাগারে প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক উপকরণের ঘাটতি রয়েছে। সর্বোপরি প্রশিক্ষণের কার্যকর প্রয়োগে কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিক্ষকদের আগ্রহ ও আন্তরিকতারও অভাব রয়েছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানায়।

অবকাঠামো ও লজিস্টিকস

অধিকাংশ উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস অনেক পুরোনো ও জরাজীর্ণ ভবনে অবস্থিত। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসে কর্মরত সবার বসার যথাযথ ব্যবস্থা নেই, অধিকাংশ শিক্ষা

অফিসে শিক্ষা উপকরণ বা বইপত্র রাখার পৃথক স্থান নেই এবং প্রয়োজনীয় আসবাবের অভাবে গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র সংরক্ষণে ঘাটতি রয়েছে। মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম ও আইসিটি ল্যাবের মনিটর, প্রজেক্টর, প্রিন্টার, ল্যাপটপ, কিবোর্ড ইত্যাদি নষ্ট হলে দ্রুত তা মেরামতের ব্যবস্থা নেই।

স্বচ্ছতা

সরকারি কাজে স্বচ্ছতা নিশ্চিতে তথ্যের প্রাপ্তি, সংরক্ষণ ও উন্মুক্ততা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বর্তমানে মাউশি অধিদপ্তরের প্রায় সব কার্যক্রম অনলাইনে হয়ে থাকে। তারপরও মাউশি অধিদপ্তর কর্তৃক মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে তথ্যের ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা রয়েছে। যেমন কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমপিও-প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও প্রতিষ্ঠানপ্রধানের এমপিও-সম্পর্কিত হালনাগাদ তথ্য জানা থাকে না বা জানার ক্ষেত্রে আগ্রহের ঘাটতি রয়েছে। এতে শিক্ষক এমপিওর ক্ষেত্রে সময়ক্ষেপণ ও বিড়ম্বনা তৈরি হয়। শিক্ষক ও কর্মচারীর এমপিওর প্রক্রিয়াটি অনলাইন করা হলেও সফটওয়্যারটি সহজবোধ্য ও কার্যকর না হওয়ায় এর পুরোপুরি সুফল পাচ্ছেন না শিক্ষকরা। যেমন আবেদনের সময় শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠান-সম্পর্কিত সব তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে আসে না এবং আবেদনে কোনো ভুল হলে নির্দেশনা দেওয়ার ব্যবস্থা নেই। এতে এমপিওর ফরম পূরণের ক্ষেত্রে ভুল হয়ে থাকলে পরে আবেদনটি শিক্ষা কার্যালয় থেকে ফেরত পাঠানো হয় এবং পুনরায় আবেদন করতে হয়। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবেদন বাতিলের সুনির্দিষ্ট কারণ না লিখে ‘আবেদন অসম্পূর্ণ’ লেখা হয়। এতে পরে আবেদন করলে প্রতিটি তথ্য নতুন করে যাচাই করতে হয়। অনলাইন এমপিও-প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন সনদ যাচাইয়ে ব্যবস্থা রাখা হয়নি।

এমপিওভুক্ত অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও কর্মচারীকে আবেদন-পরবর্তী অবসর ভাতা পাওয়ার সুনির্দিষ্ট তারিখ জানানো হয় না। এতে আবেদনকারী আবেদন করেই বিভিন্ন জনের সঙ্গে যোগাযোগ ও তদবিরের চেষ্টা করে থাকেন। কলেজের শিক্ষকদের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন (এসিআর) অনলাইনে সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেই। মাউশি অধিদপ্তরে জমাকৃত এসিআর ‘হারিয়ে যাওয়ার’ অভিযোগ রয়েছে এবং এতে শিক্ষকদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে বিড়ম্বনায় পড়তে হয়। পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নিরীক্ষার যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণে ডিজিটাল ব্যবস্থা নেই। যে কারণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষা-সম্পর্কিত আপত্তি ও যাবতীয় তথ্য সবার জানার সুযোগ থাকে না।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে শুধু ২০১৭-১৮ থেকে ২০১৮-১৯ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন রয়েছে। প্রতিবেদনে সংশ্লিষ্ট অর্থবছরে সম্পাদিত কর্মের তথ্য বিবরণী দিয়ে পৃথক পৃথক প্রতিবেদন তৈরি করা হলেও কোনো কোনো বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তথ্যের অনুপস্থিতি রয়েছে, যেমন জনবল, বাজেট, নিরীক্ষা, তদন্তাধীন মামলা ইত্যাদি।

জবাবদিহি

শিক্ষা খাতের উন্নয়নে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও জনবল স্বল্পতায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো নিয়মিত তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শন করা সম্ভব হয় না। উপজেলা মাধ্যমিক

শিক্ষা অফিসারদের প্রতি মাসে ১৫টি, জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের প্রতি মাসে ১৫টি এবং আঞ্চলিক উপপরিচালকদের প্রতি মাসে ২৫টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের একাডেমিক ও প্রশাসনিক পরিদর্শনের জন্য বলা হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটি করা হয় না। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের কেউ মাসে দুটি থেকে চারটি আবার কেউ ছয়টি থেকে সাতটি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে থাকেন। জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের এবং আঞ্চলিক উপপরিচালকদের ক্ষেত্রে এটি খুবই সীমিত পরিসরে হয়ে থাকে। এ ছাড়া শিক্ষা কর্মকর্তাদের প্রতি সপ্তাহে কমপক্ষে একটি প্রতিষ্ঠান আকস্মিক পরিদর্শনের জন্য বলা হলেও তা নিয়মিত করা হয় না।

পরিদর্শনে প্রতিষ্ঠানপ্রধান বা কমিটির কোনো ধরনের আর্থিক দুর্নীতি অথবা অনিয়ম সম্পর্কে জানা গেলেও রাজনৈতিক প্রভাব বা হেনস্তার কারণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন ব্যস্ততা দেখিয়ে মাঠপর্যায়ের মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তারা পরিদর্শন প্রতিবেদন অনেক ক্ষেত্রে মাউশি অধিদপ্তরে পাঠান না বলে অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতিবছর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো পরিদর্শন ও নিরীক্ষা হওয়ার কথা বলা হলেও তা হয় না। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোয় ৩ বছর থেকে ১৩ বছর পর্যন্ত পরিদর্শন ও নিরীক্ষা হয়নি।

মাঠপর্যায়ের প্রশাসনিক পদগুলোয় সমন্বিত জনবলকাঠামোর অনুপস্থিতিতে দক্ষ শিক্ষা প্রশাসন পরিচালনায় ঘাটতি লক্ষণীয়। যেমন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তারা দীর্ঘদিন প্রশাসনিক কাজ করতে করতে প্রশাসনিক দক্ষতা অর্জন করেছেন; তবে তাদের খসড়া নিয়োগবিধিটি চূড়ান্ত অনুমোদন পায়নি। অন্যদিকে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের শিক্ষক পদ থেকে পদায়ন দেওয়ায় তারা ওই কার্যালয় গত সময়ে কী ধরনের কাজ করেছেন বা প্রশাসনিক বিভিন্ন নিয়মকানুন ইত্যাদি সম্পর্কে জানেন না, অর্থাৎ শিক্ষা প্রশাসন পরিচালনায় দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে। আবার নয়টি অঞ্চলের উপপরিচালক কার্যালয়ের উপপরিচালক পদটি সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক থেকে পদায়ন দেওয়া হয় এবং ভারপ্রাপ্ত হিসেবে পদায়িত। এতে মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসগুলোর মধ্যে সমন্বয় থাকছে না।

এমপিও আবেদন নিষ্পত্তিতে অনিয়ম বা ভুলের পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্ট সমস্যায় শিক্ষা অফিসগুলোর মধ্যে জবাবদিহি কাঠামোর অনুপস্থিতি রয়েছে। নয়টি শিক্ষা অঞ্চলের উপপরিচালক কার্যালয় থেকে মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষক ও কর্মচারীর এমপিওর চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হলেও আঞ্চলিক কার্যালয়ের পরিচালক (কলেজ) পদের দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করা হয়নি। আঞ্চলিক কার্যালয়ের পরিচালক (কলেজ) পদ সৃষ্টির দীর্ঘ প্রায় চার বছর পর (১১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখের পরিপত্র) শুধু কলেজের এমপিও নিষ্পত্তির ক্ষমতা পরিচালককে (কলেজ) প্রদান করা হয়। এ দুটি পদ শিক্ষকদের মধ্য থেকে পদায়ন দেওয়া হলেও তাদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব রয়েছে। আবার উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজাররা সেসিপ প্রকল্পাধীন বিধায় অন্যত্র চাকরি হলে চলে যাচ্ছেন এবং চাকরি অস্থায়ী হওয়ায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে গেলে তাদের সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা হয় না বলে কেউ কেউ মনে করেন। এতে শিক্ষা কার্যালয়গুলোয় সমন্বয়হীনতায় জবাবদিহি নিশ্চিতে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে।

এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানসহ সব শিক্ষক ও কর্মচারীর কাজের বার্ষিক মূল্যায়ন এবং বদলির ব্যবস্থা নেই। মাউশি অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় এবং মাঠপর্যায়ের শিক্ষা অফিসগুলোয় কোনো কোনো কর্মকর্তা অফিস সময় ঠিকভাবে মেনে চলেন না। শিক্ষা কার্যক্রমে যেকোনো ধরনের সমস্যা, অনিয়ম বা দুর্নীতির অভিযোগ সরাসরি জানানোর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা নেই। মাউশি অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়াধীন বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব হলেও এর জন্য কার্যকর জবাবদিহি নেই। উপবৃত্তিপ্রাপ্তদের তালিকা যাচাইয়ের ব্যবস্থা নেই। ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনিয়মের মাধ্যমে উপবৃত্তির তালিকা তৈরি করা হয়।

অনিয়ম ও দুর্নীতি

এমপিওভুক্তি

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তি : কোনো কোনো ক্ষেত্রে নীতিমালা লঙ্ঘন করে দুর্নীতি ও অনিয়মের মাধ্যমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। ২০১০ সালের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তিতেও দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ ছিল।

শিক্ষক ও কর্মচারী এমপিওভুক্তি : বর্তমানে শিক্ষক ও কর্মচারীর এমপিওভুক্তির জন্য অনলাইনে প্রতিষ্ঠানের পক্ষে প্রধান শিক্ষক উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস বরাবর আবেদন করে থাকেন। পরে আবেদন গ্রহণ ও নথি যাচাই-বাছাই সাপেক্ষে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস থেকে জেলা শিক্ষা অফিসে এবং জেলা শিক্ষা অফিস থেকে উপপরিচালকের কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়। উপপরিচালকের কার্যালয় থেকে এমপিওর চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়। এমপিওভুক্তির প্রক্রিয়া বিকেন্দ্রীকরণ এবং অনলাইন হওয়ার পরেও শিক্ষক ও কর্মচারীর ভোগান্তি এবং অনিয়ম ও দুর্নীতি আগের মতোই বিদ্যমান। বর্তমানে চারটি স্থানে 'হাদিয়া' বা 'সম্মানী' দিয়ে এমপিওভুক্ত হওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

অনেক ক্ষেত্রে এমপিও-প্রক্রিয়ায় প্রধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষ কর্তৃক আবেদনকারী শিক্ষকের সঙ্গে চুক্তি এবং এমপিও আবেদন অগ্রায়নে 'শিক্ষা অফিসে এবং কমিটির সুপারিশের জন্য অর্থ লাগবে' বলে প্রতিষ্ঠানপ্রধান কর্তৃক আবেদনকারীর কাছ থেকে অর্থ আদায় করে থাকেন। অর্থ না দিলে আবেদনে ত্রুটি ধরা, অগ্রায়ন না করা, নথিগত সমস্যার কথা বলে সময়ক্ষেপণ করা হয়। এ ছাড়া প্রাপ্যতা না থাকা সত্ত্বেও নিয়মবহির্ভূত অর্থের বিনিময়ে এমপিওভুক্তির অভিযোগ রয়েছে। এমপিও-প্রক্রিয়া বিকেন্দ্রীকরণে একটি শিক্ষা অঞ্চলে পাইলটিং প্রকল্প চালু এবং এর ফলাফলের ভিত্তিতে অন্যান্য অঞ্চলে এটি চালু করার পরিকল্পনা থাকলেও তা করা হয়নি। অভিযোগ রয়েছে, বিকেন্দ্রীকরণ পদ্ধতিতে আর্থিক দুর্নীতির সুযোগ তৈরি হওয়ায় পাইলটিং প্রকল্পের ফলাফলের অপেক্ষা না করে সব শিক্ষা অঞ্চলে এটি চালু করা হয়।

এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়োগ

শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগ : বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক, অধ্যক্ষ, সহকারী গ্রন্থাগারিক, অফিস সহকারী ও এমএলএস নিয়োগে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হলো

বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি বা গভর্নিং বডি। অন্যদিকে বিষয়ভিত্তিক সহকারী শিক্ষক ও প্রভাষক নিয়োগে কর্তৃপক্ষ হলো শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)।

এসএমসি বা গভর্নিং বডি কর্তৃক নিয়োগে অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব, স্বজনপ্রীতি ও নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়ের মাধ্যমে পছন্দের প্রার্থী নিয়োগের অভিযোগ রয়েছে। এনটিআরসিএ কর্তৃক সুপারিশকৃত শিক্ষকের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যোগদানেও নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়ের অভিযোগ রয়েছে। জানা যায়, 'প্রতিষ্ঠানের তহবিলে, উন্নয়নমূলক কাজে অথবা আগে এসএমসি বা গভর্নিং বডি কর্তৃক আপনাদের নিয়োগে অনেক টাকা দিতে হতো'– এটি বলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃক ওই অর্থ আদায় করা হয়ে থাকে। শিক্ষক নিবন্ধন সনদ, কম্পিউটার ও অন্যান্য একাডেমিক সনদ জালিয়াতির মাধ্যমে সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগ পাওয়ারও অভিযোগ রয়েছে।

শিক্ষক ও কর্মকর্তা বদলি

সরকারি চাকরি বিধিমালা অনুযায়ী তিন বছর পরপর বদলির বিধান থাকলেও তা নিয়মিত করা হয় না। অনেক শিক্ষক ও কর্মকর্তা আছেন যারা দীর্ঘদিন একই স্থানে কর্মরত রয়েছেন। কেউ ঢাকায় বা বিভাগীয় শহরে থাকার জন্য আবার কেউ প্রাইভেট বা কোচিংয়ের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনে ঢাকায় বা যেখানে এর সুবিধা রয়েছে, সেখানে দীর্ঘদিন অবস্থান করছেন। উদাহরণস্বরূপ, সরকারি হাইস্কুল এবং কলেজের একজন শিক্ষক দীর্ঘ ১০ বছর বা এর অধিক একই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত রয়েছেন এবং উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে এটি ১০ থেকে ১২ বছর বা এর অধিক। তদবির ও নিয়মবহির্ভূত অর্থের মাধ্যমে বদলি বা পছন্দনীয় স্থানে দীর্ঘদিন অবস্থানের অভিযোগ রয়েছে।

পাঠদান অনুমোদন ও একাডেমিক স্বীকৃতি

পাঠদান ও একাডেমিক স্বীকৃতির অনুমোদন শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বোর্ডের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। এতে অনেক ক্ষেত্রে তদবির, নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায় এবং প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রতার অভিযোগ রয়েছে। জানা যায়, অনেক ক্ষেত্রে প্রাপ্যতা না থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক সুপারিশে দূরত্ব সনদ ও জনসংখ্যার সনদ নেওয়া এবং ঊর্ধ্বতন পর্যায়ে তদবিরের মাধ্যমে পাঠদান অনুমোদন নেওয়া হয়। বোর্ড কর্তৃক পরিদর্শন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে মন্ত্রণালয় থেকে পাঠদান অনুমোদন দেওয়া হয়। তবে পরিদর্শন প্রতিবেদন যাচাইয়ের ব্যবস্থা নেই। সংশ্লিষ্ট অংশীজনের বক্তব্য অনুযায়ী, ৩০ শতাংশ পরিদর্শন প্রতিবেদনে ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে।

সব শর্ত পূরণ হওয়া সত্ত্বেও অনুমোদন-প্রক্রিয়ায় বিড়ম্বনা, যেমন আবেদন-পরবর্তী পরিদর্শনের জন্য বোর্ডে যোগাযোগ করা, নতুবা পাঠদান অনুমোদনে বিলম্ব বা পরিদর্শনে না আসা এবং নির্ধারিত অর্থের অতিরিক্ত আদায়ের অভিযোগ রয়েছে। কখনো কখনো রাজনৈতিক নেতা বা মধ্যস্বত্বভোগী সংশ্লিষ্ট দপ্তরে তদবিরের মাধ্যমে পাঠদান অনুমোদনের ব্যবস্থা করে থাকে, যার বিনিময়ে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে আর্থিক সুবিধা আদায়ের অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া অতিরিক্ত শ্রেণি শাখা,

বিভাগ, বিষয় অনুমোদনে এবং শিক্ষকদের বিএড ও উচ্চতর স্কেল অনুমোদনে নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়ের অভিযোগ রয়েছে।

ক্রয়

আইসিটির মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার প্রচলন প্রকল্প-২-এ মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম (এমএমসি) দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে। এমএমসির সব উপকরণ একটি প্যাকেজে ক্রয়ের কথা বলা হলেও পৃথক প্যাকেজে ক্রয়ের অর্ডার দেওয়া হয় এবং উপকরণগুলো প্রকল্প মূল্য অপেক্ষা অতিরিক্ত ধরা হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সময় স্বল্পতা ইত্যাদি কারণ না থাকা সত্ত্বেও সরাসরি ক্রয়ের উদ্যোগের অভিযোগ রয়েছে। সরাসরি ক্রয়ে বেশি টাকার ভাউচার দেখিয়ে অর্থ আত্মসাতের সুযোগ সৃষ্টি এবং আর্থিক সুবিধার বিনিময়ে পছন্দনীয় ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে কাজ পাইয়ে দেওয়ার সুযোগ থাকে। সরাসরি ক্রয়ে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠায় প্রকল্প পরিচালককে ওএসডি করা হয়। ওই প্রকল্পের আওতায় (জুলাই ২০১৬ থেকে জুন ২০১৯ পর্যন্ত) একটি মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষও স্থাপন করা হয়নি, পাঁচটি শিক্ষা অঞ্চলে শুধু মডেম সরবরাহ করা হয়। জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি মাত্র ৮ শতাংশ।

এই প্রকল্পে প্রশিক্ষণের নামে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ ওঠে। প্রশিক্ষণের জন্য দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়ে দরপত্র আহ্বান করা হয়নি। কোটেশন ছাড়া প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল এবং প্রশিক্ষণ সনদ ছাপানো হয়েছে, ক্রয়কৃত দ্রব্যসামগ্রীর কোনো স্টক এন্ট্রি করা হয়নি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণসামগ্রী ভেন্যু কর্তৃপক্ষ না পেলেও বিল পরিশোধ করা হয়েছে। দরপত্র ছাড়াই ২ কোটি ২৫ লাখ ২ হাজার টাকা প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, সার্টিফিকেট ও প্রশিক্ষণসামগ্রী বাবদ ব্যয় করা হয়। প্রশিক্ষণ খাতে অগ্রিম অর্থ উত্তোলনে প্রকল্প পরিচালকের দরপত্র ছাড়া বছরে সর্বোচ্চ ৩০ লাখ টাকা ব্যয় করার ক্ষমতা থাকলেও ৯৬ কোটি টাকা অগ্রিম তোলার ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নেওয়া হয়নি। একই সময়ে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে উপস্থিত না থেকেও সম্মানী নিয়েছেন প্রকল্পসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। জানা যায়, সব ভেন্যুতে প্রকল্প পরিচালক নিজেকে ‘প্রোগ্রাম পরিচালক’ দেখিয়ে মাত্র সাড়ে তিন মাসে প্রায় ১৭ লাখ টাকা সম্মানী গ্রহণ করেছেন, যদিও কোনো ভেন্যুতে সরেজমিন পরিদর্শন করার কোনো প্রমাণ ছিল না। ছয় দিনের ইন-হাউস প্রশিক্ষণটি কোথাও তিন দিনে, কোথাও আধাবেলা করে তিন থেকে ছয় দিনে নামমাত্র অনুষ্ঠিত হয়েছে।

পরিদর্শন ও নিরীক্ষা

পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের নিরীক্ষায় জাল সনদ, নিয়োগে অনিয়ম, অর্থ আত্মসাতসহ নানান অনিয়ম পাওয়া যায়। জানা যায়, অনিয়ম থাকা সত্ত্বেও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অনুকূলে নিরীক্ষা প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য ঊর্ধ্বতন পর্যায় থেকে কখনো কখনো প্রভাব খাটানো হয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নথির বিভিন্ন দুর্বলতাকে ব্যবহার করে নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়ে যেমন চাপ প্রয়োগ করা হয়, নথিপত্রের বিভিন্ন দুর্বলতায় পরিদর্শককে ম্যানেজ করতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পক্ষেও নিয়মবহির্ভূত অর্থ প্রদান

করা হয়। নিরীক্ষায় প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের এক বা দুই মাসের এমপিওর অর্থ দাবি ও আদায় করা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষক 'পরিদর্শনে অডিটর আসছেন' বলে শিক্ষকদের মধ্যে ভীতিকর পরিবেশ সৃষ্টি করেন এবং পরিদর্শককে ম্যানেজ করতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সব শিক্ষকের কাছ থেকে অর্থ আদায় করেন। কখনো কখনো এর একটি অংশ প্রতিষ্ঠানপ্রধান আত্মসাৎ করেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

এ ছাড়া উপপরিচালকরা পরিদর্শনে যাওয়ার আগে অনেক ক্ষেত্রে টিমে না পাঠিয়ে একা পাঠানোর জন্য পরিচালক বরাবর তদবির করেন। পরিদর্শনে সংগৃহীত নিয়মবহির্ভূত অর্থের বেশির ভাগ অংশ নিজের কাছে রাখার জন্য এই তদবির করা হয়। এ ক্ষেত্রে পরিচালককে নানা ধরনের উপঢৌকন দিয়ে ম্যানেজ করা হয়ে থাকে। নিরীক্ষায় অধিক পরিমাণে অর্থ আয়ের সুযোগ থাকায় ঊর্ধ্বতন পর্যায়ে তদবিরের মাধ্যমে দীর্ঘদিন একই দপ্তরে কর্মকর্তাদের অবস্থান করারও অভিযোগ রয়েছে।

অবকাঠামো ও লজিস্টিকস

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়নে প্রয়োজনীয়তা যাচাই না করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সুপারিশে বরাদ্দ দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। অবকাঠামো উন্নয়নে কাজের মান কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভালো হয়নি। ২০১৭ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত জাতীয়করণকৃত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের আত্তীকরণে বিলম্ব হচ্ছে, যে কারণে অনেক শিক্ষককে অবসরে যেতে হচ্ছে সরকারি সুবিধা ছাড়াই। আবার শিক্ষার্থীদের আগের মতোই টিউশন ফি দিতে হচ্ছে। জাতীয়করণ প্রক্রিয়ায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়েরও অভিযোগ রয়েছে।

অন্যান্য

কোনো কোনো ক্ষেত্রে জরুরি প্রয়োজনে, যেমন মেয়ের বিয়ে, চিকিৎসা, হজে গমন ইত্যাদি কারণে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অবসর ও কল্যাণ সুবিধা প্রদানের সুযোগ থাকায় নিয়মবহির্ভূত অর্থ খরচের মাধ্যমে সিরিয়াল ভঙ্গ করে এর যেকোনো একটি শ্রেণিতে ফেলে দ্রুত অবসর সুবিধা প্রদানের অভিযোগ রয়েছে। বিদেশে প্রশিক্ষণে সংশ্লিষ্টদের না পাঠানোর অভিযোগ রয়েছে। যেমন টিচিং কোয়ালিটি ইম্প্রুভমেন্ট (টিকিউআই-২) প্রকল্পের শিক্ষক প্রশিক্ষণে আমলার সংখ্যা বেশি ছিল বলে সংশ্লিষ্টরা জানান।

বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানে সংসদ সদস্য বা প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তির হস্তক্ষেপে সভাপতি মনোনীত করা হয়। এতে অনেকাংশে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনায় সম্পৃক্ত হতে পারেন না, যা শিক্ষার মান উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। কমিটির সভাপতি বা সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতার বাধ্যবাধকতা না থাকায় অনেক ক্ষেত্রে অশিক্ষিত লোক কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হয়। এতে করে শিক্ষকদের সঙ্গে কমিটির সদস্যদের কার্যক্রম পরিচালনায় বিভিন্ন সমস্যা ও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়।

সারণি ১ : একনজরে মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রমে বিভিন্ন খাতে নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়ের পরিমাণ

অর্থ আদায়ের খাত	নিয়মবহির্ভূত অর্থ (টাকা)	অর্থ আদায়ে জড়িত ব্যক্তির পদ
অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক/সহকারী প্রধান শিক্ষক নিয়োগ	৩,৫০,০০০-১৫,০০,০০০	স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা/ গভর্নিং বডি/এসএমসি
এনটিআরসিএ কর্তৃক সুপারিশকৃত সহকারী শিক্ষকের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যোগদান	৫০,০০০-২,০০,০০০	প্রধান শিক্ষক/গভর্নিং বডি/এসএমসি
সহকারী গ্রন্থাগারিক নিয়োগ	২,০০,০০০-৩,০০,০০০	প্রধান শিক্ষক/গভর্নিং বডি/এসএমসি
শিক্ষক এমপিওভুক্তি	৫,০০০-১,০০,০০০	মাউশির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/ কর্মচারী
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও নিরীক্ষা	পরিদর্শনকৃত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সব শিক্ষকের এক এমপিও (৫০,০০০-৫,০০,০০০)	পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা
পাঠদান অনুমোদন	১,০০,০০০-৫,০০,০০০	মধ্যস্বত্বভোগী/বোর্ড বা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী
স্বীকৃতি নবায়ন	৫,০০০-৩০,০০০	বোর্ডের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/ কর্মচারী
শিক্ষক বদলি	১,০০,০০০-২,০০,০০০	মধ্যস্বত্বভোগী/ মাউশির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী

কোভিড-১৯ অতিমারিতে মাধ্যমিক শিক্ষায় চ্যালেঞ্জ

কোভিড-১৯-এর প্রাদুর্ভাবে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার কৌশলের অংশ হিসেবে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করা হয় ২০২০ সালের মার্চে। শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে মাধ্যমিক পর্যায়ে টেলিভিশন ও অনলাইন ক্লাস এবং অ্যাসাইনমেন্টের ব্যবস্থা করা হয়। তবে কারিগরি দক্ষতা, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও ইন্টারনেট-সংযোগ এবং ডিভাইস কেনার আর্থিক সক্ষমতার অভাবে অনেক ক্ষেত্রে এটি সফল হয়নি। এক পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, মাধ্যমিকের প্রায় ১৫ শতাংশ শিক্ষার্থী সংসদ টিভির মাধ্যমে ক্লাস গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। নীতিনির্ধারণী পর্যায় থেকে বঞ্চিতদের ডিজিটাল ডিভাইজ দেওয়ার কথা বলা হলেও কোনো উদ্যোগ দেখা যায়নি। ধনী-গরিব

ও শহর-গ্রামের মধ্যে শিক্ষা পাওয়ার সুযোগের ক্ষেত্রে বৈষম্য প্রকট হয়েছে এবং শিক্ষার্থী ঝরে পড়েছে। এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদের শেখার ক্ষেত্রেও ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। সশরীরে ক্লাস বন্ধ থাকায় অনলাইনে পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পরবর্তী শ্রেণিতে উন্নীত করা হলেও এই ঘাটতি পূরণে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনার উদ্যোগ গ্রহণ করতে দেখা যায়নি।

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

সার্বিকভাবে বলা যায়, মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার বা মানোন্নয়নে সরকারের বিভিন্ন ইতিবাচক পদক্ষেপ সত্ত্বেও গুরুত্বপূর্ণ এই খাতের প্রত্যাশিত উৎকর্ষ অর্জনে এখনো ঘাটতি বিদ্যমান। ২০১০ সালে জাতীয় শিক্ষানীতি হলেও এখনো অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাস্তবায়িত হয়নি। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও নীতিগতভাবে প্রাধান্য না পাওয়ায় শিক্ষা আইনটি অদ্যাবধি পাস হয়নি। জাতীয় বাজেটে শিক্ষা খাতের বরাদ্দ আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী নয় এবং জাতীয় বাজেটে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষায় বরাদ্দ টাকার অঙ্কে ক্রমান্বয়ে বাড়লেও এটি গড়ে ৫ থেকে ৬ শতাংশের মধ্যে রয়েছে। শিক্ষক ও কর্মচারীর জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার অনুপস্থিতি রয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার মাঠপর্যায়ের প্রশাসনিক কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমন্বিত জনবল কাঠামোর অনুপস্থিতি এবং জনবল সক্ষমতার ঘাটতিতে সুষ্ঠু তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শনের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতে পদক্ষেপের ঘাটতিতে অনিয়ম ও দুর্নীতির বিস্তার হচ্ছে এবং শিক্ষা কার্যক্রম প্রক্রিয়ায় দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক প্রভাব, অনিয়ম ও আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ অব্যাহত রয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হয়েছে। সার্বিকভাবে মাধ্যমিক শিক্ষার কার্যক্রম বাস্তবায়নে আইনের ঘাটতি, প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির ঘাটতি প্রতিটি ক্ষেত্রে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান রয়েছে।

সুপারিশ

গবেষণার ফলাফলের আলোকে মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রমের বিভিন্ন সমস্যা থেকে উত্তরণে নিচের সুপারিশ প্রস্তাব করা হলো।

আইন ও নীতিসংক্রান্ত

১. শিক্ষানীতি ২০১০- এর আলোকে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে অতিদ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

২. মাঠপর্যায়ে সরাসরি রাজস্ব খাতের আওতাভুক্ত সমন্বিত জনবলকাঠামো তৈরি করতে হবে।

৩. বয়স অনুযায়ী যেসব শিক্ষার্থীর জন্য কোভিড-১৯ টিকা প্রযোজ্য, তাদের দ্রুত টিকার আওতায় আনতে হবে। অনলাইনে শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি, ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে ফিরিয়ে আনা, শিক্ষার্থীদের শেখার ঘাটতি পূরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে পদক্ষেপ নিতে হবে।

আর্থিক বরাদ্দসংক্রান্ত

৪. ইউনেসকোর সুপারিশ অনুযায়ী জাতীয় বাজেটে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে।

৫. এমপিওভুক্ত শিক্ষক ও কর্মচারীদের আর্থিক সুবিধা সামাজিক বাস্তবতার নিরিখে বৃদ্ধি করতে হবে। দ্রুত অবসর ভাতা প্রদানে বাজেটে বরাদ্দ রাখা এবং নতুন শিক্ষাক্রমে শিক্ষকদের অধিকতর দক্ষ করে তোলা এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাতে বৈষম্য দূরীকরণে প্রয়োজনীয় অর্থ ও অন্যান্য বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে হবে।

৬. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সরবরাহকৃত ল্যাপটপ, প্রজেক্টরসহ অন্যান্য উপকরণ রক্ষণাবেক্ষণে প্রতিষ্ঠানগুলোর অনুকূলে আর্থিক বরাদ্দ প্রদান করতে হবে।

মানবসম্পদ

৭. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের খসড়া নিয়োগবিধি দ্রুত চূড়ান্ত করতে হবে।

৮. বেসরকারি সব নিয়োগ এনটিআরসিএ বা বেসরকারি শিক্ষক নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে।

৯. শিক্ষকদের পদোন্নতির সুযোগ বৃদ্ধিতে পদক্রম বৃদ্ধি করতে হবে।

প্রশিক্ষণ

১০. প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ওপর কার্যকর মূল্যায়নে নিবিড় পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

১১. প্রশিক্ষণের ওপর পরিপূর্ণ দক্ষতা ও জ্ঞান অর্জনে প্রশিক্ষণের মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হবে।

অবকাঠামো ও লজিস্টিকস

১২. সব ধরনের ক্রয় ই-জিপির মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে।

১৩. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সরবরাহকৃত আইসিটি উপকরণের হালনাগাদ তথ্য সংরক্ষণে একটি কেন্দ্রীয় তথ্যভান্ডার থাকতে হবে।

১৪. সরকারিভাবে বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নিজস্ব উদ্যোগে প্রতিটি শ্রেণিকক্ষ পর্যায়ক্রমে স্থায়ী মাল্টিমিডিয়ার আওতায় আনতে হবে।

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি

১৫. দরপত্র, কার্যাদেশ, প্রকল্পের ক্রয় ও নিরীক্ষাসংক্রান্ত সব হালনাগাদ তথ্য সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

১৬. মনিটরিং অ্যান্ড ইভাল্যুয়েশন উইংয়ের প্রকাশিত বার্ষিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনে বিভিন্ন প্রকল্পের অনিয়ম-দুর্নীতি এবং দুর্বলতার কারণ সুনির্দিষ্টভাবে তুলে ধরতে হবে।

১৭. এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বার্ষিক মূল্যায়নের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

অনিয়ম-দুর্নীতি

১৮. শিক্ষক ও কর্মচারী এমপিওর অনলাইন সফটওয়্যারটি আরও সহজবোধ্য এবং ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু করতে হবে।

১৯. বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অনিয়ম-দুর্নীতি বন্ধে এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পর্যায়ক্রমে জাতীয়করণ করতে হবে।

২০. বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনায় কমিটির সভাপতি ও সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারণ করতে হবে।

করোনাভাইরাস সংকট মোকাবিলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ : দ্বিতীয় পর্ব*

মো. জুলকারনাইন, মোহাম্মদ নূরে আলম, মোরশেদা আক্তার,
তাসলিমা আকতার ও মনজুর ই খোদা

গবেষণার প্রেক্ষাপট

করোনাভাইরাস ডিজিজ-২০১৯ (কোভিড-১৯) সংক্রামক রোগটি বর্তমানে বিশ্বব্যাপী অন্যতম জনস্বাস্থ্যসংকট হিসেবে বিবেচিত। ২০২০ সালের ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত সারা বিশ্বের ১৮৮টি দেশে ৪ কোটি ৫৪ লাখ ২৮ হাজার ৭৩১ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয় এবং ১১ লাখ ৮৫ হাজার ৭২১ জন মৃত্যুবরণ করে। স্বাস্থ্য সমস্যার পাশাপাশি সারা বিশ্বে শিক্ষা, আয় ও কর্মসংস্থান, বিশ্ব বাণিজ্য, খাদ্যনিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ের ওপর করোনাভাইরাসের প্রভাব লক্ষ করা যায়। বাংলাদেশে প্রথম ৮ মার্চ করোনা আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয় এবং ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত বাংলাদেশে মোট ৪ লাখ ৭ হাজার ৬৮৪ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয় এবং ৫ হাজার ৯২৩ জন মৃত্যুবরণ করে। মোট আক্রান্তের সংখ্যার হিসাবে বাংলাদেশ বর্তমানে সারা বিশ্বের মধ্যে ২০তম অবস্থানে রয়েছে। তবে রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণাপ্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর) ও আইসিডিডিআরবির একটি যৌথ জরিপের মাধ্যমে জানা যায়, জুলাইয়ের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত ঢাকায় আক্রান্তের হার ৪৫ শতাংশ। অর্থাৎ ঢাকার প্রায় এক কোটি মানুষ আক্রান্ত হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, পরবর্তী তিন মাসে আক্রান্তের হার ৬০-৬৫ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি হয়েছে। দেশে করোনার সংক্রমণের মাত্রা সাম্প্রতিক সময়ে কমে এলেও এটি এখনো একটি বড় ধরনের স্বাস্থ্যঝুঁকি হিসেবে বিরাজমান। করোনার প্রভাবে সারা বিশ্বের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশেও সরকারি ও বেসরকারি কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়েছে এবং স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, কর্মসংস্থানসহ সামগ্রিক অর্থনীতি দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতির সম্মুখীন।

টিআইবি দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন খাত ও প্রতিষ্ঠান নিয়ে গবেষণা এবং অধিপরামর্শমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে, যার মধ্যে স্বাস্থ্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি খাত। ইতিপূর্বে টিআইবি করোনাভাইরাস মোকাবিলায় প্রাক-সংক্রমণ প্রস্তুতিমূলক পর্যায়ে ও সংক্রমণ শুরুর প্রথম তিন মাসে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে, যা ১৫ জুন ২০২০ তারিখে প্রকাশিত হয়। ওই গবেষণায় সংক্রমণের প্রথম তিন মাসের মধ্যে করোনাভাইরাস মোকাবিলায় সরকারের গৃহীত

---

* ২০২০ সালের ১০ নভেম্বর ঢাকায় ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশিত গবেষণার সারসংক্ষেপ।

কার্যক্রমে সুশাসনের প্রতিটি নির্দেশকের ক্ষেত্রে ব্যাপক ঘাটতি লক্ষ করা যায়। এর ধারাবাহিকতায় পরবর্তী সময়ে করোনাভাইরাস মোকাবিলায় সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমে কী ধরনের অগ্রগতি সাধিত হয়েছে এবং কী ধরনের নতুন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে, তা সুশাসনের আলোকে পর্যবেক্ষণ করার উদ্দেশ্যে টিআইবি এই দ্বিতীয় দফা গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি

এই গবেষণার উদ্দেশ্য করোনাভাইরাস মোকাবিলায় সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা। এ গবেষণাটি মূলত মিশ্র পদ্ধতিনির্ভর। গুণগত, পরিমাণগত এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় ধরনের তথ্য এই গবেষণায় ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহপদ্ধতি ও তথ্যের উৎস

জরিপের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ : পরিসংখ্যান বিজ্ঞানের পরীক্ষিত পদ্ধতি ব্যবহার করে অনলাইন ও টেলিফোন জরিপের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ, ত্রাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান-সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

সারণি ১ : গবেষণায় ব্যবহৃত জরিপ পদ্ধতি

<table>
<tr><th colspan="2">জরিপ</th><th>নমুনায়ন পদ্ধতি</th><th>গবেষণা এলাকা (জেলা)</th><th>নমুনার সংখ্যা</th></tr>
<tr><td colspan="2">স্বাস্থ্যসেবা গ্রহীতা</td><td>কোভিড ও নন-কোভিড সেবা গ্রহীতার টেলিফোন ও অনলাইন সাক্ষাৎকার</td><td>৪৭</td><td>১,০৯১</td></tr>
<tr><td rowspan="2">সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির উপকারভোগী</td><td>নগদ অর্থ প্রণোদনা</td><td rowspan="2">প্রতিটি এলাকা থেকে ৩০ জন নগদ সহায়তা ও ৩০ জন ওমমএস উপকারভোগী নির্বাচন</td><td>৩৫</td><td>১,০৫০</td></tr>
<tr><td>ওএমএস কার্ড</td><td>৩২</td><td>৯৬০</td></tr>
<tr><td colspan="2">স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান</td><td>গবেষণা এলাকার কোভিডের জন্য নির্ধারিত জেলাপর্যায়ের প্রতিটি হাসপাতালের একাধিক স্বাস্থ্যকর্মীর কাছ থেকে যাচাই-বাছাইপূর্বক তথ্য সংগ্রহ</td><td>৩৫</td><td>৩৭ (মেডিকেল কলেজ ৭টি ও জেলা হাসপাতাল ৩০টি)</td></tr>
</table>

গুণগত তথ্য সংগ্রহ : মুখ্য তথ্যদাতাদের সঙ্গে টেলিফোন সাক্ষাৎকার এবং ৪৩টি জেলায় স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে দলীয় আলোচনা থেকে গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

পরোক্ষ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ও তথ্যের উৎস

সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন কার্যালয়ের তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত তথ্য এবং গণমাধ্যমে (প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক) প্রকাশিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ গবেষণায় ১৬ জুন থেকে ৩১ অক্টোবর ২০২০ পর্যন্ত সময়ের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

গবেষণার আওতা

আগের গবেষণার ধারাবাহিকতায় করোনাভাইরাস এবং এর অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবিলায় গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে নিচের আটটি বিষয়ে এই গবেষণায় তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে:

১. করোনা প্রতিরোধে পরিকল্পনা ও কৌশল প্রণয়ন।

২. করোনাভাইরাসের সংক্রমণ চিহ্নিতকরণ (পরীক্ষাগার সক্ষমতা, প্রস্তুতি ও পরীক্ষা কার্যক্রম)।

৩. করোনায় আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসাব্যবস্থা (হাসপাতালের সক্ষমতা, প্রস্তুতি ও সেবা)।

৪. সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ (হাসপাতাল পর্যায়ে স্বাস্থ্যকর্মীর নিরাপত্তা)।

৫. কমিউনিটি পর্যায়ে সংক্রমণ বিস্তার রোধ (স্ক্রিনিং, আইসোলেশন, কোয়ারেন্টাইন, লকডাউন)।

৬. সরকারি ক্রয় ও সরবরাহ।

৭. করোনাভাইরাসের প্রভাব মোকাবিলায় প্রণোদনা কর্মসূচি।

৮. ত্রাণ ও সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি।

বিশ্লেষণ কাঠামো

এ গবেষণায় করোনাভাইরাস মোকাবিলা কার্যক্রমের ক্ষেত্রে এবং টিআইবির দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে গৃহীত কার্যক্রমের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক সুশাসন নির্দেশকগুলোর আলোকে গবেষণায় আওতাভুক্ত বিষয়কে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এসব নির্দেশক হচ্ছে আইনের শাসন, দ্রুত সাড়াদান, সক্ষমতা ও কার্যকারিতা, অংশগ্রহণ ও সমন্বয়, জবাবদিহি, স্বচ্ছতা এবং অনিয়ম ও দুর্নীতি।

গবেষণার ফলাফল

এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত সুশাসনের সাতটি সূচকের আলোকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখা যায়, করোনা মোকাবিলায় সরকারের গৃহীত কার্যক্রমে আগের চেয়ে কিছু ক্ষেত্রে উন্নতি হলেও করোনাভাইরাস মোকাবিলা কার্যক্রমে সুশাসনের প্রতিটি নির্দেশকের ক্ষেত্রে এখনো ঘাটতি বিদ্যমান। নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

আইনের শাসন

প্রাসঙ্গিক আইন অনুসরণে ঘাটতি লক্ষ করা যায়। সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য দেশে সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন-২০১৮ রয়েছে, যা বাস্তবায়নের মাধ্যমে মহামারি করোনাভাইরাস তথা সব ধরনের রোগ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। এ ছাড়া দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২-এ মহামারি সৃষ্টিকারী যেকোনো ব্যাধিকে দুর্যোগ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, যা করোনা মোকাবিলার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিক। কিন্তু বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হওয়া সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত এই আইন দুটিই যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে না।

করোনা মোকাবিলায় স্বাস্থ্য খাতে বিদেশি অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্পসহ বিভিন্ন ক্রয়ে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা (পিপিআর) ২০০৮ অনুসরণের ক্ষেত্রেও ঘাটতি লক্ষ করা যায়। যার মধ্যে ই-গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) অনুসরণ না করা, সরাসরি ক্রয়ের ক্ষেত্রে একজন সরবরাহকারীর কাছ থেকে দর প্রস্তাব গ্রহণ, সরাসরি ক্রয়ের ক্ষেত্রে নির্ধারিত ক্রয়মূল্য সীমা লঙ্ঘন, মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক পেশাগত, কারিগরি দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা সনদ এবং প্রমাণপত্র যাচাই না করা। মালামাল ক্রয়ে সুনির্দিষ্ট বিনির্দেশ প্রস্তুত করতে কারিগরি উপকমিটি গঠন না করা উল্লেখযোগ্য।

সাড়াদান

পরীক্ষাগার ও নমুনা পরীক্ষার সম্প্রসারণে ঘাটতি : একটি দেশে পর্যাপ্ত পরীক্ষা হচ্ছে কি না, তা আক্রান্ত ব্যক্তির শনাক্তের হার (Positivity rates) দ্বারা বোঝা যায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশনা অনুযায়ী একটি দেশে শনাক্তের হার মোট নমুনা পরীক্ষার ৫ শতাংশ হওয়া উচিত। এর বেশি হলে ওই দেশে প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত পরীক্ষা করা হচ্ছে বলে নির্দেশ করে। বাংলাদেশে ১৬ জুন থেকে ৩১ অক্টোবর ২০২০ পর্যন্ত গড় শনাক্তের হার ছিল ১৭ দশমিক ৪ শতাংশ (সর্বোচ্চ ৩১ দশমিক ৯ শতাংশ)।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নমুনা পরীক্ষা বৃদ্ধি করতে প্রণোদনাসহ বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে দেখা যায়। ভারতে পরীক্ষার সংখ্যা বৃদ্ধি করতে বিভিন্ন এলাকার কয়েকটি মেডিকেল প্রতিষ্ঠানে ১৪টি মেন্টর প্রতিষ্ঠান তৈরি করা হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান তাদের নিজ এলাকার সরকারি ও বেসরকারি পরীক্ষাগারগুলোর মধ্যে নেটওয়ার্ক তৈরির মাধ্যমে পরীক্ষার সম্প্রসারণ, নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে তৃণমূল পর্যায়ে পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ, ব্যাপক মাত্রায় অ্যান্টিজেন পরীক্ষা, মান নিশ্চিত করতে নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি ব্যবস্থা, দ্রুততার সঙ্গে উপকরণ ও যন্ত্রপাতির চাহিদা নিরূপণ ও সরবরাহে ওয়েবভিত্তিক সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থাপনা প্রচলন, পরিস্থিতি বিবেচনায় দুই দফা বেসরকারি পরীক্ষার ফি হ্রাস ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ভারত এপ্রিলের শুরুতে দিনে চার হাজার পরীক্ষার সক্ষমতা হতে অক্টোবরে দিনে ১৫ লাখ পরীক্ষার সক্ষমতা অর্জন করেছে। এ ছাড়া অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়া প্রদেশে নমুনা পরীক্ষার প্রতিবেদন না পাওয়া পর্যন্ত আইসোলেশনের জন্য ৪৫০ অস্ট্রেলিয়ান ডলার এবং আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত হলে বা আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে এলে তাকে আইসোলেশনে থাকতে উৎসাহ দিতে ১ হাজার ৫০০ ডলার প্রণোদনা ঘোষণা করা হয়।

অন্যদিকে বাংলাদেশের 'জাতীয় প্রস্তুতি ও সাড়াদান পরিকল্পনা'য় সংক্রমণ বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সংক্রমণের ঝুঁকিতে থাকা ব্যক্তির পরীক্ষা, সংক্রমণের প্রবণতা অনুধাবন এবং অন্যান্য কৌশলের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করতে সারা দেশব্যাপী পরীক্ষার সক্ষমতা বৃদ্ধি/সম্প্রসারণের কথা বলা হলেও সারা দেশে ২৯টি জেলায় ১১৩টি পরীক্ষাগার করা হয়েছে। বাকি ৩৫টি জেলায় কোনো পরীক্ষাগার নেই, অন্য জেলা থেকে পরীক্ষা করতে হয়। বিভিন্ন জেলায় কোন ভিত্তিতে পরীক্ষাগার করা হয়েছে, সে বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায় না। জেলা পর্যায়ে পরীক্ষাগার করার ক্ষেত্রে আক্রান্তের সংখ্যা ও শনাক্তের হার বিবেচনা করা হয়নি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, পঞ্চগড়, মুন্সিগঞ্জ এবং বান্দরবানে শনাক্তের হার যথাক্রমে ২৫ দশমিক ৩, ২৪ দশমিক শূন্য এবং ২২ দশমিক ৮ শতাংশ। উচ্চ শনাক্তের হার নির্দেশ করছে যে এই জেলাগুলোয় পর্যাপ্ত পরীক্ষা হচ্ছে না, কিন্তু এই জেলাগুলোয় কোনো পরীক্ষাগারের ব্যবস্থা করা হয়নি। সারা দেশে বিভিন্ন জেলায় উচ্চমাত্রার শনাক্তের হার বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও ১৫ জুন ২০২০ পরবর্তী সাড়ে চার মাসে মাত্র নতুন আটটি জেলায় পরীক্ষাগার সম্প্রসারণ করা হয়।

১৫ জুন-পরবর্তী সময়ে 'কারিগরি পরামর্শক কমিটি'সহ বিশেষজ্ঞরা প্রতিদিনে ২৫-৩০ হাজার পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। কিন্তু পরীক্ষাগারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও ১৫ জুন থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত গড়ে প্রতিদিন ১৩ হাজার করে পরীক্ষা করা হচ্ছে। এখন পর্যন্ত একদিনও ২০ হাজারের বেশি পরীক্ষা করতে পারেনি। ১ থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত বাংলাদেশে শনাক্তের হার সর্বোচ্চ পর্যায়ে (গড়ে ২২ দশমিক ৫ শতাংশ) পৌঁছায়, অর্থাৎ এই সময়ে পরীক্ষার প্রয়োজন সর্বোচ্চ অবস্থায় ছিল। কিন্তু ওই সময়ে জেলা পর্যায়ে পরীক্ষার সুবিধা সম্প্রসারণ না করে এবং সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও পরীক্ষার সংখ্যা বৃদ্ধি না করে বাংলাদেশে বিপরীতমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে একটি পরিপত্রে উপসর্গবিহীন ব্যক্তির নমুনা পরীক্ষাকে 'অপ্রয়োজনীয়' হিসেবে উল্লেখ করে ও পরীক্ষার চাপ কমাতে ২৯ জুন থেকে সরকারি পরীক্ষাগারে ২০০ টাকা ফি নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তী সময়ে সমালোচনার মুখে ফি ১০০ টাকা করা হলেও তা পুরো প্রত্যাহার করা হয়নি। এই সিদ্ধান্তের পর পরীক্ষার সংখ্যা ব্যাপক হ্রাস পায়।

পরীক্ষার হারের দিক থেকে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৫ জুনের মতো এখনো ৭ম অবস্থানেই আছে। আক্রান্তের দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বে ২০তম অবস্থানে থাকলেও জনসংখ্যার অনুপাতে পরীক্ষার হারের দিক থেকে বাংলাদেশ অবস্থান বিশ্বে ১৬২তম (১৫ জুনে এই অবস্থান ছিল ১৪৯তম)। নমুনা পরীক্ষার বৈশ্বিক গড়ের (১০ দশমিক ৫ শতাংশ) চেয়ে বাংলাদেশ (১ দশমিক ৫ শতাংশ) এখনো অনেক পিছিয়ে।

পরীক্ষাগার সম্প্রসারণে এলাকা ও শ্রেণিভিত্তিক বৈষম্য : ১৫ জুন ২০২০-এর পরবর্তী সময়ে ৬০টি পরীক্ষাগার থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত সময়ে নতুন ৫৩টি পরীক্ষাগার বৃদ্ধি করে মোট পরীক্ষাগারের সংখ্যা করা হয় ১১৩টি। যার অধীকাংশই ঢাকার মধ্যে (৬৭টি) এবং ঢাকার বাইরে অন্যান্য জেলায় ৪৬টি। ঢাকার বাইরে চট্টগ্রামে সর্বোচ্চ ৮টি পরীক্ষাগার রয়েছে। অর্থাৎ ঢাকা

ও চট্টগামে ৬৬ শতাংশ (৭৫টি) পরীক্ষাগার অবস্থিত। গবেষণার এই সময়ে ঢাকার মধ্যে নতুন করে ৩৭টি পরীক্ষাগার যুক্ত হয় এবং ঢাকার বাইরে মাত্র ১৬টি নতুন পরীক্ষাগার যুক্ত হয়। এবং মাত্র নতুন আটটি জেলায় পরীক্ষাগার সম্প্রসারণ করা হয় (২১টি জেলা হতে ২৯টি জেলা)। এ ছাড়া এই সময়ে নতুন ৩৪টি বেসরকারি পরীক্ষাগারকে অনুমোদন দেওয়ার মাধ্যমে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত বেসরকারি বাণিজ্যিক পরীক্ষাগারের সংখ্যা বেড়ে হয় ৪৯টি। পক্ষান্তরে এই সময়ে মাত্র ১৯টি নতুন সরকারি পরীক্ষাগার যুক্ত করে মোট সরকারি পরীক্ষাগারের সংখ্যা বেড়ে হয় ৬৪টি। সরকারি পরীক্ষাগারে ফি নির্ধারণ, বেসরকারি পরীক্ষাগারের সংখ্যা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি এবং জেলা পর্যায়ে পরীক্ষাগার সম্প্রসারণ না করার মাধ্যমে কার্যত শহরকেন্দ্রিক সচ্ছল ব্যক্তিদের করোনা পরীক্ষায় প্রবেশগম্যতা বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং দরিদ্র, প্রান্তিক ও দুর্গম এলাকার জনগোষ্ঠীর জন্য সেবা সীমিত করার মাধ্যমে নমুনা পরীক্ষার ক্ষেত্রে তাদের নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। এভাবে পরীক্ষার সংখ্যা হ্রাসের মাধ্যমে শনাক্তের সংখ্যা কম হওয়াকে রাজনৈতিক সাফল্য হিসেবে প্রচারের অভিযোগ রয়েছে।

সারা দেশে মোট ১৩টি জেলার সিভিল সার্জনের কার্যালয়ে ১৩টি বুথে বিদেশগামীদের নমুনা পরীক্ষার বুথ ছিল এবং ঢাকায় ছিল মাত্র একটি। ফলে ৪৮ ঘণ্টা আগে নমুনা দেওয়ার কথা থাকলেও সময়মতো তা হাতে না পাওয়ায় যাত্রীদের অনেকেই ফ্লাইট ধরতে পারছিলেন না। পরীক্ষাগার থেকে যথাসময়ে প্রতিবেদন না পাওয়ায় অনেক প্রবাসীদের কর্মক্ষেত্রে ফেরার ক্ষেত্রে ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যায়, অনেক কষ্টে জোগাড় করা ফ্লাইট বাতিল হয়ে যায়।

করোনা আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসাসেবা সম্প্রসারণে ঘাটতি : বিভিন্ন দেশে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবিলা করতে নতুন করে বিভিন্ন কার্যক্রম শুরু করলেও বাংলাদেশে কোভিডের জন্য নির্ধারিত কয়েকটি হাসপাতালে রোগী না থাকার কারণে চিকিৎসা কার্যক্রম বাতিল করে সাধারণ চিকিৎসা চালুর জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়।

পরিকল্পনা ও কৌশল প্রণয়নে ঘাটতি : বিশেষজ্ঞরা সংক্রমণের 'দ্বিতীয় প্রবাহের' পূর্বাভাস দিলেও তা মোকাবিলায় করোনা পরীক্ষার ক্ষেত্রে কী ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন, সে বিষয়ক যথাযথ পরিকল্পনার ঘাটতি রয়েছে। করোনা সংক্রমণের সঠিক চিত্র পেতে এবং দ্রুততার সঙ্গে আক্রান্ত ব্যক্তি চিহ্নিত করতে গত ৩ জুন ২০২০ কারিগরি পরামর্শ কমিটি আরটি-পিসিআর পরীক্ষার পাশাপাশি অ্যান্টিবডি ও অ্যান্টিজেন পরীক্ষার জন্য সুপারিশ করলেও এখনো তা কার্যকর করা হয়নি।

প্রণোদনা প্যাকেজ থেকে বিতরণে বৈষম্য : করোনাভাইরাসে দেশের সম্ভাব্য অর্থনৈতিক প্রভাব উত্তরণে ২০টি প্যাকেজে ১ লাখ ১১ হাজার ১৪১ কোটি টাকা প্রণোদনা ঘোষণা করা হয়। অক্টোবরের ২০২০-এর প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত এই প্রণোদনার ২৬ শতাংশ বিতরণ করা হয়। ২০টি প্যাকেজের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের অধীনে থাকা আটটি প্যাকেজে মোট প্রণোদনার পরিমাণ ৮৫ হাজার ৭৫০ কোটি টাকা, যা বিভিন্ন ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণ হিসেবে বিতরণ করা হয়। অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত ব্যাংকগুলো সরকারের ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের ৪৬ হাজার ২৫২ কোটি

টাকা (প্রায় ৫৪ শতাংশ) বিতরণ করেছে। বৃহৎ শিল্প ও রপ্তানি খাতে উচ্চ হারে (৭৩ থেকে ১০০ শতাংশ) প্রণোদনা বিতরণ করা হয়েছে এবং ব্যবসায়ীদের চাপে কয়েক দফায় বৃহৎ শিল্প ও রপ্তানি শিল্প খাতে প্রণোদনার পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। কিন্তু মাঝারি ও ক্ষুদ্রশিল্প, প্রান্তিক কৃষক ও নিম্ন আয়ের মানুষের ক্ষেত্রে বিতরণ হার খুবই কম (২১ থেকে ৪২ শতাংশ)। রাজনৈতিক প্রভাব ও তদবিরের কারণে এই প্যাকেজের আওতায় বৃহৎ শিল্পে ঋণ দেওয়ার ব্যাপারে ব্যাংকগুলো বেশ সক্রিয় থাকলেও ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি (সিএমএসএমই) এবং প্রাক-জাহাজীকরণ পুনঃঅর্থায়ন কর্মসূচি খাতে ঋণ বিতরণে ব্যাংকগুলোর অনীহা ও দীর্ঘসূত্রতার অভিযোগ রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক তদারকি বাড়িয়েও এসব খাতে ঋণ বিতরণে গতি বাড়াতে পারছে না। অন্যদিকে ঋণ বিতরণ নীতিমালার কঠিন শর্ত, ঋণের বিপরীতে ঠিকমতো কাগজপত্র জমা দিতে না পারা, কৃষিঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে বেসরকারি ব্যাংকগুলোর নেটওয়ার্ক ও দক্ষ কর্মীর অভাব, ঋণের পরিমাণ কম হওয়া, খরচের তুলনায় সুদ হার কম হওয়ার কারণে ব্যাংকগুলো মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প, প্রান্তিক কৃষক খাতে কম ঋণ বিতরণ করেছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তা ও প্রান্তিক কৃষকদের ঋণ বিতরণ প্রক্রিয়া সহজ করা হয়নি ও এ-সংক্রান্ত সক্ষমতা বাড়ানো হয়নি।

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও প্রান্তিক কৃষকেরা প্রণোদনা না পেলেও বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি সার্কুলারের মাধ্যমে রপ্তানি বাণিজ্যে জড়িত দেশীয় প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা), বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেপজা) এবং বাংলাদেশ হাই-টেক পার্কের বিদেশি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানকেও সরকারের ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ থেকে ঋণ দেওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়।

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে সাড়া প্রদানে ঘাটতি : প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর একটা বড় অংশ করোনাকালে সরকারের প্রণোদনা সহায়তা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়েছে। তিন পার্বত্য জেলা ও সমতলে সাঁওতালসহ অন্য জাতিগোষ্ঠীর মাত্র ৪ হাজার ১০০টি উপকারভোগী পরিবার (মোট পরিবারের ২৫ শতাংশ) সরকারি সুবিধা পেয়েছে। করোনাকালে দেশের সমতলের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে ৯২ ভাগের আয় কমে গেছে, তাদের মধ্যে পাঁচ লাখ মানুষ নতুন করে দরিদ্র হয়ে পড়েছে। করোনাকালে সমতলের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর বেতনভোগী কর্মজীবীদের ৭২ শতাংশ চাকরি হারিয়েছেন কিংবা কর্মক্ষেত্র বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। যারা চাকরিতে আছেন, তাদের মধ্যে ২০ শতাংশ আংশিক বেতন পাচ্ছেন। হিজড়া, জেলে, হরিজন ও প্রতিবন্ধীদের কেউ কেউ এককালীন সাহায্য পেলেও অধিকাংশই করোনাকালে কোনো সরকারি সহায়তা পাননি। হরিজনসহ অনেক পরিচ্ছন্নতাকর্মী কাজ করার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের সুরক্ষাসামগ্রী পায়নি এবং চিকিৎসকসহ স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য প্রণোদনা ভাতার ঘোষণা থাকলেও পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের জন্য কোনো প্রণোদনা নেই। ৫০ লাখ দুস্থ মানুষের মাঝে নগদ সহায়তা বিতরণের কথা থাকলেও জুলাই মাসের ৭ তারিখ পর্যন্ত মাত্র ১৬ লাখ মানুষ এই টাকা পায় এবং বর্তমান সময় পর্যন্ত দুই-তৃতীয়াংশ উপকারভোগী এই সুবিধা পেয়েছে পেয়েছেন। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের উপকারভোগী তালিকায় গরমিল থাকায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষ সরকারের ত্রাণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

সক্ষমতা

অকার্যকর কমিটি : করোনা মোকাবিলায় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মোট কমিটির সংখ্যা ৪৩টি। জাতীয় পরিকল্পনার তৃতীয় সংস্করণে কমিটি ছিল ১১টি, পঞ্চম সংস্করণে কমিটি কমিয়ে ৬টি এবং সপ্তম সংস্করণে পুনরায় কমিটির সংখ্যা বৃদ্ধি করে ১৩টি করা হলেও বৃদ্ধির কারণ বা ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। দেশের একাধিক বিশিষ্টজনের সম্মতি ছাড়াই কিছু কমিটিতে রাখা হয়েছে। আবার কোনো কমিটি বিলুপ্ত হলেও সদস্যদের তা জানানো হয়নি। কোনো কোনো ব্যক্তির নাম চার-পাঁচটি কমিটিতেও দেখা গেছে। অনেক কমিটির কোনো সভা এখনো হয়নি। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে গঠিত কমিটিগুলো কার্যকর থাকলেও অধিকাংশ এলাকায় অনিয়মিতভাবে সভা করা হয়।

ন্যাশনাল অ্যাডভাইজারি কমিটি করোনা মোকাবিলায় যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারেনি। অনেক সিদ্ধান্ত কমিটির বাইরে থেকে আসার অভিযোগ রয়েছে। করোনাভাইরাস মোকাবিলার সব কার্যক্রমে কেন্দ্রীভূত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রবণতা চলমান রয়েছে। জাতীয় কমিটিতে ব্যাপক আলোচনা ছাড়াই করোনা মোকাবিলার জাতীয় পরিকল্পনা অনুমোদন এবং সাতটি সংস্করণ করা হয়েছে। জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ নিয়ে গঠিত পাবলিক হেলথ অ্যাডভাইজারি কমিটি এবং জাতীয় কারিগরি পরামর্শক কমিটি বিভিন্ন সময়ে করোনা মোকাবিলায় নানা সুপারিশ করলেও অনেক সুপারিশ গ্রহণ করা হয় না বলে কমিটির অভিযোগ। যেমন করোনা সংক্রমণের ব্যাপকতা অনুসারে এলাকা বিভাজন ও লকডাউন, পরীক্ষার সংখ্যা বৃদ্ধি, অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিবডি টেস্টের ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি।

করোনা মোকাবিলায় গঠিত কমিটিগুলোর অধিকাংশ সক্রিয় না থাকা এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কমিটিগুলোর মধ্যে সমন্বয়হীনতার কারণে পরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা যায়নি। কোভিড-১৯ প্রতিরোধে এবং আক্রান্ত রোগীদের সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে এবং গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি তদারকি করতে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ থেকে একটি টাস্কফোর্স কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই টাস্কফোর্সকে করোনা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ এবং করোনা নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব দেওয়া হলেও এখানে সব সদস্য উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী–একজন বিশেষজ্ঞকেও রাখা হয়নি।

পরীক্ষাগারের সক্ষমতার ঘাটতি : ১৫ জুন পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে পরীক্ষাগারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও (৬০টি থেকে ১১২টি) নমুনা পরীক্ষার সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে, যার অন্যতম কারণ সক্ষমতার ঘাটতি। ১৬ জুন থেকে প্রতিদিন গড়ে ১১টি করে পরীক্ষাগারে কোনো পরীক্ষা হচ্ছে না। ২ আগস্ট ২০২০ তারিখে সর্বোচ্চ ৩৮টি এবং ১৭ অক্টোবরে ৩৪টি পরীক্ষাগারে কোনো পরীক্ষা হয়নি। পরীক্ষাগারে যান্ত্রিক ত্রুটি, পরীক্ষাগার রক্ষণাবেক্ষণ, পরীক্ষাগারে ভাইরাসের সংক্রমণ ইত্যাদি কারণে পরীক্ষাগার বন্ধ থাকে। অনেক ক্ষেত্রে নমুনা সংগ্রহ বেশি না হলে বেসরকারি ল্যাব পরীক্ষাগার বন্ধ রাখে।

চিকিৎসাব্যবস্থায় সক্ষমতার ঘাটতি

বিভিন্ন সময় দেশে কোভিড চিকিৎসার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই, সব ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে দাবি করা হয়। এমনকি বাংলাদেশের চিকিৎসাব্যবস্থার সঙ্গে ইউরোপ-আমেরিকার দেশের চিকিৎসাসেবার সঙ্গে তুলনা করা হলেও এখনো বাংলাদেশের জেলা পর্যায়ের চিকিৎসাব্যবস্থায় সক্ষমতার ঘাটতি লক্ষণীয়। সরকারি তথ্যমতে, বাংলাদেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসা ব্যবস্থাপনার জন্য সারা দেশে আইসিইউ শয্যার সংখ্যা মাত্র ৫৫০টি, ভেন্টিলেটরের সংখ্যা ৪৮০। কিন্তু এই সুবিধার অধিকাংশ ঢাকা শহরকেন্দ্রিক। মোট ৫৫০টি আইসিইউ শয্যার মধ্যে ৩৭৪টি ঢাকা বিভাগের (৬৮ শতাংশ), যার মধ্যে আবার ৩১০টি ঢাকা শহরের মধ্যে অবস্থিত (৫৬ দশমিক ৩ শতাংশ) এবং চট্টগ্রামে ৩৯টি (৭ শতাংশ) আইসিইউ শয্যা রয়েছে, বাকি ৬২টি জেলা ও বিভাগীয় শহরের জন্য বরাদ্দ মাত্র ২০১টি (৩৭ শতাংশ)। অন্যান্য বিভাগের মৃত্যুহার ঢাকা বিভাগের চেয়ে বেশি হলেও চিকিৎসাব্যবস্থা এখানে জোরদার করা হয়নি। ১৫ জুন-পরবর্তী সময়ে আইসিইউ ও ভেন্টিলেটরের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হলেও বিভিন্ন এলাকার জনসংখ্যার অনুপাতে যথেষ্ট নয়। জনসংখ্যা অনুপাতে দেখা যায়, খুলনা ও রংপুর বিভাগে জটিল রোগীর চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় সব সুবিধার দিকে থেকে পিছিয়ে আছে। ১৫ জুন-পরবর্তী সময়ে জেলা পর্যায়ের হাসপাতালগুলোর সক্ষমতার ক্ষেত্রে কিছু অগ্রগতি হলেও এখনো ব্যাপক ঘাটতি বিদ্যমান। এখনো জেলা পর্যায়ের হাসপাতালগুলোয় দক্ষ জনবল (৪৮ দশমিক ৬ শতাংশ), প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (৫১ দশমিক ৪ শতাংশ) এবং নিরাপত্তা সামগ্রীর ঘাটতি (৩৬ দশমিক ২ শতাংশ) রয়েছে।

এ ছাড়া কোভিড মোকাবিলায় জনবলের ঘাটতির জন্য চিকিৎসক ও নার্স নিয়োগ করা হলেও বিভিন্ন হাসপাতালে জনবল সংকট লক্ষ করা যায়। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত শতভাগ হাসপাতালে চিকিৎসক এবং ৮৯ দশমিক ১ শতাংশ হাসপাতালে নার্সের পদ শূন্য থাকলেও গত তিন মাসে ৫৬ দশমিক ৮ শতাংশ হাসপাতালে চিকিৎসক এবং ৪৮ দশমিক ৫ শতাংশ হাসপাতালে এখন পর্যন্ত নার্স নিয়োগ দেওয়া হয়নি।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে নিয়মিতভাবে বলা হয় যে সারা দেশে শয্যা ও আইসিইউর কোনো সংকট নেই, রোগী না থাকায় এসব শয্যা খালি পড়ে থাকে। রোগী না থাকার কারণে কয়েকটি কোভিড-ডেডিকেটেড হাসপাতাল ইতিমধ্যে বন্ধ করা হলেও জরিপে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া সেবাগ্রহীতাদের একাংশ আইসিইউ ও ভেন্টিলেটরের সংকট থাকার কারণে এই সেবা থেকে বঞ্চিত হয়। জরিপে দেখা যায়, প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও সেবাগ্রহীতাদের ৫ দশমিক ৪ শতাংশ অক্সিজেন সরবরাহ, ৩২ দশমিক ৪ শতাংশ ভেন্টিলেশন সেবা এবং ৩০ দশমিক ২ শতাংশ আইসিইউ শয্যা পায়নি। এ ছাড়া সেবা গ্রহীতাদের ৩ দশমিক ১ শতাংশ কখনোই চিকিৎসক বা নার্সের সেবা পায়নি এবং ৩৪ দশমিক ৩ শতাংশ ও ৪৮ দশমিক ৭ শতাংশ মাঝে মাঝে বা দিনে একবার করে নার্স ও চিকিৎসকের সেবা পেয়েছে।

হাসপাতালের বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতার ঘাটতি : করোনা চিকিৎসায় নির্ধারিত হাসপাতালগুলোয় বর্জ্য শোধনে আধুনিক ব্যবস্থা নেই। চিকিৎসা বর্জ্য পৃথক করা বা নিরাপদে ধ্বংস করার যথাযথ নিয়ম মানা হচ্ছে না। অনেক হাসপাতালে মাটিতে পুঁতে ফেলা বা পোড়ানো হলেও যথাযথভাবে বিধি অনুসরণ না করায় পরিবেশদূষণের ঝুঁকি থাকছে। অধিকাংশ হাসপাতালে চিকিৎসা বর্জ্য 'বায়োহ্যাজার্ড' ব্যাগে না ভরে ড্রামে বা উন্মুক্ত অবস্থায় খোলা ডাস্টবিনে ফেলে রাখা হচ্ছে। দেশে করোনাভাইরাস সংক্রমণ শুরুর পর শুধু ঢাকাতেই প্রতিদিন গড়ে ২০৬ টনের বেশি করোনা বর্জ্য উৎপাদিত হচ্ছে। কোভিড-১৯ মোকাবিলায় বিশেষভাবে ব্যবহৃত সামগ্রী ধ্বংস না করায় এগুলো নতুনভাবে সংক্রমণের ঝুঁকি তৈরি করছে। দেশের ১৪ হাজার ৭৭০টি সরকারি-বেসরকারি চিকিৎসাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে মাত্র ১ হাজার ৪৫৮টি প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য সঠিক নিয়মে ধ্বংস করা হয়। দেশের ৯০ ভাগের বেশি চিকিৎসাপ্রতিষ্ঠানের বর্জ্য মিশে যাচ্ছে সাধারণ বর্জ্যের সঙ্গে, এর সঙ্গে চলমান করোনাভাইরাস চিকিৎসাসংক্রান্ত বর্জ্য মিশে স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়িয়ে তুলছে কয়েক লাখ পরিচ্ছন্নতাকর্মীর। সারা দেশে হাসপাতালসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ৩৮ জন পরিচ্ছন্নতাকর্মী কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন এবং মারা গেছেন চারজন। এ ছাড়া পেশাদার পরিচ্ছন্নতাকর্মীর বাইরে বর্জ্য থেকে বিভিন্ন জিনিস কুড়িয়ে বিক্রি করার পেশায় প্রায় ৪০ হাজার পথশিশু মারাত্মক ঝুঁকিতে রয়েছে। সরকারি হাসপাতালগুলোয় অল্পসংখ্যক পরিচ্ছন্নতাকর্মীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হলেও অধিকাংশ বেসরকারি হাসপাতালে এমন উদ্যোগ নেই।

হাসপাতালে মানসম্মত সুরক্ষা সামগ্রীর ঘাটতি : প্রথম পর্বের গবেষণায় করোনা চিকিৎসাসেবায় জেলা পর্যায়ের হাসপাতালগুলোয় স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সামগ্রীর যে ঘাটতি পাওয়া গিয়েছিল, সে ক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়েছে। তবে অধিকাংশ হাসপাতালে সুরক্ষা সামগ্রীর পর্যাপ্ত মজুত থাকলেও স্বাস্থ্যকর্মীদের বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশিত মান অনুযায়ী সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহ করা হচ্ছে না। অনেক হাসপাতালে শুধু কোভিড ইউনিটে সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহ করা হয় (৪০ দশমিক ৫ শতাংশ হাসপাতালে কোভিড ইউনিটের চিকিৎসকদের ও ৩৫ দশমিক ১ শতাংশ হাসপাতালে নার্সদের)। আবার কোথাও পিপিইর আংশিক সরবরাহ করা হয় (২ দশমিক ৭ শতাংশ হাসপাতালে চিকিৎসক ও নার্সদের আংশিকভাবে) ও অনিয়মিতভাবে সরবরাহ করা হয় (৫ দশমিক ৪ শতাংশ হাসপাতালে চিকিৎসকদের ও ৮ দশমিক ১ শতাংশ হাসপাতালে নার্সদের)। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত হাসপাতালের ৪৮ দশমিক ৬ শতাংশে এন৯৫/কেএন৯৫/এফএফপি২ মাস্ক সরবরাহ করা হয় না, শুধু সাধারণ সার্জিক্যাল মাস্ক সরবরাহ করা হয়। অনেক হাসপাতালে স্বাস্থ্যকর্মীরা নিজ উদ্যোগে মাস্ক কিনে নেন। করোনা সংক্রমণের শুরু থেকে ৩১ অক্টোবর ২০২০ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ২ হাজার ৮৫৩ জন চিকিৎসক করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হন এবং ১০১ জন চিকিৎসক প্রাণ হারিয়েছেন। এ ছাড়া ২২ অক্টোবর ২০২০ পর্যন্ত সারা দেশে ৭ হাজার ২৪৯ জন স্বাস্থ্যকর্মী করোনা আক্রান্ত হন এবং ১০ জন নার্স মৃত্যুবরণ করেন।

কমিউনিটি পর্যায়ে সংক্রমণ বিস্তার রোধে কার্যকারিতার ঘাটতি : করোনাভাইরাস প্রতিরোধে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা ও স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি ও আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে ঘাটতি লক্ষণীয় ছিল। এক-চতুর্থাংশ আসন খালি রেখে গণপরিবহন চলাচলের

নির্দেশনা থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা মানতে দেখা যায়নি। পশুর হাট, পোশাক কারখানা, কলকারখানা, শপিং মল খুলে দেওয়ার ক্ষেত্রে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার শর্ত আরোপ করা হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা লঙ্ঘিত হতে দেখা যায়। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির উপকারভোগী জরিপে ৬৮ দশমিক ২ শতাংশ ওএমএস উপকারভোগীর মতে, চাল বিতরণে সামাজিক দূরত্ব মানা হয়নি। লকডাউন কার্যকর করতে বিশেষজ্ঞরা ১২টি কার্যক্রম (জনসম্পৃক্ততা, শনাক্ত ব্যক্তির আইসোলেশন, শতভাগ মাস্ক নিশ্চিত করা, সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করা, স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ ইত্যাদি) পরিচালনার সুপারিশ করলেও তা বাস্তবায়নে ঘাটতি লক্ষ করা যায়। এলাকাভিত্তিক পর্যাপ্ত তথ্যের ঘাটতির কারণে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংক্রমণভিত্তিক এলাকা বিভাজন (রেড, ইয়েলো ও গ্রিন জোন) এবং রেড জোনে লকডাউন বাস্তবায়নের পরিকল্পনা কার্যকর হয়নি। লকডাউন সফল করতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর যে বিশেষ ভূমিকা পালন করায় ঘাটতি এবং জনগণের সম্পৃক্ততার ঘাটতি লক্ষ করা গেছে।

সমন্বয় ও অংশগ্রহণ

করোনা মোকাবিলায় আক্রান্ত চিহ্নিতকরণ, কোভিড চিকিৎসা, কমিউনিটি পর্যায়ে সংক্রমণ রোধ, ত্রাণ ও মানবিক সহায়তা ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রে জাতীয় ও স্থানীয় উভয় পর্যায়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়হীনতা চলমান রয়েছে; বিশেষ করে স্থানীয় পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও প্রশাসন বিভাগের মধ্যে যোগাযোগ ও সমন্বয়ের ঘাটতি বৃদ্ধি পেয়েছে। করোনাসংক্রান্ত অর্ধশতাধিক কমিটি করা হলেও তাদের মধ্যে সমন্বয় নেই, বিশেষজ্ঞ কমিটির পরামর্শ গ্রহণ করা হয় না, জাতীয় কমিটির সঙ্গে এসব কমিটির যোগাযোগ ও সমন্বয়ের ঘাটতি লক্ষ করা গেছে। ফলে করোনাভাইরাস মোকাবিলার সব কার্যক্রমে কেন্দ্রীভূত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রবণতা চলমান রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে আমলানির্ভর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হচ্ছে।

এখন পর্যন্ত বেসরকারি মেডিকেল কলেজ, হাসপাতাল ও ক্লিনিকগুলোকে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের চিকিৎসাব্যবস্থায় সরকারি হাসপাতালের সঙ্গে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার ভিত্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। বিচ্ছিন্ন ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাণিজ্যিকভাবে এসব প্রতিষ্ঠান সেবা প্রদান করছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও বারবার সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের কারণে করোনার অ্যান্টিবডি ও অ্যান্টিজেন টেস্ট অনুমোদনেই চার মাস অতিবাহিত হয়েছে। পরবর্তী সময়ে অনুমোদনের এক মাস পরেও এ পদ্ধতিতে পরীক্ষা শুরু করা সম্ভব হয়নি। স্থানীয় সংসদ সদস্যদের ত্রাণ ও নগদ সহায়তা কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা হয়নি। এ ক্ষেত্রেও প্রশাসনের ওপর নির্ভরশীলতার প্রবণতা রয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়হীনতার কারণে সারা দেশে লকডাউন কার্যকর করা সম্ভব হয়নি।

স্বচ্ছতা

করোনা সংক্রমণ-সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশে ঘাটতি : সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে জনসাধারণকে সচেতন ও সতর্ক করার জন্য নির্দিষ্ট সময়ে সঠিক তথ্যের সরবরাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংক্রমণ

পরিস্থিতির উন্নতি দাবি করে অধিদপ্তর থেকে টেলিভিশনে প্রচারিত নিয়মিত বুলেটিন ১২ আগস্ট ২০২০ থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়। প্রতিদিনের এই বুলেটিনে করোনাবিষয়ক নিয়মিত তথ্য ছাড়াও বিভিন্ন সচেতনতামূলক বার্তা দেওয়া হতো। যদিও করোনা সংক্রমণ শনাক্ত এবং মৃত্যু পর্যালোচনায় দেখা যায়, এটি প্রত্যাশিত পর্যায়ে কমেনি।

মতপ্রকাশে বিধিনিষেধ : ১৮ আগস্ট ২০২০ তারিখে সরকারি কর্মচারী কর্তৃক গণমাধ্যমে করোনাবিষয়ক তথ্য ও মতামত প্রকাশে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি কর্মচারীরা করোনাবিষয়ক বিভিন্ন তথ্য ও মতামত গণমাধ্যমে তুলে ধরার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা ১৯৭৯-এর বিধি ২২-এর ভিত্তিতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়, যা তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা এবং অনিয়ম-দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনাকে আড়াল করছে।

মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮-এর ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গেছে। করোনাকালে ওই আইন ব্যবহারের ব্যাপকতা লক্ষ করা যায়। আর্টিকল-১৯-এর তথ্য অনুযায়ী, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের আওতায় ২০২০ সালের প্রথম নয় মাসে (সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত) ২৯১ জনের বিরুদ্ধে মোট ১৪৫টি মামলা করা হয়। যার মধ্যে ৬০ জন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে ৩৪টি মামলা করা হয় এবং ৩০ জন সাংবাদিককে গ্রেপ্তার করা হয়। ডিজিটাল আইনে যে মামলাগুলো হয়েছে, সেগুলোর তিন-চতুর্থাংশের বেশি অভিযোগ সরকার, সরকারি দলের লোকজন এবং সরকারের কাজকর্ম নিয়ে সমালোচনামূলক মন্তব্যেও পরিপ্রেক্ষিতে। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের তথ্যমতে, এই নয় মাসে ক্ষমতাসীন দলের নেতাদের নিয়ে সমালোচনাধর্মী সংবাদ প্রকাশের কারণে বিভিন্ন জাতীয় ও স্থানীয় গণমাধ্যমের ১০ জন সম্পাদকের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। ডিজিটাল আইনে যে মামলাগুলো হয়েছে, সেগুলোর অধিকাংশ অভিযোগ সরকার, সরকারি দলের লোকজন এবং সরকারের কাজকর্ম সম্পর্কে সমালোচনামূলক মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে করা হয়েছে। করোনাসংকট মোকাবিলায় সরকারের কার্যক্রমের সমালোচনা করার কারণেও মামলা করা হয়েছে। এ ছাড়া করোনাকালে বিভিন্ন বিষয়ে মতপ্রকাশে গণমাধ্যমগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও বিভিন্ন গণমাধ্যমের অনলাইন পোর্টালকে নতুন করে নিবন্ধনের বাধ্যবাধকতা রেখে 'জাতীয় অনলাইন গণমাধ্যম নীতিমালা, ২০১৭' সংশোধন করা হয়, যা মুক্ত সাংবাদিকতা ও অবাধ তথ্যপ্রবাহে প্রতিবন্ধকতার ঝুঁকি সৃষ্টি করে। অধিকন্তু নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ (জাতীয় সম্প্রচার কমিশন) গঠন এবং অনলাইন গণমাধ্যম নীতিমালা (সংশোধিত) চূড়ান্ত না করেই গণমাধ্যমগুলোকে নতুন করে নিবন্ধনের নির্দেশ সংবাদমাধ্যমের ওপর সরকারের 'সর্বাত্মক নিয়ন্ত্রণ ও হস্তক্ষেপ' প্রতিষ্ঠার আশঙ্কা সৃষ্টি করেছে।

ক্রয়সংক্রান্ত প্রকাশে ঘাটতি : সরকারি ক্রয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতে এবং দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে ক্রয় কার্যক্রমের সব ক্ষেত্রে তথ্য সংরক্ষণ ও তথ্যের উন্মুক্ততা গুরুত্বপূর্ণ হলেও কোভিড-১৯ মোকাবিলায় চিকিৎসাসামগ্রী ক্রয় প্রকল্পের ক্রয়সংক্রান্ত তথ্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশে

ঘাটতি রয়েছে। এর মধ্যে ক্রয়সংক্রান্ত চুক্তিপত্র প্রকাশ না করা, চুক্তিবদ্ধ কোম্পানির নাম বা তালিকা প্রকাশ না করা, কার্যাদেশপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান ও মালিকের বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ না করা, সরবরাহকৃত পণ্য ও সেবার মান যাচাইকরণ দলিল প্রকাশ না করা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

অনিয়ম ও দুর্নীতি

করোনার সময়ে স্বাস্থ্য খাতে ইতিমধ্যে বিদ্যমান দুর্নীতি এবং নতুনভাবে সংঘটিত দুর্নীতির উন্মোচন ঘটেছে। চিকিৎসা ও সুরক্ষা সামগ্রী ক্রয়, নমুনা পরীক্ষা, চিকিৎসাসেবা, ত্রাণ বিতরণে দুর্নীতিসহ বিভিন্ন অনিয়ম-দুর্নীতির ঘটনা উদঘাটিত হয়েছে।

বিশেষ প্রণোদনা না দেওয়া : জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীদের সরাসরি সেবা দিতে গিয়ে এ পর্যন্ত সারা দেশে ৭ হাজার ২৪৯ জন চিকিৎসক, নার্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী করোনা আক্রান্ত হয়েছেন এবং ১০০ জন চিকিৎসক ও ১০ জন নার্স মৃত্যুবরণ করেছেন। কিন্তু ৯ জুলাই অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে তাদের জন্য ঘোষিত বিশেষ প্রণোদনা বা বিশেষ সম্মানী (দুই মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ এককালীন প্রদান) চার মাস অতিবাহিত হলেও দেওয়া হয়নি।

সরকারি ক্রয়ে দুর্নীতি : জরুরি পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮ লঙ্ঘন করে বিভিন্ন প্রকল্পে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি ব্যবহার করেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। অনেক ক্ষেত্রে মৌখিক আদেশে ক্রয় করা হয়েছে এবং কোনো ক্রয়ে ই-জিপি ব্যবহার করা হয়নি। কয়েকটি সিন্ডিকেট স্বাস্থ্য খাতের সব ধরনের ক্রয় নিয়ন্ত্রণ করছে বলেও অভিযোগ উঠেছে গুরুত্বপূর্ণ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে। এসব সিন্ডিকেটে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, সিএমএসডি, বিভিন্ন হাসপাতালের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাসহ দুদকের কিছু কর্মকর্তার সম্পৃক্ত থাকার অভিযোগও পাওয়া যায়।

করোনা মোকাবিলায় বিদেশি অর্থায়নে পরিচালিত একটি প্রকল্পে মাস্ক, গ্লাভস ও পিপিইর মতো জরুরি স্বাস্থ্য সুরক্ষাসামগ্রী সরবরাহের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে একটি অটোমোবাইল কোম্পানিকে ৩২ কোটি টাকার কাজ দেওয়া হয়। তবে প্রতিষ্ঠানটি সাড়ে ৯ কোটি টাকা অগ্রিম নিলেও যথাসময়ে কোনো মালামাল সরবরাহ করেনি। টাকা আত্মসাতের অভিযোগ ওঠায় পরবর্তী সময়ে কিছু মাস্ক ও গ্লাভস সরবরাহ করে, যার মধ্যে ২৪ হাজার মাস্ক ব্যবহারের অনুপযোগী ছিল।

এই প্রকল্পের ক্রয়ে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা (পিপিআর) ২০০৮ অনুসরণ করা হয়নি। ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) অনুসরণ করা হয়নি। সরাসরি ক্রয়ের ক্ষেত্রে একাধিক দরপত্রদাতার কাছ থেকে দর প্রস্তাব আহ্বানের নিয়ম থাকলেও একজন সরবরাহকারীর কাছ থেকে দর প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়, যা পিপিআরের বিধি ৭৫ (২)-এর লঙ্ঘন। একক দরদাতার কাছ থেকে সরাসরি ক্রয়ের ক্ষেত্রে নির্ধারিত ক্রয়মূল্য সীমা লঙ্ঘন এবং একক দরদাতার কাছ থেকে সরাসরি ক্রয় চুক্তির ক্ষেত্রে নির্ধারিত ক্রয়মূল্য সীমা (২০ লাখ টাকা) লঙ্ঘন করে ৩১ কোটি টাকার ক্রয় আদেশ প্রদান করে, যা ধারা ৭৬ (১)(ঞ) লঙ্ঘন। মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক পেশাগত ও

কারিগরি দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার সনদ ও প্রমাণপত্র যাচাই না করে সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহের কাজ দেওয়া হয়, যা ওই বিধিমালার ধারা ৪৮(২), ৯৮ (১৫) (ক)(গ) লঙ্ঘন। এ ছাড়া মালামাল ক্রয়ে সুনির্দিষ্ট বিনির্দেশ প্রস্তুত করতে কারিগরি উপকমিটি গঠন না করাও একই বিধিমালার ধারা ৮(১৪) লঙ্ঘন হয়েছে। ফলে মাস্ক, গ্লাভস ও পিপিইর মতো জরুরি স্বাস্থ্য সুরক্ষাসামগ্রী সরবরাহের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে নামসর্বস্ব যে প্রতিষ্ঠানকে ৩২ কোটি টাকার কাজ দেওয়া হয়, তা একটি অটোমোবাইল কোম্পানি (গাড়ি ব্যবসায়ী)।

একই প্রকল্পের অধীন অপর একটি ক্রয়ে সুরক্ষা সামগ্রী পোশাক ক্রয়ের জন্য ৫০ কোটি ৫৭ লাখ টাকা প্রকল্প বাজেট বরাদ্দ করা হয়। প্রতিটি পোশাক বাজারমূল্যের চেয়ে চার-পাঁচ গুণ বাড়িয়ে বরাদ্দ রাখা হয়। কিন্তু প্রস্তাবিত মূল্যের চেয়ে অনেক কম মূল্যে পিপিই ক্রয় করে খরচ হয়েছে মাত্র ১২ কোটি টাকা। সরকারের ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর থেকে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের ঝুঁকি বিবেচনায় চতুর্থ ধাপের পিপিই ক্রয়ের নির্দেশনা থাকলেও প্রকল্প পরিচালকের একক সিদ্ধান্তে চিকিৎসকদের জন্য প্রথম ধাপের এক লাখের বেশি পিপিই ক্রয়ের অভিযোগ রয়েছে। এসব সুরক্ষা সামগ্রীর মান নিশ্চিত নয় বলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর তাদের গুদামে মাল ওঠাতে দেয়নি। পরবর্তী সময়ে প্রকল্পের পরিচালক ঢাকা বাদে ৬৩ জেলায় ১ হাজারটি করে এই পিপিই পাঠিয়ে দিয়েছেন। পিপিইর মান যাচাইয়ের জন্য পাঁচ সদস্যের কমিটি গঠন করা হলেও কমিটির আহ্বায়ক ও কমিটির সদস্যদের কেনাকাটার বিষয়ে অবহিত ও পিপিইর মান যাচাই-বাছাই করা হয়নি।

ঢাকার একটি কোভিড-ডেডিকেটেড হাসপাতালে যন্ত্রপাতি ক্রয়ে ক্রয় কমিটিকে অবহিত না করে হাসপাতালটির তত্ত্বাবধায়ক নিজের শ্যালক ও ভাগনের একটি নামসর্বস্ব ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে কাজ দেন। স্টোরে মালামাল জমা দেওয়ার আগেই বিল পরিশোধ করে দেওয়া হলেও পরবর্তী সময়ে তা আর সরবরাহ করা হয়নি। করোনার সময়ে এ ধরনের ৯৩টি ক্রয়ে বিল কারসাজির মাধ্যমে ১২ কোটি ১০ লাখ ৬৫ হাজার ৯০০ টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে।

একটি প্রকল্পের অধীনে ৮৩টি হাসপাতালে লিকুইড অক্সিজেন ট্যাংক বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়। এর মধ্যে ২৩টি হাসপাতালে অক্সিজেন ট্যাংক স্থাপনে সরাসরি ক্রয়ের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। পিপিআরের বিভিন্ন বিধি লঙ্ঘন করে সরাসরি ক্রয়ের ক্ষেত্রে একজনের কাছ থেকে দর প্রস্তাব আহ্বান করা হয়, কেন্দ্রীয়ভাবে দর যাচাই কমিটি গঠন করা হয়নি এবং যান্ত্রিক বিষয়গুলো দেখভালের জন্য বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলীদের নিয়ে কোনো কমিটি গঠন করা হয়নি। দুর্নীতির কারণে এসব হাসপাতালে ট্যাংক স্থাপনে অতিরিক্ত ব্যয় হবে প্রায় ১৬৬ কোটি টাকা।

নমুনা পরীক্ষায় দুর্নীতি : যাচাই না করার ফলে লাইসেন্সবিহীন এবং ভুয়া হাসপাতাল ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর করোনা পরীক্ষা করার চুক্তি সম্পাদন করেছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর অনুমোদিত একটি প্রতিষ্ঠান ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, নরসিংদীসহ দেশের বিভিন্ন এলাকার মাঠপর্যায় থেকে নমুনা সংগ্রহ করে কোনো পরীক্ষা না করেই ১৫ হাজার ৪৬০ জনকে করোনা পরীক্ষার ভুয়া রিপোর্ট দেয়। এই প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন স্থানে বুথ স্থাপন করে নমুনা সংগ্রহ করে তা ফেলে দিয়ে

নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী আইইডিসিআরের প্যাডে ফল লিখে তা ই-মেইল করে পাঠিয়ে দিত এবং প্রতি পরীক্ষার জন্য জনপ্রতি সর্বনিম্ন ৫ হাজার টাকা করে নিত। এই হিসাবে এই প্রতিষ্ঠান করোনার ভুয়া টেস্ট করে ৭ কোটি ৭০ লাখ টাকা হাতিয়ে নেয়। এ ক্ষেত্রে একটি সরকারি হাসপাতালের একজন চিকিৎসক রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে এই অনুমোদন নেয়। এ ধরনের কার্যক্রমে তাদের কোনো অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে তাদের অনুমোদন দেওয়া হয়।

কোভিড-১৯ চিকিৎসার জন্য লাইসেন্সবিহীন হাসপাতালের সঙ্গে সরকার করোনা চিকিৎসার চুক্তি করে। পরবর্তী সময়ে ওই প্রতিষ্ঠান ৩ হাজার ৯৩৯ জন ব্যক্তির নমুনা পরীক্ষার জন্য সংগ্রহ করে তা বিভিন্ন সরকারি পরীক্ষাগার থেকে বিনা মূল্যে পরীক্ষা করিয়ে নিয়ে এলেও নমুনা পরীক্ষার ফি হিসাবে প্রত্যেক ব্যক্তির কাছ থেকে ৩ হাজার ৫০০ টাকা করে আদায় করে। এভাবে তারা ১ কোটি ৩৭ লাখ ৮৬ হাজার টাকা হাতিয়ে নেয়।

একটি মেডিকেল কলেজ করোনা পরীক্ষার জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে অনুমোদন নেয়, কিন্তু করোনা পরীক্ষার জন্য যথাযথ মেশিন না থাকায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ওই হাসপাতালে করোনা পরীক্ষার অনুমোদন বাতিল করে। তারপরও এই মেডিকেল কলেজ অবৈধভাবে অ্যান্টিবডি পরীক্ষা করে রোগীদের কাছ থেকে ৩ হাজার থেকে ১০ হাজার টাকা করে আদায় করে। এ ছাড়া অন্য হাসপাতাল থেকে পরীক্ষা করিয়ে নিজেদের প্যাডে রিপোর্ট দিত।

নমুনা পরীক্ষার ক্ষেত্রে হয়রানি, অনিয়ম ও দুর্নীতি : গবেষণার জরিপে দেখা যায়, এখনো ৩৪ দশমিক ৪ শতাংশ সেবা গ্রহীতাকে তিন বা ততোধিক দিন প্রতিবেদনের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। ফলে আক্রান্ত ব্যক্তি যারা প্রতিবেদন দেরিতে পাচ্ছেন, অপেক্ষার কয়েক দিন তাদের দ্বারা অন্যদের সংক্রমিত হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে। এ ছাড়া জরিপে সেবাগ্রহীতাদের ৯ দশমিক ৯ শতাংশ নমুনা পরীক্ষায় ভুল প্রতিবেদন পাচ্ছেন। যথাসময়ে প্রতিবেদন না পাওয়ায় অনেক প্রবাসীর কর্মক্ষেত্রে ফেরার ক্ষেত্রে ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যায়, অনেক কষ্টে জোগাড় করা ফ্লাইট বাতিল হয়ে যায়। এ ছাড়া কয়েকটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ভুয়া প্রতিবেদন নিয়ে ভ্রমণ করায় ছয়-সাতটি দেশে বাংলাদেশিদের গমনের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে এবং যাত্রীদের ফেরত পাঠানো হয়। আবার অনেক দেশ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত সনদ গ্রহণ করেনি।

নমুনা পরীক্ষার ক্ষেত্রে সেবা গ্রহীতারা হয়রানিসহ নানা ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার হয়। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে নমুনা দিতে দীর্ঘ সময় লাইনে অপেক্ষা (৫১ দশমিক ৪ শতাংশ), পরীক্ষার জন্য তদবির বা সুপারিশ জোগাড় করতে বাধ্য হওয়া (৩৯ দশমিক ৬ শতাংশ), নমুনা দিতে একাধিকবার কেন্দ্রে যাওয়া (২৬ শতাংশ), নির্ধারিত ফি অপেক্ষা অতিরিক্ত টাকা দিতে বাধ্য হওয়া (১৫ শতাংশ) ইত্যাদি। যেসব সেবাগ্রহীতা বেসরকারি পরীক্ষাগারগুলো থেকে নমুনা পরীক্ষা করেছেন, তাদের ৪ দশমিক ১ শতাংশকে করোনাভাইরাস পরীক্ষার সঙ্গে অন্যান্য পরীক্ষা করতে বাধ্য করা হয়েছে। নারীদের ক্ষেত্রে পরীক্ষার জন্য সুপারিশ জোগাড় করতে হয়েছে পুরুষদের

তুলনায় বেশি। সার্বিকভাবে সেবাগ্রহীতাদের ১৫ শতাংশের কাছ থেকে নমুনা পরীক্ষায় নির্ধারিত ফি অপেক্ষা অতিরিক্ত টাকা আদায় করা হয়েছে। সরকারি পরীক্ষাগারের ক্ষেত্রে এই অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের পরিমাণ সর্বোচ্চ ৩ হাজার ২০০ টাকা এবং বেসরকারি পর্যায়ে সর্বোচ্চ ৭ হাজার ৬৫০ টাকা। নমুনা পরীক্ষায় দ্রুত সিরিয়াল পাওয়ার জন্য সার্বিকভাবে ৪ দশমিক ৫ শতাংশ সেবাগ্রহীতা গড়ে ৯৪৬ টাকা ঘুষ দিয়েছেন।

চিকিৎসাব্যবস্থায় অনিয়ম-দুর্নীতি : করোনা আক্রান্তের চিকিৎসাব্যবস্থায় সক্ষমতার ঘাটতি ও বিভিন্ন ধরনের সমস্যার পাশাপাশি অনিয়ম-দুর্নীতিও বিদ্যমান। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত হাসপাতালগুলোর ৩৫ দশমিক ১ শতাংশে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতি সংঘটিত হয়। কয়েকটি ক্ষেত্রে ১৫ জুন-পরবর্তী সময়ে ইতিবাচক অগ্রগতি হলেও কিছু হাসপাতালে স্বাস্থ্যকর্মীদের দায়িত্ব পালনে অবহেলা (৫৩ দশমিক ৮ শতাংশ) ও অনুপস্থিতি (১৫ দশমিক ৪ শতাংশ) আগের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কিছু হাসপাতালে অনিয়ম-দুর্নীতি হ্রাস পেলেও তা অব্যাহত আছে। যেমন নিম্নমানের সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহ (৩৮ দশমিক ৫ শতাংশ), মজুত থাকা সত্ত্বেও সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহ না করা (১৫ দশমিক ৪ শতাংশ)।

কোভিড চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতার ঘাটতি বিদ্যমান থাকার কারণে সেবাগ্রহীতারা কোভিড চিকিৎসাসেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন বা হয়রানির শিকার হচ্ছেন। স্বাস্থ্যসেবাগ্রহীতাদের ৩৭ দশমিক ৪ শতাংশ সেবা গ্রহণে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। ভর্তি হওয়ার সময় সেবাগ্রহীতারা বিভিন্ন হাসপাতালের কর্মচারীর বাজে আচরণের শিকার হয় (১৪ দশমিক ৬ শতাংশ), স্ট্রেচার বা হুইলচেয়ার পাওয়ার ক্ষেত্রে অসহযোগিতা করা হয় (১০ দশমিক ৬ শতাংশ), ভর্তির জন্য একাধিক হাসপাতালে যেতে হয় (১১ দশমিক ৮ শতাংশ)। অনেক ক্ষেত্রে এ ধরনের হয়রানি বা সমস্যার কারণে অনেক সেবাগ্রহীতার মৃত্যু হয়েছে (৮ দশমিক ৭ শতাংশ)।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে অনিয়ম-দুর্নীতি : জরিপে নগদ সহায়তা উপকারভোগীদের ১২ শতাংশ তালিকাভুক্ত হতে অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছিলেন বলে জানান। এ ক্ষেত্রে প্রভাবশালী ব্যক্তির সুপারিশ জোগাড় করা (৩৬ দশমিক ১ শতাংশ), অনেকবার অনুনয়-বিনয় বা অনুরোধ করা (২৪ দশমিক ৬ শতাংশ), নিয়মবহির্ভূত অর্থ বা ঘুষ দেওয়া (১৮ দশমিক ৯ শতাংশ), টাকা না পাওয়া (১০ দশমিক ৬ শতাংশ) ইত্যাদি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। তালিকাভুক্ত থেকে গড়ে ২২০ টাকা করে নিয়মবহির্ভূত অর্থ বা ঘুষ দিতে হয়েছে। অন্যদিকে জরিপে কার্ডের মাধ্যমে বিশেষ ওএমএস চাল (১০ টাকা কেজি দরে) সহায়তায় উপকারভোগীদের ১০ শতাংশ তালিকাভুক্ত হতে অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে প্রভাবশালী ব্যক্তির সুপারিশ জোগাড় করা (৩৭ দশমিক ১ শতাংশ), অনেকবার অনুনয়-বিনয় বা অনুরোধ করা (২০ দশমিক ৬ শতাংশ), নিয়মবহির্ভূত অর্থ বা ঘুষ দেওয়া (১৫ দশমিক ৫ শতাংশ) ইত্যাদি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন।

জরিপে নগদ সহায়তায় উপকারভোগীদের ৫৬ শতাংশ সহায়তা পেতে অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছিলেন। এ ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরনের মধ্যে তালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও এখনো টাকা না পাওয়া (৬৯ শতাংশ), মোবাইল ব্যাংকিং এজেন্ট কর্তৃক কমিশন বা ফি কেটে রাখা (২৬ দশমিক ৬ শতাংশ) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। নগদ টাকা তুলতে মোবাইল ব্যাংকিং এজেন্ট কমিশন বা ফি বাবদ গড়ে ৬৮ দশমিক ২০ শতাংশ টাকা করে কেটে রাখে। এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে নগদ অর্থসহায়তা কর্মসূচির উপকারভোগীদের কাছ থেকে ৪০০ থেকে ৫০০ টাকা করে আদায় করা হয়।

জরিপে ওএমএস (চাল) সহায়তায় উপকারভোগীদের ১৫ দশমিক শূন্য শতাংশ চাল পেতে অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছিলেন। এ ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরনের মধ্যে ছিল পরিমাণে কম দেওয়া (৩৬ দশমিক ৮ শতাংশ), তালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও চাল কিনতে না পারা (২০ দশমিক ৬ শতাংশ), ওজন না করে বালতিতে অনুমান করে চাল দেওয়া (১৯ দশমিক ৯ শতাংশ) ইত্যাদি।

নগদ সহায়তা কার্যক্রমে অনিয়ম-দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছে স্থানীয় সাংসদ, মেয়র, ইউপি চেয়ারম্যান/মেম্বার/কাউন্সিলর (৭৯ দশমিক ২ শতাংশ) ও স্থানীয় প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা (৪৮ দশমিক ৭ শতাংশ)। বিশেষ ওএমএস (চাল) বিতরণ কার্যক্রমে অনিয়ম ও দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের মধ্যে সাংসদ, মেয়র, ইউপি চেয়ারম্যান/মেম্বার/কাউন্সিলর (৬৫ দশমিক ৭ শতাংশ) ও স্থানীয় প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতার (৪০ দশমিক ১ শতাংশ) সম্পৃক্ততা ছিল বলে জানান সুবিধাভোগীরা। করোনাকালীন যেসব জনপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে দুনীতির প্রমাণ মিলেছে, তাদের ৯০ জনই ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জড়িত। একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) সরাসরি ও হটলাইনের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত জনপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় যে, তারা প্রকৃত দুস্থদের বঞ্চিত করে করোনাকালে সরকারের দেওয়া ত্রাণ ও নগদ অর্থসহায়তাসহ বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির অর্থ আত্মসাৎ করেছেন।

করোনাকালীন মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে অনিয়ম ও দুর্নীতি রোধে এ পর্যন্ত শতাধিক জনপ্রতিনিধিকে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় সাময়িক বরখাস্ত করে। তবে জনপ্রতিনিধিদের অনেকেই (অন্তত ৩০ জন) উচ্চ আদালতে রিটের মাধ্যমে স্বপদে ফিরে এসেছেন। এর কারণ হিসেবে অনেক ক্ষেত্রে আদালতে জোরালোভাবে তথ্য উপস্থাপন না করা, সরকারপক্ষের আইনজীবীর আদালতে উপস্থিত না হওয়া, আসামিপক্ষ বা বরখাস্ত চেয়ারম্যানদের পক্ষের আইনজীবীদের জোরালোভাবে বরখাস্তের বিরুদ্ধে তাদের অবস্থান তুলে ধরার পরিপ্রেক্ষিতে আদালত সরকারের বরখাস্ত আদেশ স্থগিত করে রায় দেয়।

জবাবদিহি

করোনাভাইরাস মোকাবিলায় গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমে অনিয়ম-দুর্নীতির ক্ষেত্রে সরকারের জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে ধারাবাহিক উদ্যোগের ঘাটতি লক্ষ করা যায়। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়

ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে জবাবদিহি নিশ্চিত করার অন্যতম একটি জায়গা হতে পারত স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির। করোনাকালে এ কমিটির কোনো ভূমিকা লক্ষ করা যায়নি। ২৪ মার্চ ২০২০-এর পর থেকে এই কমিটি কোনো সভা করেনি।

করোনাকালে স্বাস্থ্য খাতে বিভিন্ন সরকারি ক্রয়ে ব্যাপক অনিয়ম-দুর্নীতি সংঘটিত হয়। কিন্তু রিজেন্ট হাসপাতাল ও জিকেজির মতো দু-একটি ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়া করোনা মোকাবিলা কার্যক্রমে অনিয়ম-দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কোনো কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বদলি ও চলতি দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি ব্যতীত আর কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। উপরন্তু সরকারের উচ্চপর্যায় থেকে বিভিন্ন সময়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে এসব অভিযোগের দিকে নজর না দিয়ে তাদের কাজে মনোনিবেশ করতে বলা হয়। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের উচ্চপদস্থ দুজন কর্মকর্তার নির্দেশে একটি দুর্নীতি সংঘটিত হওয়ার অভিযোগ থাকলেও দুদকের মামলায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। অভিযুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে বদলি ছাড়া অন্য কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। বেসরকারি হাসপাতালে করোনা সেবার অজুহাতে কয়েকগুণ বেশি সার্ভিস চার্জ গ্রহণ ও চিকিৎসা সরঞ্জামের অনিয়ন্ত্রিত বাজার অব্যাহত থাকলেও তাদের জবাবদিহির আওতায় আনা হয়নি। উপরন্তু ৪ আগস্ট ২০২০ থেকে স্বাস্থ্যসেবা ব্যাহত হওয়ার অজুহাতে অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধে বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযানে পূর্ব অনুমতি গ্রহণের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়।

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

করোনা মোকাবিলায় সরকারের কিছু কার্যক্রমে উন্নতি হলেও আগের গবেষণার ধারাবাহিকতায় করোনাভাইরাস মোকাবিলায় সরকারের গৃহীত কার্যক্রমে সুশাসনের প্রতিটি নির্দেশকের ক্ষেত্রে ব্যাপক ঘাটতি এখনো বিদ্যমান। স্বাস্থ্য খাতে ইতিমধ্যে গভীরভাবে বিস্তৃত দুর্নীতি করোনা সংকটে প্রকটভাবে উন্মোচিত হয়েছে এবং করোনাসংকটকে কেন্দ্র করে দুর্নীতির নতুন সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। করোনা পরীক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা, ত্রাণ কার্যক্রমে সংকট এখনো চলমান। সংঘটিত এসব অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে স্বাস্থ্য খাতের ওপর মানুষের অনাস্থা তৈরি হয়েছে। একইভাবে সরকারের ত্রাণসহ প্রণোদনা কর্মসূচি থেকেও অনিয়ম-দুর্নীতি ও সুবিধা লাভের প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। মাঠপর্যায়ের অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে বিতরণকৃত ত্রাণ থেকে প্রকৃত উপকারভোগীরা বঞ্চিত হচ্ছেন।

অনিয়ম-দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্তদের মধ্যে উচ্চপর্যায়ের ব্যক্তিদের রাজনৈতিক বিবেচনায় আড়াল করা হচ্ছে এবং এ ক্ষেত্রে কিছু ব্যক্তির বিরুদ্ধে লোকদেখানো ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। এ ছাড়া তথ্য প্রকাশে বিধিনিষেধ আরোপের মাধ্যমেও অনিয়ম-দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনাকে আড়াল করার প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। সরকারের সংকোচনমূলক নীতি প্রয়োগের (সেবা ও নমুনা পরীক্ষা হ্রাস) মাধ্যমে শনাক্তের সংখ্যা হ্রাস হওয়াকে 'করোনা নিয়ন্ত্রণ' হিসেবে দাবি এবং রাজনৈতিক অর্জন হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। করোনাভাইরাস মোকাবিলার প্রতিটি ক্ষেত্রেই

বিশেষজ্ঞ মতামত উপেক্ষা করে এখনো আমলানির্ভর সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রবণতা বিদ্যমান। শীত মৌসুমে করোনার সম্ভাব্য দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবিলায় কার্যকর প্রস্তুতির অভাব। শহরকেন্দ্রিক ও বেসরকারি পর্যায়ের বাণিজ্যিক সেবা সম্প্রসারণ, পরীক্ষায় ফি নির্ধারণ দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে এই সেবা থেকে বঞ্চিত করছে এবং হয়রানি ও অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি করছে। নমুনা পরীক্ষা, চিকিৎসা এবং করোনার অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবিলায় গৃহীত প্রণোদনা কর্মসূচির ক্ষেত্রেও সমাজের সুবিধাপ্রাপ্ত অংশের অনুকূলে পক্ষপাত করা হচ্ছে এবং চিকিৎসাসেবা ও প্রণোদনার সুফল সাধারণ মানুষের কাছে এখনো পৌঁছেনি।

সুপারিশ

আইনের শাসন, পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি

১. স্বাস্থ্য খাতের সব ধরনের ক্রয়ে সরকারি ক্রয় আইন ও বিধি অনুসরণ করতে হবে। জরুরিসহ সব ক্রয় ই-জিপিতে করতে হবে।

২. করোনা সংক্রমণের সম্ভাব্য দ্বিতীয় পর্যায়ের আঘাত মোকাবিলায় বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

সক্ষমতা বৃদ্ধি

৩. বিনা মূল্যে নমুনা পরীক্ষার সুবিধা সব জেলায় সম্প্রসারণ করতে হবে, নমুনা পরীক্ষার সংখ্যা বাড়াতে হবে।

৪. ব্যবহৃত সুরক্ষা সামগ্রীসহ চিকিৎসা বর্জ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে; সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

অংশগ্রহণ ও সমন্বয়

৫. সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রয়োজনে বেসরকারি হাসপাতালের সেবাকে (আইসিইউ, ভেন্টিলেটর ইত্যাদি) করোনা চিকিৎসাব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৬. বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশ গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সরকারি দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি করতে হবে।

৭. দেশজুড়ে প্রান্তিক ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে সহযোগিতার জন্য সরকারি বিভিন্ন কার্যক্রমের পাশাপাশি বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি

৮. সংসদীয় স্থায়ী কমিটিকে নিয়মিত সভা করতে হবে এবং করোনায় সংঘটিত অনিয়ম-দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।

৯. করোনাসংক্রান্ত তথ্য প্রকাশে যে বিধিনিষেধ দেওয়া হয়েছে তা বাতিল করতে হবে।

১০. গণমাধ্যমসহ বিভিন্নভাবে সরকারি ক্রয়, করোনা সংক্রমণের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ, ত্রাণ ও প্রণোদনা বরাদ্দ এবং বিতরণ ইত্যাদি বিষয়ে অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করতে হবে।

১১. ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিল বা সংশোধন করতে হবে এবং হয়রানিমূলক সব মামলা তুলে নিতে হবে।

১২. বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির উপকারভোগীদের তালিকা যাচাই-বাছাই ও হালনাগাদ এবং ওয়েবসাইটে তা প্রকাশ করতে হবে।

১৩. স্বাস্থ্য খাতে ক্রয়ে তদারকি বৃদ্ধি ও অনিয়ম-দুর্নীতিতে জড়িত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

১৪. সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম প্রক্রিয়ায় অনিয়ম ও দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত সাময়িক বরখাস্ত জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য-প্রমাণসহ মামলা পরিচালনা করতে হবে। এসব জনপ্রতিনিধির পরবর্তী যেকোনো নির্বাচনে অংশ নেওয়ার যোগ্যতা বাতিল ঘোষণা করতে হবে।

১৫. সম্মুখসারির সব স্বাস্থ্যকর্মীর প্রাপ্য প্রণোদনা দ্রুত বিতরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

করোনাভাইরাস সংকট মোকাবিলা
কোভিড-১৯ টিকা ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ*

মো. জুলকারনাইন, মোহাম্মদ নূরে আলম, মোরশেদা আক্তার
ও তাসলিমা আকতার

গবেষণার প্রেক্ষাপট

করোনাভাইরাস ডিজিজ, ২০১৯ (কোভিড-১৯) সংক্রামক রোগটি বর্তমানে বিশ্বব্যাপী অন্যতম জনস্বাস্থ্য-সংকট হিসেবে বিবেচিত। বাংলাদেশে ২০২০ সালের মার্চ থেকে শুরু হওয়া কোভিড-১৯ সংক্রমণ গত জুন-আগস্টে সর্বোচ্চ অবস্থায় থাকার পর সেপ্টেম্বর ২০২০ থেকে হ্রাস পায়। ২০২১ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে শনাক্তের হার ৫ শতাংশের নিচে থাকলেও মার্চের প্রথম সপ্তাহ থেকে আশঙ্কাজনকভাবে সংক্রমণ বৃদ্ধি পায় এবং আক্রান্তের হার ২০ শতাংশ অতিক্রম করে। ২০২১ সালের এপ্রিল থেকে সারা দেশে 'লকডাউন' শুরু হয়ে এখনো চলমান। মে মাসের শুরুতে শনাক্তের হার ১০ শতাংশের নিচে অবস্থান করলেও আবার, বিশেষ করে সীমান্তবর্তী জেলাগুলোয় সংক্রমণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত করোনাভাইরাসের 'যুক্তরাজ্য (বি.১.১.৭)', 'দক্ষিণ আফ্রিকান (বি.১.৩৫১)' ও 'ভারতীয় (বি.১.৬১৭.২)' ধরন (ভ্যারিয়েন্ট) শনাক্ত হয়েছে, যা কোভিড-১৯ টিকার কার্যকারিতা এবং চিকিৎসাব্যবস্থার ওপর প্রভাব ফেলতে পারে বলে আশঙ্কা রয়েছে। উল্লেখ্য, ২০২১ সালের ৩১ মে পর্যন্ত করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৮ লাখ ৫৪০ এবং মৃতের সংখ্যা ছিল ১২ হাজার ৬১৯।

লকডাউনের মাধ্যমে সংক্রমণ কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হলেও এর প্রভাবে দেশের অর্থনীতি, বিশেষ করে স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকা বিপর্যস্ত হয়েছে। কোভিড-১৯-এর নতুন নতুন ধরনের আবির্ভাবে প্রাকৃতিকভাবে 'হার্ড ইমিউনিটি' অর্জন বাধাগ্রস্ত হয়েছে। বাংলাদেশে চার ধাপে মোট জনসংখ্যার ৮০ শতাংশ (১৩ দশমিক ৮২ কোটি) টিকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে ইমিউনিটি অর্জনে স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যাবর্তনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার ২০২১ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকার কোভিশিল্ড টিকা দেওয়া শুরু করেছে। তবে টিকা সরবরাহ বন্ধ থাকার ফলে ২৬ এপ্রিল ২০২১ থেকে প্রথম ডোজ দেওয়া বন্ধ করা হয়েছে। বাংলাদেশে সংক্রমণের গতি-প্রকৃতি, নতুন নতুন ধরনের অনুপ্রবেশ, সংক্রমণ রোধের সক্ষমতা এবং টিকা কার্যক্রম বন্ধ হওয়া ইত্যাদি বিবেচনায় কোভিড-১৯ অতিমারি উচ্চঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে।

* ২০২১ সালের ৮ জুন ঢাকায় ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশিত গবেষণার সারসংক্ষেপ।

টিআইবি দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন খাত ও প্রতিষ্ঠান নিয়ে গবেষণা ও অধিপরামর্শমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে, যার মধ্যে স্বাস্থ্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি খাত। করোনাভাইরাস মোকাবিলায় সংক্রমণের প্রথম আট মাসে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে টিআইবি ধারাবাহিকভাবে দুটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে, যেখানে করোনাভাইরাস মোকাবিলায় প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা এবং দ্রুত সাড়া প্রদানে ঘাটতি ও অনিয়ম-দুর্নীতিসহ সুশাসনের সব সূচকে ব্যাপক ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। বর্তমান সময়েও করোনা পরীক্ষা, চিকিৎসাসেবা, সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতকরণ, সংক্রমণ প্রতিরোধ, প্রণোদনা প্রদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে সুশাসনের ঘাটতি; বিশেষ করে টিকা পরিকল্পনা, ক্রয় ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে সমালোচনা ও বিতর্ক বিদ্যমান। করোনাভাইরাস মোকাবিলায় সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম বিশেষত কোভিড-১৯ টিকা ব্যবস্থাপনা সুশাসনের আলোকে পর্যবেক্ষণ করার উদ্দেশ্যে টিআইবি এই তৃতীয় দফা গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার উদ্দেশ্য করোনাভাইরাস মোকাবিলায় সরকার কর্তৃক গৃহীত টিকা কার্যক্রমসহ অন্যান্য চলমান কার্যক্রম সুশাসনের আঙ্গিকে পর্যালোচনা করা। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে :

- করোনাভাইরাস মোকাবিলায় টিকা সংগ্রহ, টিকাদান কর্মসূচি পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম পর্যালোচনা করা এবং এই কার্যক্রমে বিদ্যমান সুশাসনের ঘাটতি, ঘাটতির কারণ ও ফলাফল উদঘাটন করা।
- করোনাভাইরাস মোকাবিলায় সরকার কর্তৃক গৃহীত অন্যান্য কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা।
- গবেষণার ফলাফলের আলোকে সুপারিশ প্রণয়ন করা।

গবেষণাপদ্ধতি

এ গবেষণাটি মূলত মিশ্র পদ্ধতিনির্ভর। গুণগত ও পরিমাণগত এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় ধরনের তথ্য এই গবেষণায় ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ও তথ্যের উৎস

টিকাগ্রহীতা 'এক্সিট পোল' : সারা দেশের ৮টি বিভাগের ৪৩টি জেলা থেকে ৫৯ টিকা কেন্দ্র নির্বাচন (একাধিক টিকা কেন্দ্র থাকা জেলা থেকে দৈবচয়নের ভিত্তিতে দুটি কেন্দ্র নির্বাচন) করা হয়েছে। দৈবচয়নের ভিত্তিতে প্রতিটি টিকা জেলা থেকে ৩০-৩৫ জন টিকাগ্রহীতার 'এক্সিট পোল' সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। এভাবে মোট ১ হাজার ৩৮৭ জন টিকাগ্রহীতার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।

টিকাকেন্দ্র নির্বাচন ও পর্যবেক্ষণ : সারা দেশের ৮টি বিভাগের ৪৩টি জেলা থেকে দৈবচয়নের মাধ্যমে ৫৯টি টিকাকেন্দ্র নির্বাচন ও পর্যবেক্ষণ।

অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান বা দপ্তর থেকে তথ্য সংগ্রহ : জেলা বা উপজেলা পর্যায়ে ১২ ধরনের টিকা গ্রহণে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান বা দপ্তর থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৩১৭টি।

মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার : জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও অন্যান্য দপ্তরের কর্মকর্তা, জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, টিকা প্রদানে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান ও জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি, সাংবাদিকদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে।

পরোক্ষ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ও তথ্যের উৎস

সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন কার্যালয়ের তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত তথ্য এবং গণমাধ্যমে (প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক) প্রকাশিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হয়েছে।

এই গবেষণায় ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ থেকে ৩১ মে ২০২১ পর্যন্ত সময়ের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

গবেষণার আওতা

আগের গবেষণার ধারাবাহিকতায় করোনাভাইরাস এবং এর অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবিলায় গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে নিচের আটটি বিষয়ে এই গবেষণায় তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে :

১. টিকা কর্মসূচি
   - পরিকল্পনা ও কৌশল প্রণয়ন, অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন।
   - টিকা নির্বাচন, সংগ্রহ, ক্রয় চুক্তি ও আমদানি।
   - বেসরকারি পর্যায়ে টিকা উৎপাদন বা আমদানি, টিকা অনুমোদন, বিপণন মূল্য নির্ধারণ।
   - জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে টিকা সংরক্ষণ, পরিবহন ও তদারকি।
   - টিকাকেন্দ্র ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষণ ও অভিযোগ নিরসনের ব্যবস্থা।
   - নিবন্ধন, টিকা প্রদান।

২. করোনাভাইরাস পরীক্ষা ও চিকিৎসাব্যবস্থা।

৩. করোনাভাইরাসের প্রভাব মোকাবিলায় প্রণোদনা কর্মসূচি বাস্তবায়ন।

বিশ্লেষণকাঠামো

এই গবেষণায় করোনাভাইরাস মোকাবিলা কার্যক্রমের ক্ষেত্রে এবং টিআইবির দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে গৃহীত কার্যক্রমের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক সুশাসন নির্দেশকের আলোকে গবেষণায় আওতাভুক্ত বিষয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এসব নির্দেশক হচ্ছে আইনের শাসন, সাড়াদান, সক্ষমতা ও কার্যকারিতা, অংশগ্রহণ ও সমন্বয়, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহি।

গবেষণার ফলাফল

কোভিড-১৯ ব্যবস্থাপনা : ইতিবাচক পদক্ষেপ

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সময়ে র‍্যাপিড অ্যান্টিজেন ও জিন-এক্সপার্টসহ আরটি-পিসিআর নমুনা পরীক্ষার সুবিধা সম্প্রসারণ করা হয়েছে। দিনপ্রতি পরীক্ষার সংখ্যা ৩০ হাজার অতিক্রম করে ২০২১ সালের এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে। ঢাকায় ১ হাজার শয্যার (দুই শতাধিক আইসিইউ শয্যাসহ) ডিএনসিসি

ডেডিকেটেড কোভিড-১৯ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে সংক্রমণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশব্যাপী লকডাউন বাস্তবায়ন করা হয়েছে, যা এখন পর্যন্ত চলমান। পার্শ্ববর্তী দেশসংলগ্ন সীমান্ত বন্ধ করা হয়েছে।

কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতে গতি সঞ্চার করার উদ্দেশ্যে এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে ২ হাজার ৭০০ কোটি টাকার দুটি নতুন প্রণোদনা কর্মসূচি অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ৩৬ লাখ দরিদ্র পরিবারে দ্বিতীয়বার ২ হাজার ৫০০ টাকা নগদ অর্থসহায়তার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ টিকার ব্যবহার শুরু হওয়ার (ডিসেম্বর ২০২০) কিছুদিনের মধ্যেই বাংলাদেশে টিকার ব্যবস্থা (ফেব্রুয়ারি ২০২১) করা হয়েছে। সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির বিদ্যমান ব্যবস্থা ব্যবহারসহ দ্রুততার সঙ্গে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও টিকা কার্যক্রম বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

করোনাভাইরাস মোকাবিলা কার্যক্রমের অগ্রগতি

সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে পরিকল্পিত উদ্যোগের ঘাটতি : সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে পরিকল্পিত উদ্যোগের ঘাটতির কারণে করোনার সংক্রমণ পুনরায় বৃদ্ধি পেয়েছে। এন্ট্রি পয়েন্টগুলোয় (বিমান ও স্থলবন্দর) সংক্রমিত ব্যক্তি চিহ্নিতকরণ এবং কোয়ারেন্টাইন করার উদ্যোগের ঘাটতির কারণে নেগেটিভ সনদ ছাড়া যাত্রী পরিবহন, কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে সিট-সংকট, স্বল্প সময় কোয়ারেন্টাইনে থাকা ও পরীক্ষার ব্যবস্থা না থাকায় কোভিড-১৯-এর নতুন ধরনের অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

স্বাস্থ্যবিধি বাস্তবায়নে সমন্বিত ‘আচরণ পরিবর্তনের’ (Behavior Change) উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার নির্দেশনার কঠোর বাস্তবায়নেও ঘাটতি লক্ষ করা যায়। এ ছাড়া পৌরসভা নির্বাচন, রাষ্ট্রীয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজন এবং পর্যটনকেন্দ্র খোলা রাখা হয়। উচ্চ নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের ব্যক্তিদের ‘করোনা নিয়ন্ত্রণ’-এর প্রচার ছিল উল্লেখযোগ্য। এর ফলে স্বাস্থ্যবিধি পালনে সচেতনতার ঘাটতি, জনগণের মধ্যে ভুল ধারণার সৃষ্টি এবং জনগণের স্বাস্থ্যবিধি পালনে আগ্রহ ও হতাশাব্যঞ্জক শৈথিল্য লক্ষ করা যায়। ফলে সংক্রমণের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত মোট আক্রান্ত ও মৃত্যুর মধ্যে ২৬ দশমিক ৬ শতাংশ আক্রান্ত এবং ২৪ দশমিক ২ শতাংশ মৃত্যু ২০২১ সালের মার্চ ও এপ্রিল এই দুই মাসে লক্ষ করা গেছে।

বিজ্ঞানভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে অপরিকল্পিত ‘লকডাউন’ আরোপ করা হয়েছে। চলাচলে নিষেধাজ্ঞা আরোপের ক্ষেত্রে বৈষম্য লক্ষ করা যায় এবং প্রভাবশালী গ্রুপের লবিং বা চাপে কিছু ক্ষেত্রে শিথিলতা অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে কড়াকড়ি, কিছু ক্ষেত্রে শিথিলতায় জনগণ বিভ্রান্ত ছিল। যেমন একদিকে অভ্যন্তরীণ বিমান চলাচল, ব্যক্তিগত গাড়ি, শপিং মল, বইমেলা, শিল্পকারখানা খোলা রাখা হয়েছে, পুলিশের উপস্থিতিতে ব্যক্তিগত গাড়িতে যাত্রী পরিবহন করা হয়েছে, আবার অন্যদিকে আন্তজেলা পরিবহন (সড়ক, রেল ও নৌ) রাইডশেয়ারিং (আংশিক), শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা হয়েছে। ফলে স্বাস্থ্যবিধি না মেনে ঈদের ছুটিতে বিপুলসংখ্যক মানুষের ঢাকা ত্যাগ ও আবার ফেরত আসার ঘটনা ঘটেছে। অপরিকল্পিত ‘লকডাউন’ ও জনগণের স্বাস্থ্যবিধি উপেক্ষার কারণে জুন মাসে আরেকটি ঢেউয়ের আশঙ্কা করা হচ্ছে, যা ইতিমধ্যে প্রকাশিত হচ্ছে।

করোনাভাইরাস পরীক্ষার সুবিধা সম্প্রসারণে ঘাটতি : র‍্যাপিড অ্যান্টিজেন ও জিন এক্সপার্ট টেস্টের সম্প্রসারণ হলেও আরটি-পিসিআর পরীক্ষাগার এখনো ৩০টি জেলার মধ্যে সীমিত এবং অধিকাংশ পরীক্ষাগার বেসরকারি। বাংলাদেশের বিদ্যমান আরটি-পিসিআর পরীক্ষায় কিছু নতুন স্ট্রেইন শনাক্তে সক্ষমতার ঘাটতি রয়েছে। ২০২১ সালের এপ্রিলের প্রথম দুই সপ্তাহে দৈনিক নমুনা পরীক্ষার সংখ্যা ৩০ হাজার অতিক্রম করলেও মে মাসে দিনপ্রতি পরীক্ষা পুনরায় ১৫ হাজার ছিল। করোনাভাইরাস পরীক্ষার প্রতিবেদন পেতে কোথাও কোথাও এখনো চার-পাঁচ দিন অপেক্ষা করতে হয়; প্রতিদিন ১০-১৫টি পরীক্ষাগার বন্ধ থাকে। নমুনা দেওয়ার ক্ষেত্রে কিছু কিছু পরীক্ষাগারে কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়। কোনো কোনো এলাকায় কোভিড-১৯-এর লক্ষণ না থাকলে পরীক্ষা না করার উদাহরণ রয়েছে এবং করোনাভাইরাসের নতুন লক্ষণ বিবেচনা না করার অভিযোগ রয়েছে। নমুনা পরীক্ষার কিটের দাম তিন গুণ হ্রাস পেলেও বেসরকারি পরীক্ষাগারের জন্য নির্ধারিত ফি হ্রাস করা হয়নি।

চিকিৎসাব্যবস্থা সম্প্রসারণে উদ্যোগের ঘাটতি : অনেক কোভিড-ডেডিকেটেড হাসপাতাল বন্ধ করার ফলে আইসিইউসহ চিকিৎসার সংকট ছিল। করোনা সংক্রমণের এক বছর তিন মাস অতিবাহিত হলেও পরিকল্পনা অনুযায়ী আইসিইউ, ভেন্টিলেটর ইত্যাদি চিকিৎসা-সুবিধার সম্প্রসারণ করা হয়নি। সারা দেশে কোভিড-১৯-এর জন্য নির্ধারিত ৬৬৪টি সরকারি আইসিইউ শয্যার মধ্যে ঢাকায় ৩৭৪টি, চট্টগ্রামে ৩৩টি এবং বাকি ৬২ জেলায় ২৫৭টি আইসিইউর শয্যা রয়েছে। বাজেট এবং যন্ত্রপাতি থাকা সত্ত্বেও সব জেলায় ১০টি করে আইসিইউ শয্যা প্রস্তুতের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়নি। অনেক যন্ত্রপাতি ব্যবহার না করে ফেলে রাখা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ৩০০ আইসিইউ শয্যা, ১৬৬ ভেন্টিলেটর, ৩৩৫ হাই ফ্লো ন্যাজাল ক্যানুলা। সরকারি হাসপাতালের আইসিইউ সংকটের কারণে বেসরকারি হাসপাতালে ব্যয়বহুল চিকিৎসা গ্রহণে বাধ্য হয়েছে সাধারণ জনগণ এবং একজন কোভিড-১৯ রোগীর গড় খরচ ৫ লক্ষাধিক টাকা।

সারণি ১ : বাংলাদেশ ব্যাংকের অধীনে প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়ন

প্রণোদনা প্যাকেজ	মোট অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)	বিতরণের %
বৃহৎ শিল্প ও সেবা খাতের ঋণসুবিধা	৪০,০০০	৮০.২%
রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (ইডিএফ)	১২,৭৫০	৯৯.৪%
রপ্তানিমুখী শিল্প শ্রমিকদের বেতন-ভাতা পরিশোধে ঋণসুবিধা	৫,০০০	১০০%
ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ঋণসুবিধা	২০,০০০	৭৩.৩%
কৃষি পুনঃ অর্থায়ন স্কিম	৫,০০০	৭৯.১%
নিম্ন আয়ের পেশাজীবীর (কৃষক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী) জন্য পুনঃ অর্থায়ন স্কিম	৩,০০০	৬১.০%
দুই মাসের ঋণের সুদ 'ব্লকড হিসাবে' স্থানান্তর	২,০০০	০%
প্রাক-জাহাজীকরণ পুনঃ অর্থায়ন তহবিল	৫,০০০	০.০৩%

প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ : সরকারঘোষিত মোট ২৩টি প্রণোদনা প্যাকেজে বরাদ্দকৃত ১ লাখ ২৮ হাজার ৩০৩ কোটি টাকার প্রায় ৩৫ শতাংশ বিতরণ করা হয়নি। বৃহৎ ও রপ্তানিমুখী শিল্প প্রণোদনার অধিকাংশ বিতরণ হলেও কৃষি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এবং নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর প্রণোদনা বিতরণে ধীর গতি লক্ষ করা গেছে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর অনীহা, ঋণ বিতরণ প্রক্রিয়ার জটিল নীতি, ব্যাংকের গ্রাহক না হলে ঋণ না পাওয়া এর মূল কারণ। নীতি পরিবর্তন ও দ্রুত অর্থছাড়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগ গ্রহণে ঘাটতি ছিল এবং বারবার সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য খাতে অনিয়ম-দুর্নীতি চলমান : বিভিন্ন হাসপাতালের কোভিড মোকাবিলায় বরাদ্দ ব্যয়ে দুর্নীতি অব্যাহত ছিল বলে লক্ষ করা গেছে। যেমন পাঁচটি হাসপাতালে ক্রয়, শ্রমিক নিয়োগ ও কোয়ারেন্টাইন বাবদ ৬২ দশমিক ৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫ কোটি টাকার দুর্নীতি; ক্রয় বিধি লঙ্ঘন করে এক লাখ কিট ক্রয়; দর প্রস্তাব মূল্যান, আনুষ্ঠানিক দর-কষাকষি, কার্য সম্পাদন চুক্তি, কার্যাদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে বিধি লঙ্ঘন ও অনভিজ্ঞ প্রতিষ্ঠানকে ক্রয়াদেশ দেওয়ার ঘটনা উদঘাটিত হয়েছে। করোনাকালে কারিগরি জনবলের ঘাটতি মেটাতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়োগে জনপ্রতি ১৫-২০ লাখ টাকা ঘুষ-বাণিজ্যের অভিযোগ উঠেছে। টিকার আনুষঙ্গিক উপকরণ ক্রয়ে দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত একটি প্রতিষ্ঠানকে ক্রয়াদেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানা যায়। কোনো হাসপাতালে শয্যা খালি নেই আবার কোনো হাসপাতালে রোগী নেই– এমন পরিস্থিতি দেখা গেছে। উপযোগিতা যাচাই না করে হাসপাতাল নির্মাণ এবং তার যথাযথ ব্যবহার না করে হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়ায় ৩১ কোটি টাকার অপচয় হয়েছে। স্বাস্থ্য খাতের ক্রয়ে সংঘটিত দুর্নীতির কারণে বারবার পরিচালক পরিবর্তন, ধীরগতির তদন্ত কার্যক্রমের প্রভাবে ‘কোভিড-১৯ ইমার্জেন্সি রেসপন্স অ্যান্ড প্যানডেমিক প্রিপেয়ার্ডনেস’ প্রকল্প বাস্তবায়নে ধীরগতি লক্ষ করা যায়।

বাংলাদেশে কোভিড-১৯ টিকা পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন

বর্তমানে বিশ্বে ২০০ ধরনের কোভিড-১৯ টিকার ট্রায়াল চলমান এবং বিভিন্ন দেশে ৭ ধরনের টিকার প্রয়োগ শুরু হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার জরুরি ব্যবহার্য তালিকায় ৫টি টিকা অন্তর্ভুক্ত করেছে। বাংলাদেশে অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকা উদ্ভাবিত ও ভারতের সেরাম ইনস্টিটিউট উৎপাদিত কোভিশিল্ড প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং প্রথম ধাপে ২১ ধরনের জনগোষ্ঠী বা পেশাজীবীদের অগ্রাধিকার দিয়ে নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়।

সারণি ২ : অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত টিকাগ্রহীতার ধরন ও লক্ষ্যমাত্রা

ধরন	সংখ্যা (লাখ)	ধরন	সংখ্যা (লাখ)
চল্লিশোর্ধ্ব নাগরিক	৩২৫	স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সব শ্রেণির কর্মকর্তা	৩.৫
বেসরকারি স্বাস্থ্যকর্মী	৬	স্বাস্থ্যসেবায় প্রত্যক্ষ কর্মী	১.২
বীর মুক্তিযোদ্ধা	২.১	আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী	৫.৫

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন...

ধরন	সংখ্যা (লাখ)	ধরন	সংখ্যা (লাখ)
সামরিক বাহিনী	৩.৬	রাষ্ট্র পরিচালনায় অপরিহার্য কর্মকর্তা	.০৫
গণমাধ্যমকর্মী	০.৫	নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি	১.৮
পৌরকর্মী	১.৫	ধর্মীয় প্রতিনিধি	৫.৯
সৎকারকর্মী	০.৭৫	জরুরি পরিষেবা কর্মী	৪.০
রেল, বিমান, নৌ-বন্দরকর্মী	১.৫	জেলা বা উপজেলায় সরকারি কর্মী	৪.০
ব্যাংকার	২.০	প্রবাসী শ্রমিক	১.২
জাতীয় দলের খেলোয়াড়	০.২	শিক্ষক	২৫.০

টিকার লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে দেশের মোট জনসংখ্যার ৮০ শতাংশ বা ১৩ দশমিক ৮ কোটি, যার জন্য প্রায় ২৮ কোটি ডোজ টিকার প্রয়োজন। ভারতের সেরাম ইনস্টিটিউটের পাশাপাশি বর্তমানে রাশিয়া ও চীনসহ অন্য উৎস থেকে টিকা সংগ্রহের উদ্যোগ চলমান। কয়েকটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান টিকা উৎপাদন ও আমদানির প্রস্তাব করেছে। টিকার প্রয়োগের জন্য প্রথমে অনলাইনভিত্তিক নিবন্ধনের ব্যবস্থা করা হয় ও পরে মোবাইল অ্যাপ শুরু করা হয়। স্পট নিবন্ধন চালু করা হলেও পরে তা বাতিল করা হয়েছে।

সারণি ৩ : টিকার উৎস ও প্রাপ্তি

উৎস	পরিমাণ (প্রতিশ্রুতি/চুক্তি)	প্রাপ্তি (ডোজ)
সেরাম ইনস্টিটিউট	৩ কোটি	৭০ লাখ
কোভ্যাক্স	৬.৮ কোটি (শুরুতে ১.০৯ কোটি)	১ লাখ
ভারত সরকার (উপহার)	-	৩৩ লাখ
চীন সরকার (উপহার)	-	৫ লাখ
মোট টিকা প্রাপ্তি		**১ কোটি ৯ লাখ**

বাংলাদেশে টিকা দেওয়ার প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল ৩ দশমিক ৯৫ কোটি। এর মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করেছে ৭১ দশমিক ৫ লাখ, প্রথম ডোজ টিকা পেয়েছে ৫৮ দশমিক ২ লাখ এবং দ্বিতীয় ডোজ টিকা পেয়েছে ৩২ দশমিক ১ লাখ।

আইনের শাসন

সরকারি ক্রয়ে আইন অনুসরণে ঘাটতি : কোভিড-১৯ টিকা ক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকারি ক্রয়বিধি অনুসরণ করা হয়নি। টিকা ক্রয় পরিকল্পনা ও চুক্তি সম্পাদন নোটিশ সিপিটিউ ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়নি এবং একটি উৎস থেকে ক্রয়ের ক্ষেত্রে দর-কষাকষির নিয়ম থাকলেও তা করা হয়নি। আর এসবই সরকারি ক্রয়বিধি, ২০০৮-এর ১৬ (১১), ৩৭ (১), ১২৬ (৩), ৭৫ (৩) বিধির লঙ্ঘন।

যৌক্তিক কারণ না দেখিয়ে টিকা আমদানিতে তৃতীয় পক্ষকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যার ফলে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশ (২ দশমিক ১৯ ডলার), ভারত (২ দশমিক ৮ ডলার), আফ্রিকান ইউনিয়ন (৩ ডলার) এবং নেপালের (৪ ডলার) চেয়ে বেশি মূল্যে টিকা ক্রয় (৫ ডলার) করা হয়েছে। খরচ বাদে তৃতীয় পক্ষের প্রতি ডোজ টিকায় প্রায় ৭৭ টাকা করে মুনাফা হিসেবে প্রথম ৫০ লাখ ডোজ টিকা সরবরাহে ৩৮ দশমিক ৩৭ কোটি টাকা মুনাফা করেছে। এভাবে তিন কোটি ডোজে তাদের মোট লাভ হবে ২৩১ কোটি টাকা। সরকার সরাসরি সেরাম ইনস্টিটিউটের কাছ থেকে টিকা আনলে প্রতি ডোজে যে টাকা বাঁচত তা দিয়ে ৬৮ লাখ বেশি টিকা ক্রয়ের চুক্তি করা যেত। অন্যদিকে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশ যেমন নেপালে সরাসরি এবং শ্রীলঙ্কায় সরকারি ফার্মাসিউটিক্যাল করপোরেশনের মাধ্যমে সেরাম ইনস্টিটিউট হতে ক্রয় করা হচ্ছে। তবে চীনের সঙ্গে সরকার সরাসরি ক্রয়-চুক্তি করেছে, এই চুক্তি অনুযায়ী চীনের টিকা বাংলাদেশ ১০ ডলার দিয়ে কিনছে, যা বিশ্ব বাজারদরের (১০-১৯ ডলার) সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

রাশিয়া থেকে টিকা কেনার আগে চুক্তির বিভিন্ন শর্ত পর্যালোচনা করা হলেও সেরাম ইনস্টিটিউটের সঙ্গে চুক্তির ক্ষেত্রে এ ধরনের পর্যালোচনা ও দর-কষাকষি লক্ষ করা যায়নি। ক্রয়বিধি ২০০৮-এর ৩৮ (৪) (গ) আনুসারে চুক্তির প্রতিবিধানমূলক ব্যবস্থা প্রয়োগ এবং বিরোধ বা দাবি নিষ্পত্তি পদ্ধতির ব্যবস্থাপনা ক্রয় চুক্তিতে অন্তর্ভুক্তির কথা বলা হলেও ত্রিপক্ষীয় চুক্তিতে টিকা সরবরাহের ক্ষেত্রে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হলে সব পক্ষকে দায়মুক্তি দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া ত্রিপক্ষীয় চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত বেক্সিমকোর ভাইস চেয়ারম্যান একজন সরকারদলীয় সাংসদ ও প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক একজন সরকারদলীয় সাংসদ, যা আইনের লঙ্ঘন। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২ [অনুচ্ছেদ ১২ (কে)] অনুযায়ী সরকারের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক আছে এমন কেউ সংসদ সদস্য পদে থাকতে পারবে না।

সাড়া দান

সুযোগ থাকা সত্ত্বেও বিকল্প টিকা উৎসের সুযোগ গ্রহণ না করা : একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের চাপে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও একটি উৎস ছাড়া বিকল্প উৎস অনুসন্ধানে উদ্যোগের ঘাটতি লক্ষ করা গেছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আবদুল মোমেনের বক্তব্য অনুযায়ী, 'ব্যবসায়িক স্বার্থ রক্ষায় বেক্সিমকোর চাপেই সরকার টিকার বিকল্প উৎসে যেতে পারেনি।' জাতীয় কমিটি এবং বিএমআরসি একটি চীনা প্রতিষ্ঠানের টিকা ট্রায়ালের অনুমোদন দিলেও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে যথাযথ সাড়া না দেওয়ায় ট্রায়াল প্রচেষ্টা বন্ধ হয়ে যায়। এ ছাড়া দেশীয় প্রতিষ্ঠানের উদ্ভাবিত টিকা ট্রায়ালের অনুমোদনেও দীর্ঘসূত্রতা লক্ষ করা যায়। এর ফলে বিকল্প উৎস না থাকার কারণে আকস্মিকভাবে চলমান টিকা কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেছে।

টিকা পরিকল্পনায় ঘাটতি : বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নীতিকাঠামো (WHO SAGE Values Framework) অনুযায়ী টিকা বরাদ্দ ও অগ্রাধিকার প্রণয়নে যেসব বিষয় বিবেচনা করতে হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে অন্যকে বাঁচাতে ঝুঁকি গ্রহণ করা ব্যক্তি, স্বাস্থ্যকর্মীসহ সম্মুখসারীর কর্মী, বয়স্ক ব্যক্তি, বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত বা অন্যান্য স্বাস্থ্যঝুঁকিতে থাকা ব্যক্তি, অধিক আক্রান্ত হওয়া, রোগের জটিলতা বৃদ্ধি ও মৃত্যুর ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠী, সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করা সম্ভব নয় এমন পেশা বা জনগোষ্ঠী, রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড, আর্থসামাজিক অবস্থাকে সচল রাখে এমন কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তি,

শ্রেণি, ধর্ম, বর্ণ, আর্থসামাজিক বা ভৌগোলিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত ব্যক্তি। এই কাঠামো অনুসারে অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য ঝুঁকিপূর্ণ সব পেশা বা জনগোষ্ঠীর জন্য সমবিবেচনা নিশ্চিত করা, সব ব্যক্তির সমান সুযোগ তৈরি করা, সামাজিক, ভৌগোলিক, শারীরিক কারণে বিপন্নতা, ঝুঁকি ও চাহিদার ভিত্তিতে অগ্রাধিকার এবং অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত ও সুবিধাবঞ্চিত ব্যক্তিদের সমভাবে টিকায় প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত হয় এমন টিকা সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার কথা।

তবে পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৩ দশমিক ৮ কোটি মানুষকে টিকার আওতায় নিয়ে আসা ও সেই অনুযায়ী টিকা সংগ্রহের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনায় ঘাটতি লক্ষ করা যায়। বিভিন্ন পেশা বা জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি, তাদের টিকার আওতায় নিয়ে আসার প্রতিবন্ধকতা ও উত্তরণের উপায় নিরূপণ না করার কারণে টিকাবিষয়ক ভ্রান্ত ধারণা, টিকা গ্রহণে ভীতি ও অনাগ্রহ ছিল। কিছু ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তি টিকার আওতার বাইরে রয়ে গেছে। অনলাইনভিত্তিক নিবন্ধন হওয়ার ফলে টিকা দেওয়ার প্রক্রিয়াটি সমাজের সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর অনুকূলে। ইন্টারনেট না থাকা ও কারিগরি জটিলতায় সাধারণ জনগণের বড় অংশই নিবন্ধন করতে পারেনি। অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রস্তাবিত নীতিকাঠামো অনুসরণে ঘাটতি লক্ষ করা যায়। সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করা সম্ভব নয় এমন পেশা বা জনগোষ্ঠীকে (যেমন পরিবহন বা পোশাকশ্রমিক বা প্রবাসী) প্রথম ধাপে টিকার আওতায় আনা হয়নি। প্রত্যন্ত এলাকা ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর কাছে টিকাবিষয়ক তথ্য প্রচার বা টিকায় অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। প্রচার, নিবন্ধন ও টিকা প্রদানে মাঠকর্মী-তৃণমূল পর্যায়ের অবকাঠামো (ডিজিটাল সেন্টার) ব্যবহার করা হয়নি।

যথাযথভাবে এলাকাভিত্তিক টিকার চাহিদা যাচাই করা হয়নি। ফলে সরবরাহ না থাকায় কোনো এলাকায় আকস্মিক সংকট এবং কোনো এলাকায় টিকার উদ্বৃত্ত থাকা ও ফেরত দেওয়ার ঘটনা লক্ষ করা যায়। প্রচারে ঘাটতির কারণে প্রথম দিকে টিকাগ্রহীতার স্বল্পতা ছিল। পরে ষাটোর্ধ্ব ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তিদের (যাদের মৃত্যুহার বেশি) পরিপূর্ণভাবে টিকার আওতায় নিয়ে আসতে বিশেষ কোনো উদ্যোগ না নিয়েই নাগরিক নিবন্ধনের বয়সসীমা হ্রাস করা হয়। যথাযথভাবে চাহিদা যাচাইয়ের মাধ্যমে প্রবাসী জনগোষ্ঠীকে যথাসময়ে টিকার আওতায় আনা হয়নি। একই সঙ্গে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের দায়িত্বহীনতা ও সমন্বয়হীনতার কারণে প্রবাসী যাত্রীদের ব্যাপক দুর্ভোগ ও কর্মক্ষেত্রে ফিরতে অনিশ্চয়তা তৈরি হয় এবং টিকা সনদ না থাকায় প্রত্যেকের গড়ে ৬০-৭০ হাজার টাকা অতিরিক্ত খরচ বহন করতে হয়। এ ছাড়া কোনো পেশা বা জনগোষ্ঠীর সব সদস্যকেই পরিপূর্ণভাবে টিকার আওতায় আনা হয়নি। বিভিন্ন কারণের মধ্যে প্রচারে ঘাটতি, নিবন্ধন প্রক্রিয়া জটিল ও তাদের অনুকূলে না থাকায় নাগরিক নিবন্ধনের আওতায় স্বল্প আয়ের ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তির হার খুবই কম দেখা গেছে। টিকায় অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে নারীদের হার ছিল ৩৭ শতাংশ।

সব অগ্রাধিকার পেশা বা জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্তিতে উদ্যোগের ঘাটতি : প্রচারে ঘাটতি, প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নিবন্ধনের ব্যবস্থা না করায় অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মরত সব কর্মীকে টিকার আওতায় আনা সম্ভব হয়নি। বেসরকারি হাসপাতাল, জরুরি পরিষেবা, ব্যাংক, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি পেশার জনগোষ্ঠী কোভিডকালীন দায়িত্বরত থাকলেও টিকায় অন্তর্ভুক্তির হার কম।

অধিকাংশ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণির কর্মী (৫৬ শতাংশ), পরিচ্ছন্নতাকর্মী (২৬ দশমিক ৬ শতাংশ), মাঠপর্যায়ের কর্মীরা টিকার আওতায় আসেননি। উল্লেখযোগ্যসংখ্যক অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে টিকা গ্রহণে অনাগ্রহ বা ভীতির কারণে (৬১ দশমিক ৬ শতাংশ) এবং ৪০ বছরের কম বয়স থাকার (৫১ দশমিক ৬ শতাংশ) কারণে কর্মীরা টিকা গ্রহণ থেকে বিরত থাকছেন বলে দেখা যায় এবং অনাগ্রহ বা ভীতি দূর করতে উদ্যোগেরও ঘাটতি রয়েছে। ৯ দশমিক ১ শতাংশ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান কর্মীদের নিবন্ধন ও টিকা গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেনি; বাকি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কর্মীদের শুধু মৌখিকভাবে নির্দেশ প্রদান (৬৮ দশমিক ১ শতাংশ) করেছে।

চিত্র ১ : অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে কর্মরতদের টিকার নিবন্ধন ও টিকা গ্রহণের হার (%)

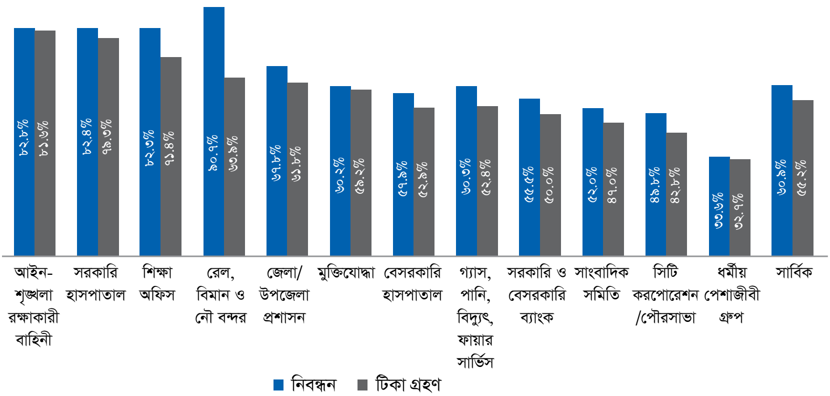

সবার জন্য প্রবেশগম্য টিকা ব্যবস্থাপনা না করা : জরিপে দেখা যায়, অনলাইনভিত্তিক নিবন্ধন-প্রক্রিয়ার কারণে ৭৪ দশমিক ৪ শতাংশ টিকাগ্রহীতাকে অন্যের সহায়তায় নিবন্ধন নিতে হয়েছে। মাঠপর্যায়ে বিকল্প নিবন্ধনের উদ্যোগ ছাড়াই স্পট রেজিস্ট্রেশনের সুযোগ বাতিল করা হয়েছে।

চিত্র ২ : সুরক্ষা ওয়েবসাইটে নিবন্ধন (টিকাগ্রহীতার %)

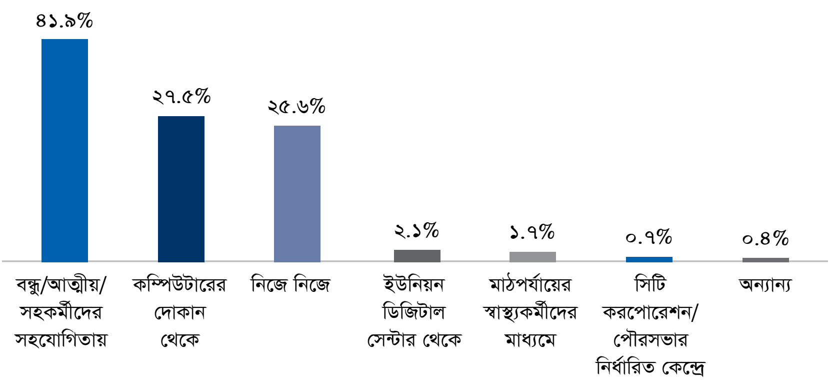

সক্ষমতা ও কার্যকারিতা

নিবন্ধন-প্রক্রিয়ায় সমস্যা : ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারসহ মাঠপর্যায়ের বিদ্যমান কর্মী বা অবকাঠামো ব্যবহার করে নিবন্ধনের সুবিধা না থাকায় অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত জনসংখ্যার বড় একটা অংশ নিবন্ধনের বাইরে রয়ে গেছে। কোনো কোনো এলাকায় নিবন্ধন করতে ৫-১০ কিমি দূরে যেতে হয়। অগ্রাধিকার তালিকায় থাকা সত্ত্বেও কিছু পেশা বা জনগোষ্ঠীর মানুষের বয়স ৪০ বছর না হওয়ার কারণে তারা নিবন্ধন করতে পারেননি। বয়সসীমার কারণে ও জাতীয় পরিচয়পত্র না থাকায় অনেক প্রবাসীর বিদেশ ফেরত যাওয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। সুরক্ষা ওয়েবসাইটের নিবন্ধনে অগ্রাধিকার তালিকায় শিক্ষক থাকলেও সুরক্ষা অ্যাপে তাদের উল্লেখ নেই। পেশা বা জনগোষ্ঠী যাচাইয়ের সুযোগ না থাকায় অগ্রাধিকার তালিকার বাইরে থেকে অনেকে টিকা গ্রহণ করেছেন বলে জানা যায়। টিকাকেন্দ্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে কিছু এলাকার কিছু কেন্দ্রে অধিক পরিমাণ রেজিস্ট্রেশন হয়েছে। দীর্ঘদিন পর টিকার তারিখ পেয়েছে অনেকে। এ ছাড়া নিবন্ধন সম্পন্ন হয়েছে কি না, তা তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায় না। জরিপে দেখা যায়, নিবন্ধনের ক্ষেত্রে ৪২ দশমিক ৬ শতাংশ টিকাগ্রহীতা বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন; যারা সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন তাদের প্রায় ৭৮ শতাংশকে নিবন্ধন করতে ৫-১০০ টাকা ব্যয় করতে হয়েছে।

টিকাকেন্দ্রের অব্যবস্থাপনা : জরিপে দেখা গেছে, ৫০ দশমিক ২ শতাংশ টিকাগ্রহীতাকে উপকারিতা ও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত করা হয়নি এবং ৫৬ দশমিক ২ শতাংশ টিকাগ্রহীতাকে টিকা দেওয়ার পর তাৎক্ষণিকভাবে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ ও রেকর্ড করা হয়নি। এ ছাড়া টিকাগ্রহীতার অসুস্থতার বিষয়গুলো যাচাই করা হয়নি। সামর্থ্যের চেয়ে বেশি টিকাগ্রহীতাকে কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে। দেখা গেছে, একই ভবনের একতলায় রেজিস্ট্রেশন ও চারতলায় টিকা প্রদান করা হচ্ছে, যা বয়স্ক বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রতিকূল পরিবেশ তৈরি করেছে। টিকাকেন্দ্রে সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করা হয়নি এবং কিছু কিছু কেন্দ্রে দীর্ঘ সিরিয়াল ছিল। ৫৭ দশমিক ৬ শতাংশ টিকাকেন্দ্রে অভিযোগ জানানোর ব্যবস্থা নেই, টিকাগ্রহীতার ৬৫ দশমিক ৮ শতাংশ কোনো অভিযোগ করতে পারেননি এবং ২২ দশমিক ১ শতাংশ কীভাবে অভিযোগ জানাতে হয় তা জানেন না বলে জানিয়েছেন। নির্ধারিত কেন্দ্রে টিকা নিতে গিয়ে ২৭ দশমিক ২ শতাংশ টিকাগ্রহীতা নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন; বুথ স্বল্পতার কারণে নারীদের ক্ষেত্রে দীর্ঘ সিরিয়াল ছিল এবং বসা বা অপেক্ষার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা ছিল না।

চিত্র ৩ : নির্ধারিত টিকাকেন্দ্রে মুখোমুখি হওয়া সমস্যার ধরন (টিকাগ্রহীতার %)

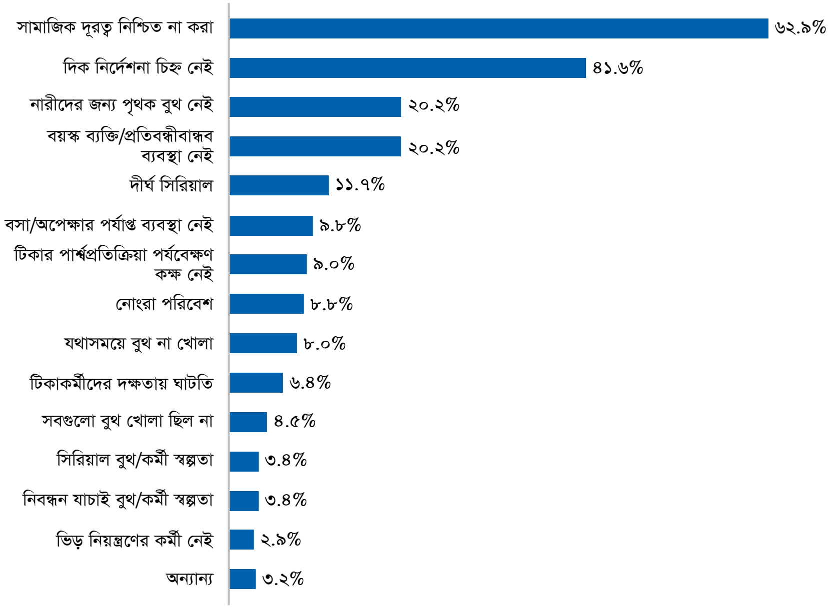

সমন্বয় ও অংশগ্রহণ

টিকা ব্যবস্থাপনায় সমন্বয়হীনতা : টিকার প্রাপ্তি, মজুত ও টিকা প্রদানের মধ্যে সমন্বয়হীনতা লক্ষ করা যায়। বাফার স্টক সংরক্ষণে দূরদর্শিতার ঘাটতি ছিল। ফলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ১৩ লাখের বেশি টিকাগ্রহীতার দ্বিতীয় ডোজ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। টিকা পরিকল্পনায় বিশেষজ্ঞ বা কর্তৃপক্ষের বাইরে নির্বাহী বিভাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রবণতাও লক্ষণীয়। সব শিক্ষককে টিকা দেওয়ার বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের টিকার জন্য নিবন্ধনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

স্বচ্ছতা

টিকা ক্রয় চুক্তিতে স্বচ্ছতার ঘাটতি : বাংলাদেশ সরকার, বেক্সিমকো ও সেরাম ইনস্টিটিউটের মধ্যকার টিকা ক্রয় চুক্তি প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার ঘাটতি ছিল প্রকট। এ ক্ষেত্রে চুক্তির ধরন, চুক্তির শর্তাবলি, ক্রয়পদ্ধতি, অগ্রিম প্রদান, তৃতীয় পক্ষের ভূমিকা, তাদের অন্তর্ভুক্তির কারণ ও তারা কিসের ভিত্তিতে কত টাকা কমিশন পাচ্ছে ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। এ ছাড়া ক্রয় চুক্তি নিয়ে কর্তৃপক্ষের পরস্পরবিরোধী বক্তব্য প্রদান ছিল বিস্ময়কর।

টিকাবিষয়ক তথ্যের ঘাটতি : স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে টিকাবিষয়ক একটি ড্যাশবোর্ড করা হলেও সেখানে অগ্রাধিকার তালিকা অনুযায়ী টিকা প্রদান বিষয়ক তথ্যে ঘাটতি রয়েছে।

তথ্য প্রকাশে হয়রানি, নির্যাতন ও মামলা : ২০২০ সালে ২৪৭ জন সাংবাদিক আক্রমণ ও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। কোভিড-১৯ অতিমারির সময়ে ৮৫ জন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা করা হয়েছে অতিমারি নিয়ে লেখালেখির জন্য। করোনা পরিস্থিতিতে সরকারের

ভূমিকা নিয়ে লেখালেখির অপরাধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে আটক একজন লেখকের কারাগারে মৃত্যু হয়। স্বাস্থ্য খাতের দুর্নীতি নিয়ে ধারাবাহিকভাবে প্রতিবেদন করা সাংবাদিক স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে তথ্য সংগ্রহের সময় নির্যাতনের শিকার ও আটক হন, তার বিরুদ্ধে অযৌক্তিকভাবে অফিশিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট, ১৯২৩-এ মামলা করা হয় এবং তাকে কারাগারে প্রেরণ করা হয়।

জবাবদিহি

কোভিড-১৯ মোকাবিলা কার্যক্রমে সংঘটিত অনিয়ম-দুর্নীতির বিরুদ্ধে তদন্ত ও বিচারে ধীরগতি লক্ষ করা যায়। স্বাস্থ্য খাতের কোভিড-১৯ মোকাবিলা কার্যক্রমে গত এক বছরেও সংঘটিত অনিয়ম-দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে শৈথিল্য রয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে মামলা দায়ের ও কিছু ক্ষেত্রে কর্মকর্তাদের রদবদলের মধ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ সীমাবদ্ধ ছিল। দুর্নীতিতে জড়িত ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলেও স্বাস্থ্য বিভাগের কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারীকে আইনের আওতায় আনা হয়নি।

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ বিস্তার রোধে বিজ্ঞানভিত্তিক ও পরিকল্পিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা, নমুনা পরীক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থাপনার সম্প্রসারণ ও অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবিলায় প্রণোদনা বিতরণে যথাযথ উদ্যোগের ঘাটতিসহ সমন্বয়হীনতা, অব্যবস্থাপনা, অনিয়ম-দুর্নীতি অব্যাহত রয়েছে। কোভিড-১৯ টিকা ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমেও সুশাসনের প্রতিটি নির্দেশকে ঘাটতি লক্ষ করা গেছে। আইনের লঙ্ঘন করে অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় টিকা আমদানির মাধ্যমে জনগণের টাকা থেকে তৃতীয় পক্ষের লাভবান হওয়া সুযোগ তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। কৌশলগত ঘাটতি, ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর প্রভাব ও রাজনৈতিক বিবেচনায় টিকা ক্রয়ের ক্ষেত্রে একক উৎসের ওপর নির্ভর করার কারণে চলমান টিকা কার্যক্রমে আকস্মিক স্থবিরতা নেমে এসেছে। টিকাদান পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে সমন্বয়ের ঘাটতি, অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীকে পরিপূর্ণভাবে টিকার আওতায় আনার ক্ষেত্রে উদ্যোগের ঘাটতি ও সম প্রবেশগম্য টিকা কার্যক্রম নিশ্চিত না করার ফলে অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য ঝুঁকিপূর্ণ ও সুবিধাবঞ্চিত অনেক জনগোষ্ঠী টিকার আওতার বাইরে রয়ে গেছে। টিকার নিবন্ধনব্যবস্থা সমাজের সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর অনুকূলে হওয়ার কারণে এলাকা, শ্রেণি, লিঙ্গ ও পেশাভিত্তিক বৈষম্য তৈরি হয়েছে, যা সর্বজনীন টিকাদান কর্মসূচির অর্জনকে ঝুঁকিপূর্ণ করছে। সর্বোপরি করোনা মোকাবিলা ও টিকা কার্যক্রমে সুশাসনের ঘাটতি করোনাভাইরাস নির্মূল বা নিয়ন্ত্রণকে দীর্ঘায়িত করছে।

সুপারিশ

টিকা কার্যক্রম সম্পর্কিত সুপারিশ

১. দেশের ৮০ শতাংশ জনসংখ্যাকে কীভাবে কত সময়ের মধ্যে টিকার আওতায় নিয়ে আসা হবে, সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা করতে হবে।

২. সম্ভাব্য সব উৎস থেকে টিকা প্রাপ্তির জন্য জোর কূটনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত রাখতে হবে।

৩. উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সক্ষমতাসম্পন্ন কোম্পানিগুলোকে নিজ উদ্যোগে স্থানীয়ভাবে উৎপাদনের সুযোগ দিতে হবে।

৪. সরকারি ক্রয় বিধি অনুসরণ করে সরকারি-বেসরকারি খাতের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সরাসরি আমদানির অনুমতি প্রদান করতে হবে।

৫. রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্য ব্যতীত টিকা ক্রয় চুক্তি সম্পর্কিত সব তথ্য সবার জন্য উন্মুক্ত করতে হবে।

৬. পেশা, জনগোষ্ঠী ও এলাকাভিত্তিক সংক্রমণের ঝুঁকি, আক্রান্ত ও মৃত্যুর হার সমভাবে বিবেচনা করে অগ্রাধিকার তালিকা থেকে যারা বাদ পড়ে যাচ্ছে, তাদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৭. সুবিধাবঞ্চিত ও প্রত্যন্ত এলাকা বিবেচনা করে টিকার নিবন্ধন-প্রক্রিয়া ও টিকাদান কার্যক্রম সংস্কার করতে হবে; ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে নিবন্ধন ও তৃণমূল পর্যায়ে টিকাকেন্দ্র স্থাপন করতে হবে।

৮. সব ধরনের কারিগরি ত্রুটি দূর করাসহ সবার জন্য বিভিন্ন উপায়ে নিবন্ধন-প্রক্রিয়ার উদ্যোগ নিতে হবে (যেমন এসএমএসের মাধ্যমে, ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে); সবার জন্য বাধ্যতামূলকভাবে নিবন্ধন কার্ড প্রিন্ট করার নিয়ম বাতিল করতে হবে।

৯. এলাকাভিত্তিক চাহিদা যাচাই করে টিকা সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

১০. টিকা প্রদান কার্যক্রমে টিকা কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে।

১১. টিকাকেন্দ্রে অভিযোগ নিরসনের ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে; অভিযোগের ভিত্তিতে বিদ্যমান সমস্যা দূর করতে হবে ও অনিয়ম-দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।

করোনাভাইরাস মোকাবিলার অন্যান্য কার্যক্রম-সম্পর্কিত সুপারিশ

১২. কোভিড-১৯ মোকাবিলা কার্যক্রমে সংঘটিত অনিয়ম-দুর্নীতির ক্ষেত্রে দ্রুততার সঙ্গে তদন্ত ও দুর্নীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।

১৩. কোভিড-১৯ মোকাবিলা কার্যক্রমের জন্য নির্ধারিত প্রকল্পগুলো দ্রুততার সঙ্গে বাস্তবায়ন করতে হবে এবং এর অগ্রগতির চিত্র প্রকাশ করতে হবে।

১৪. স্টোরে ফেলে রাখা আইসিইউ, ভেন্টিলেটরসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি অতি দ্রুততার সঙ্গে ব্যবহারযোগ্য করতে হবে এবং সংক্রমণের হার বিবেচনা করে বিভিন্ন এলাকায় সরবরাহ করতে হবে।

১৫. সব জেলায় আরটি-পিসিআর পরীক্ষাগার স্থাপন করতে হবে।

১৬. বেসরকারি হাসপাতালের আইসিইউসহ কোভিড-১৯ চিকিৎসার খরচ সর্বসাধারণের আয়ত্তের মধ্যে রাখতে চিকিৎসা ফির সীমা নির্ধারণ করতে হবে।

১৭. জনগণকে স্বাস্থ্যবিধি পালন করাতে বেসরকারি সংস্থার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে আচরণ পরিবর্তনমূলক কার্যক্রমের উদ্যোগ নিতে হবে। মাস্ক পরিধান বাধ্যতামূলক করতে হবে এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার মাধ্যমে বলবৎকরণের উদ্যোগ নিতে হবে।

১৮. সব জনসংখ্যাকে টিকার আওতায় নিয়ে আসার আগে স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর বিকল্প জীবন-জীবিকার সংস্থান করে সংক্রমণ পরিস্থিতি বিবেচনায় এলাকাভিত্তিক 'লকডাউন' দিতে হবে; সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যাসহ নিষেধাজ্ঞার আওতা নির্ধারণ করতে হবে।

১৯. সরকারঘোষিত প্রণোদনা অতি দ্রুত ও স্বচ্ছতার সঙ্গে বিতরণের উদ্যোগ নিতে হবে।

উন্নয়নে অন্তর্ভুক্তি এবং প্রতিবন্ধিতা
সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়*

ফারহানা রহমান, নিহার রঞ্জন রায় ও দিপু রায়

গবেষণার প্রেক্ষাপট

জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সনদের আলোকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩-এর ২ (৯) ধারা অনুযায়ী প্রতিবন্ধিতা হলো যেকোনো কারণে ঘটিত দীর্ঘমেয়াদি বা স্থায়ীভাবে কোনো ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিগত, বিকাশগত বা ইন্দ্রিয়গত ক্ষতিগ্রস্ততা বা প্রতিকূলতা এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গিগত বা পরিবেশগত বাধার পারস্পরিক প্রভাব, যার কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সমতার ভিত্তিতে সমাজে পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণে বাধাগ্রস্ত হন। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০১৩ অনুসারে প্রতিবন্ধিতার ধরন হলো অটিজম বা অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডারস, শারীরিক প্রতিবন্ধিতা, মানসিক অসুস্থতাজনিত প্রতিবন্ধিতা, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধিতা, বাকপ্রতিবন্ধিতা, বুদ্ধিপ্রতিবন্ধিতা, শ্রবণপ্রতিবন্ধিতা, শ্রবণ-দৃষ্টিপ্রতিবন্ধিতা, সেরিব্রাল পালসি, ডাউন সিনড্রম, বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধিতা ও অন্যান্য প্রতিবন্ধিতা। প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের উন্নয়নে অন্তর্ভুক্তি হচ্ছে রাষ্ট্র প্রদত্ত সব নাগরিক সুবিধা তাদের জন্য উপযোগী করে গড়ে তোলা ও তাদের এমনভাবে দক্ষ বা উপযোগী করা যাতে তারা সব ধরনের নাগরিক সুবিধা নিতে পারে এবং সামাজিক, রাজনৈতিক, নীতিনির্ধারণী পর্যায়, শাসনব্যবস্থা এবং উন্নয়নে বিশদভাবে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়।

জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সনদে (২০০৬) সব প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তির পূর্ণ ও সমান মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতার চর্চা সমুন্নত, সুরক্ষা ও নিশ্চিতকরণ এবং তাদের চিরন্তন মর্যাদার প্রতি সম্মান সমুন্নত করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টে (২০৩০) কাউকে পেছনে ফেলে না রেখে সবার উন্নয়নের অঙ্গীকারের মাধ্যমে প্রতিবন্ধিতাসহ সব মানুষের জীবনমান উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানে দেশের সব নাগরিকের জীবনধারণের মৌলিক উপকরণ নিশ্চিত করা, বৈষম্য নিষিদ্ধ করা এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা প্রসঙ্গে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে [অনুচ্ছেদ ১৫ (ক) ও (ঘ)]। জাতীয় শিক্ষানীতি, স্বাস্থ্যনীতি, শিশুনীতি ও শ্রমনীতিতে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখার নির্দেশনা রাখা হয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি, সামাজিক সুরক্ষাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

---

* ২০২১ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশিত গবেষণার সারসংক্ষেপ।

রাষ্ট্রীয়ভাবে আইনি কাঠামো থাকা সত্ত্বেও প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের উন্নয়নে অন্তর্ভুক্তি যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি, যা বিভিন্ন গণমাধ্যম ও গবেষণা প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। আলোচিত বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে প্রতিবন্ধীবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষাসেবার ঘাটতি, প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের কল্যাণে বাজেট বরাদ্দের ঘাটতি, নিয়মবহির্ভূত অর্থ ছাড়া প্রতিবন্ধী ভাতার কার্ড না পাওয়া, কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে দক্ষতার ঘাটতি, অভিভাবকসহ সংশ্লিষ্ট সব অংশীজনের সচেতনতার ঘাটতি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মহামারিতে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তির সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে থাকা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া টিআইবি পরিচালিত ২০১৭ সালের জাতীয় খানা জরিপে দেখা যায়, প্রতিবন্ধী ভাতার জন্য অন্তর্ভুক্ত হতে ৪৮ শতাংশ খানা বিভিন্ন অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার হয়।

ইতিপূর্বে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের অধিকার তথা উন্নয়নে অন্তর্ভুক্তি-সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর বিভিন্ন গবেষণা হলেও তাদের উন্নয়নে অন্তর্ভুক্তিতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ গবেষণার ঘাটতি রয়েছে, যা সুশাসনের আঙ্গিকে গবেষণার চাহিদা সৃষ্টি করেছে। টিআইবি তার কর্মক্ষেত্রের অংশ হিসেবে প্রান্তিক, পিছিয়ে পড়া এবং সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর ওপর বিভিন্ন গবেষণা ও অধিপরামর্শমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৭ সালের ১৮ জুলাই টিআইবি আয়োজিত একটি অধিপরামর্শমূলক সভার সুপারিশক্রমে সুশাসনের আঙ্গিকে উন্নয়নে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তি বিষয়ে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় এবং বর্তমান গবেষণাটি হাতে নেওয়া হয়।

গবেষণার উদ্দেশ্য

গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য উন্নয়নে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তিতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে :

- প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের উন্নয়নে অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক চ্যালেঞ্জ নিরূপণ করা;
- প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের উন্নয়নে অন্তর্ভুক্তি-সম্পর্কিত বিভিন্ন কার্যক্রমে অনিয়ম ও দুর্নীতি চিহ্নিত করা;
- বিদ্যমান চ্যালেঞ্জগুলো উত্তরণে সুপারিশ প্রস্তাব করা।

গবেষণার পরিধি

শনাক্তকরণ, সুবর্ণকার্ড বিতরণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, প্রতিবন্ধী ভাতা ও ঋণ, কর্মসংস্থান, পরিবহন, বিচারিক সেবা, দুর্যোগকালীন সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি এই গবেষণার অন্তর্ভুক্ত। এ ছাড়া প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানের সঙ্গে সম্পৃক্ত মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, ফাউন্ডেশন, ট্রাস্ট, সমাজসেবা কার্যালয়, প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র, সেবাসংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের (এনজিও) কার্যক্রম এ গবেষণায় বিবেচনা করা হয়েছে।

গবেষণাপদ্ধতি ও গবেষণার সময়

এটি মূলত একটি গুণগত গবেষণা; গুণগত পদ্ধতি ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তবে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সংখ্যাগত তথ্য সংগ্রহ (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উৎস) বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ডিসেম্বর ২০১৯ থেকে নভেম্বর ২০২০ সময়ে এ গবেষণা সম্পন্ন করা হয়েছে।

সারণি ১: তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ও তথ্যের উৎস

তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি	মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, দলীয় আলোচনা, পর্যবেক্ষণ এবং প্রাসঙ্গিক নথিপত্র ও গ্রন্থ পর্যালোচনা
প্রত্যক্ষ তথ্যের উৎস	প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি ও তাদের পরিচর্যাকারী বা অভিভাবক, সমাজসেবা অধিদপ্তর ও শাখা কার্যালয়, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট, নিউরো ডেভেলপমেন্টাল (এনডিডি) সুরক্ষা ট্রাস্ট, প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, আদালত, প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে ব্যবহৃত আশ্রয়কেন্দ্র, রাস্তাঘাট, গণপরিবহন, এনজিও কর্মকর্তা-কর্মচারী ও বিশেষজ্ঞ
পরোক্ষ তথ্যের উৎস	সংশ্লিষ্ট আইন, বিধিমালা, নীতিমালা, নির্দেশিকা, প্রাসঙ্গিক নথি, গবেষণা প্রতিবেদন, টিআইবি পরিচালিত জাতীয় খানা জরিপ ২০১৭-এর তথ্যভান্ডার, বার্ষিক প্রতিবেদন, গণমাধ্যম এবং সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটে প্রকাশিত সংবাদ ও প্রবন্ধ

বিশ্লেষণকাঠামো

গবেষণার প্রাপ্ত তথ্য সুশাসনের সাতটি সুনির্দিষ্ট নির্দেশক ও সংশ্লিষ্ট উপনির্দেশকের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত নির্দেশকগুলো হলো– আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, সমন্বয়, অংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, সংবেদনশীলতা ও অনিয়ম-দুর্নীতি।

সারণি ২ : তথ্য বিশ্লেষণকাঠামো

সুশাসনের নির্দেশক	অন্তর্ভুক্ত বিষয়		
আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা	• আইন, বিধি ও নীতিমালা • বাজেট ও কর্মপরিকল্পনা	• মানবসম্পদ • অবকাঠামো ও লজিস্টিকস	
সমন্বয়	• সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর সমন্বয়		
অংশগ্রহণ	• বাজেট	• কর্মপরিকল্পনা	• প্রকল্প
স্বচ্ছতা	• তথ্য ব্যবস্থাপনা	• তথ্যে অভিগম্যতা	

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন...

সুশাসনের নির্দেশক	অন্তর্ভুক্ত বিষয়		
জবাবদিহি	• জবাবদিহির ব্যবস্থা • তদারকি	• অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তির ব্যবস্থা • নিরীক্ষা	
সংবেদনশীলতা	• প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের প্রতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আচরণ	• কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কর্তৃপক্ষের সাড়া প্রদান	
অনিয়ম-দুর্নীতি	• দায়িত্বে অবহেলা	• ঘুষ লেনদেন	• আত্মসাৎ

গবেষণার ফলাফল

উল্লেখযোগ্য সরকারি উদ্যোগ

সারণি ৩ : উল্লেখযোগ্য সরকারি উদ্যোগ

বিষয়	সরকারি উদ্যোগ
আইন ও বিধিমালা	• প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩, নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন ২০১৩ এবং সংশ্লিষ্ট বিধিমালা প্রণয়ন
প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা	• প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচির আওতায় তথ্যভান্ডার তৈরি • ১০৩টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা এবং প্রতিটি কেন্দ্রে অটিস্টিক শিশুদের জন্য কর্নার প্রতিষ্ঠা • সব ধরনের থেরাপি যন্ত্রপাতি, সুবিধাসহ ৩২টি বিশেষ ধরনের ভ্রাম্যমাণ ভ্যান ক্রয় • অটিস্টিক শিশুদের জন্য ১১টি বিশেষ বিদ্যালয় চালুকরণ এবং বিশেষ থেরাপি সেবা ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান • ১৫তলাবিশিষ্ট প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্স নির্মাণকাজ চলমান • ৬০টি বেসরকারি বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী বিদ্যালয় এমপিওভুক্তিকরণ
সুযোগ-সুবিধাসংক্রান্ত উদ্যোগ	• অটিজম ও এনডিডিগ্রস্ত শিশুদের পিতা-মাতা বা অভিভাবককে প্রশিক্ষণ • প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি ও সংগঠনের মাঝে ঋণ ও অনুদান বিতরণ • প্রকল্পের আওতায় সহায়ক উপকরণ বিতরণ
সচেতনতামূলক কার্যক্রম	• জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য মেলা, অটিজম দিবস, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস পালন

সারণি ৪ : প্রতিবন্ধিতাসংক্রান্ত আইন/ বিধিমালার পর্যালোচনা

আইন / বিধিমালা	পর্যবেক্ষণ	প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ
প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩	প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের গণপরিবহনে ওঠানামার ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থার বিষয়টি উল্লেখ নেই	গণপরিবহনে আসন নির্দিষ্ট থাকলেও হুইলচেয়ার ওঠানামার ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা না থাকায় আসন বরাদ্দের সুবিধা সব ধরনের প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিরা নিতে পারছে না
	আইনটি কোন কোন আইনের ওপর প্রাধান্য পাবে, তা সুনির্দিষ্ট করা হয়নি	'লুনেসি' ১৯১২ আইনে মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তিরা উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পদ পাবে না উল্লেখ থাকায় বুদ্ধি-প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের উত্তরাধিকার সম্পদ থেকে বঞ্চিত হওয়ার ঝুঁকি
	ইস্যুকৃত পরিচয়পত্র ব্যতীত প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি তার জন্য নির্ধারিত কোনো সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে না [ধারা ৩১(৬)]	যারা পরিচয়পত্র পায় নি তাদের সব ধরনের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়ার ঝুঁকি
প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা বিধিমালা, ২০১৫	জাতীয় সমন্বয় কমিটি, জাতীয় নির্বাহী কমিটি, জেলা কমিটি, উপজেলা/শহর কমিটিতে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার প্রক্রিয়া উল্লেখ নেই	প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত না হওয়ার ঝুঁকি
	কমিটিগুলোর সদস্যদের দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে দেওয়া এবং কমিটির সভার সময়সীমা নির্দিষ্ট করা হয়নি	কমিটিগুলোর জবাবদিহি করার ক্ষেত্রে ঘাটতি তৈরি হওয়া
	জাতীয় পর্যায় থেকে উপজেলা পর্যায়ের কমিটির কাজের ক্ষেত্রে সমন্বয় কীভাবে হবে তার উল্লেখ নেই	'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩' বাস্তবায়ন দীর্ঘায়িত হওয়ার ঝুঁকি
প্রতিবন্ধিতা-সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা, ২০১৯	সরকারি বেতন-ভাতাপ্রাপ্ত যেসব প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের নিজস্ব জমি নেই, সেগুলো নীতিমালা জারির দুই বছরের মধ্যে জমি বা ভবনের মালিকানা অর্জন করতে হবে, নতুবা সরকার কর্তৃক তাদের স্বীকৃতি থাকবে না [অনুচ্ছেদ ১৩ (৬)]	এমপিওভুক্ত বিদ্যালয়ের তহবিল না থাকা বা সীমিত তহবিল থাকায়, তাদের পক্ষে জমি ক্রয় বা ভবন নির্মাণ করা সম্ভব হচ্ছে না এবং তাদের স্বীকৃতি ঝুঁকির মুখে

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা

ক. বাজেট ও কর্মপরিকল্পনা-সংক্রান্ত

জাতীয় বাজেটে প্রতিবন্ধিতা সংশ্লিষ্ট খাতের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে আলাদাভাবে বরাদ্দ রাখা হয়নি, বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে ব্যয় হলেও সেটা এ খাতের প্রকৃত বরাদ্দ কি না, তা স্পষ্ট নয়; অর্থাৎ বাজেট অন্তর্ভুক্তিমূলক নয়।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের গত তিন বছরের বিশেষ খরচের খাতগুলো সন্নিবেশ করে বাজেট বরাদ্দ পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতি বিবেচনায় সমন্বয় করে তা দিন দিন বৃদ্ধি পেলেও চাহিদার নিরিখে স্বল্প। সারা দেশের ৬৪টি জেলাসহ উপজেলা ও শহর পর্যায়ে থাকা কমিটিগুলোর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাজেটে কোনো বরাদ্দ না থাকার ফলে নিয়মিত সভা হয় না। তা ছাড়া জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সনদের আলোকে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সংগঠন পরিচালনার জন্য বরাদ্দ নেই এবং সমাজসেবা অধিদপ্তর নিবন্ধিত প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তির প্রায় ১৬ শতাংশ এখনো সরকার প্রদত্ত ভাতার আওতায় আসেনি।

সামাজিক সুরক্ষার আওতায় মাসে ৭৫০ টাকা করে ১৮ লাখ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে ভাতা দেওয়া হচ্ছে, যা জীবনধারণের চাহিদা পূরণে এবং প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তির সংখ্যা বিবেচনায় অনেক কম। এ ক্ষেত্রে মৌলিক চাহিদা গণ্য না করে কেবল মুদ্রাস্ফীতি বিবেচনা করে ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়। ২০১৬ সালের বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্য অনুযায়ী, সর্বনিম্ন ক্যালরিসম্পন্ন খাবারের জন্য প্রয়োজন দৈনিক ৬০ টাকা হিসাবে ১ হাজার ৮০০ টাকা, যা মুদ্রাস্ফীতি বিবেচনায় অনেক কম। এখানে বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা বিবেচনা করা হয়নি। একইভাবে প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের জন্য অফিস খরচ বাবদ প্রতি চার মাসের জন্য বরাদ্দ ২০ হাজার টাকা রাখা হয়েছে, যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। এ ক্ষেত্রে প্রধান খরচের মধ্যে রয়েছে ইউএসটি থেরাপির জন্য ব্যবহৃত জেল (প্রতি টিউবের দাম ৫০০ টাকা), ইন্টারনেট বিল, পত্রিকার বিল, প্রিন্টারের কালি, সংশ্লিষ্ট উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা (সচিব বা উপসচিব) পরিদর্শনে এলে তাদের আপ্যায়ন ও প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সহায়ক উপকরণ বিতরণ অনুষ্ঠানের খরচ।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন কার্যক্রমের উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু তা বাস্তবায়নে বিশেষকরে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা, সামাজিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে বরাদ্দের ঘাটতি রয়েছে। একইভাবে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাও সামাজিক সুরক্ষা বলয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। জাতীয় বাজেটে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের শিক্ষিত মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা, দক্ষ করে গড়ে তোলা, চাকরির অভিগম্যতার ক্ষেত্রে বরাদ্দের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যায় না। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের বিভিন্ন লক্ষ্য অনুসারে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের কল্যাণে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, কর্মসংস্থান, পরিবহন ও সম্পদের ওপর সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পরিকল্পনা প্রণয়নে ঘাটতি রয়েছে। তা ছাড়া সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সামাজিক সুরক্ষা-সম্পর্কিত অধিকসংখ্যক কর্মসূচি থাকায় টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টে উল্লিখিত সেবার ক্ষেত্রে সমন্বিত

পরিকল্পনা গ্রহণে ঘাটতি বিদ্যমান। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে গঠিত সামাজিক নিরাপত্তা কমিটিতে সমাজসেবা কর্মকর্তাকে রাখা হয়নি এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে পরিকল্পনা গ্রহণে ঘাটতি রয়েছে। অধিকাংশ সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধীবান্ধব উপযোগী পরিবেশ ও বিশেষায়িত সেবা প্রদানের ব্যবস্থা নেই।

প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সঠিক পরিসংখ্যান নির্ধারণে বাস্তবসম্মত উদ্যোগ না থাকায় তাদের কল্যাণে কার্যকর উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি হয়নি। আবার প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তির সংখ্যা নিয়ে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সূত্রে ভিন্নতা রয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশে মোট প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তির সংখ্যা মোট জনসংখ্যার প্রায় ১ দশমিক ৪১ শতাংশ, খানা আয়-ব্যয় জরিপ প্রতিবেদন (২০১০) অনুযায়ী ৯ দশমিক ০৭ শতাংশ, এবং খানা আয়-ব্যয় জরিপ প্রতিবেদন (২০১৬) অনুযায়ী ৬ দশমিক ৯৪ শতাংশ। অপরদিকে সমাজসেবা অধিদপ্তরে নিবন্ধিত প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তির সংখ্যা ২১ লাখ ৪৩ হাজার ৩৫৩ জন (৩০ নভেম্বর ২০২০)। বিশ্বব্যাংক (২০১১) এবং বিভিন্ন এনজিওর প্রাক্কলিত তথ্য অনুযায়ী, প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তির হার মোট জনসংখ্যার প্রায় ৯ থেকে ১০ শতাংশ, তবে ৯ শতাংশ হিসেবে বাংলাদেশে নভেম্বর ২০২০-এ প্রাক্কলিত প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তির সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ৫৪ লাখ, অর্থাৎ এ জনগোষ্ঠীর প্রায় ৭ ভাগের ১ ভাগ সমাজসেবা অধিদপ্তর নিবন্ধন করতে পেরেছে, মাত্র ৯ ভাগের ১ ভাগ ভাতা পাচ্ছে।

প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের জন্য আইন প্রণয়ন, কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন পরিকল্পনা ও উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণে সব ধরনের প্রতিবন্ধিতার বিষয়টিকে সমভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। অটিজম-সম্পর্কিত কার্যক্রমে তুলনামূলকভাবে অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা ও এর অধীনে সচেতনতা কর্মসূচি, এনডিডিগ্রস্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা অনুদান, অটিজম রিসোর্স সেন্টার প্রতিষ্ঠা, ৬০টি বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক বিদ্যালয় এমপিওভুক্তিকরণ ইত্যাদি অটিজম সম্পর্কিত কার্যক্রম। কিন্তু এসব কার্যক্রম কার্যকরভাবে পরিচালনা ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে।

প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি শনাক্তকরণে জাতীয় পর্যায়ে বিশেষায়িত জরিপ পরিচালনার ক্ষেত্রে কার্যকর পরিকল্পনার ঘাটতি রয়েছে এবং জরিপের জন্য জরিপকারীদের যথাযথ প্রশিক্ষণে ঘাটতি এবং জরিপ পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত সময় না দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া প্রতিবন্ধিতা সহায়ক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনার ঘাটতি রয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ আয়োজনের ক্ষেত্রে বাক-শ্রবণ, দৃষ্টি এবং শারীরিক ও অন্যান্য প্রতিবন্ধিতা বিবেচনা করা এবং প্রতিবন্ধিতাসহ শিক্ষার্থীদের চাহিদা নিরূপণ করা হয় না। নিচতলা ব্যতীত অন্য তলায় প্রশিক্ষণ আয়োজন করলে শারীরিক প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিরা অংশগ্রহণ করতে পারে না, বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধিতাসহ প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ইশারা ভাষায় দক্ষ প্রশিক্ষক দেওয়া হয় না, অনেক ক্ষেত্রে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তির কম্পিউটার প্রশিক্ষণের জন্য কম্পিউটারে JOZ ও

NDVO সফটওয়্যার থাকে না। সর্বোপরি পেশাদার জনবল, সেবা ও সক্ষমতা এ তিনটি বিষয় সম্পৃক্ত করে কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় না। এ ছাড়া বিভিন্ন ধরনের ভাতানির্ভর কার্যক্রমের মধ্যে সরকার সীমাবদ্ধ রয়েছে।

খ. মানবসম্পদ

জনবল : প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সেবা প্রদানকারী কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় জনবলের ঘাটতি রয়েছে; অনুমোদিত পদের মধ্যে শূন্য পদ এবং প্রয়োজনের তুলনায় কম জনবল রয়েছে। জনবলের ঘাটতি সবচেয়ে বেশি সমাজসেবার কার্যালয়গুলোয় এবং বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক বিদ্যালয়ে। তা ছাড়া কারিগরি ও বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন জনবলের ঘাটতি রয়েছে, যেমন প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রে অকুপেশনাল ও স্পিচ থেরাপিস্ট, বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক বিদ্যালয়ে থেরাপিস্ট, আর্টের শিক্ষক, দৃষ্টি ও বাক-শ্রবণপ্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ে কম্পিউটার প্রশিক্ষক। ফলে প্রতিবন্ধিতাসহ শিশু ও ব্যক্তিরা মানসম্মত সেবা পায় না এবং নিয়মিত সেবা পেতে সময়ক্ষেপণ হয়।

নিয়োগ ও স্থায়ীকরণ : কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে, বিশেষ করে দৃষ্টি, বাক-শ্রবণপ্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ে জনবল এবং সমন্বিত দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ে তত্ত্বাবধায়ক পদে নিয়োগ-প্রক্রিয়া দীর্ঘ সময় বন্ধ রয়েছে, ফলে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের নিয়মিত পাঠদানে গুরুত্ব কম দেওয়া হচ্ছে। এ ছাড়া বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী এবং অটিস্টিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকসহ অন্যান্য জনবলের চাকরি নিয়মিতকরণের অনুমোদনে ফাউন্ডেশন ও মন্ত্রণালয় কর্তৃক দীর্ঘসূত্রতা দেখা যায়। প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রে নিয়োগ প্রকল্পের অধীনে হওয়ায় তা রাজস্ব খাতে যায়নি এবং বেতন-ভাতা দীর্ঘসময় একই অবস্থায় থাকায় তাদের মধ্যে হতাশা তৈরি হয়েছে। এসব কেন্দ্রে প্রশিক্ষিত অকুপেশনাল ও স্পিচ থেরাপিস্টের ঘাটতি রয়েছে–দেশের ১০৩টি কেন্দ্রের মধ্যে ৯৫টি কেন্দ্রে স্পিচ থেরাপিস্ট এবং ৯৮টি কেন্দ্রে অকুপেশনাল থেরাপিস্টের পদ শূন্য। এ ক্ষেত্রে তাদের যোগ্যতা বিবেচনায় গ্রেড দ্বিতীয় শ্রেণির হওয়ায় চাকরিতে প্রার্থীদের কম আগ্রহ লক্ষ করা যায়।

দক্ষতা : প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রে থেরাপিস্ট এবং থেরাপিস্ট সহকারীদের একাংশের থেরাপিসংক্রান্ত বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের ও প্রযুক্তিগত উপকরণ ব্যবহারে দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে। প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সুরক্ষা নিশ্চিতে বিশেষায়িত বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিএসএড প্রশিক্ষণসহ আরও বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের ঘাটতি রয়েছে, যেমন অকুপেশনাল ও আচরণসংক্রান্ত প্রশিক্ষণের ঘাটতি। ফলে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি, বিশেষ করে শিশুদের শারীরিক সুস্থতা, মানসিক ও বুদ্ধিগত বিকাশে বিলম্ব হয়।

গ. অবকাঠামো ও লজিস্টিকস

প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সেবা প্রদানকারী সংশ্লিষ্ট কার্যালয়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সরকারি হাসপাতাল, আদালত, দুর্যোগকালীন আশ্রয়কেন্দ্র, ভোটকেন্দ্র, রাস্তাঘাট, ফুটপাত, ফুটওভার ব্রিজ, লঞ্চ ও ফেরিঘাট প্রতিবন্ধীবান্ধব নয়। অধিকাংশ কার্যালয় ও প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তির উপযোগী

পরিবেশ ও সুযোগ-সুবিধা নেই। যেমন র‍্যাম্প, শৌচাগারের অভাব। হাসপাতালগুলোয় আলাদা ইউনিট বা কক্ষ নেই এবং চিকিৎসা উপকরণের ঘাটতি রয়েছে। বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক বিদ্যালয়ে অনেক ক্ষেত্রে পরিত্যক্ত জরাজীর্ণ টিনশেড ভবনে পাঠদান কার্যক্রম হয়। অনেক বিদ্যালয়ে সংলগ্ন মাঠ নেই এবং থেরাপির জন্য ব্যবহৃত অধিকাংশ মেশিন অকেজো। অধিকাংশ বাক-শ্রবণ ও দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের ভবন এবং আবাসন জরাজীর্ণ। তা ছাড়া আবাসনে কক্ষস্বল্পতা রয়েছে।

প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী বিদ্যালয় নেই, সরকরি দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী বিদ্যালয় পাঁচটি, সরকারি বাক-শ্রবণপ্রতিবন্ধী বিদ্যালয় আটটি, এমপিওভুক্ত বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক বিদ্যালয় জেলার সদর উপজেলাকেন্দ্রিক। নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ট্রাস্টের নিজস্ব ভবন নেই এবং জেলাকেন্দ্রিক কোনো কার্যালয় নেই। প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রে কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে মেরামতের বাধ্যবাধকতা থাকায় বিভিন্ন থেরাপি মেশিন নষ্ট হয়ে গেলে তা দীর্ঘসময় অকেজো থাকে। যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে কিছু মোবাইল ভ্যান এবং মোবাইল ভ্যানে স্থাপিত অত্যাধুনিক থেরাপি মেশিন অকেজো অবস্থায় রয়েছে। এ ছাড়া প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের বিতরণের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়ক উপকরণের (ট্রাই-সাইকেল এবং হিয়ারিং এইড) ঘাটতি রয়েছে।

সমন্বয়

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি থাকায় 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩' বাস্তবায়নে প্রণীত কর্মপরিকল্পনা অগ্রসরে ধীরগতি দেখা যাচ্ছে। কমিটিগুলোর সভা নিয়মিত না হওয়া, প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পদ প্রাপ্তি, যৌন নিপীড়ন, ধর্ষণসহ সব ধরনের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন থেকে সুরক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণে ঘাটতি লক্ষণীয়। সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের মধ্যে আন্তসমন্বয়ের ঘাটতি বিদ্যমান। স্বাস্থ্য, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা, শিক্ষা, পরিকল্পনা, সড়ক পরিবহন ও সেতু, মহিলা ও শিশুবিষয়ক, শ্রম ও কর্মসংস্থান, আইন মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সব মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের কল্যাণে কাজ করার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ফলে প্রতিবন্ধীবান্ধব অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবায় পরিকল্পনা প্রণয়নে উদ্যোগের ঘাটতি এবং সরকার জেলা সদর হাসপাতাল ও নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোয় র‍্যাম্প তৈরির মধ্যে সীমাবদ্ধ দেখা যায়। এ ছাড়া শনাক্তকরণ, ভাতা, ঋণ প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অধিকাংশ শহর বা উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় এবং প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের মধ্যে আলোচনা হয় না।

অংশগ্রহণ

প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের কল্যাণে বরাদ্দ নির্ধারণে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সংগঠন, প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের মতামত গ্রহণে উদ্যোগের ঘাটতি বিদ্যমান। অধিকাংশ জেলা ও উপজেলায় কমিটি থাকলেও নিয়মিত সভা না হওয়ায় সদস্যদের মতামত

প্রকাশের সুযোগ কম এবং ক্ষেত্রবিশেষে জেলা পর্যায়ের কমিটির সভায় অধিকাংশ সদস্যরা বক্তব্য বা মতামত তুলে ধরতে পারেন না। অধিকাংশ সরকারি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সংগঠন ও এনজিওগুলোর কার্যকর অংশগ্রহণের সুযোগ নেই এবং ক্ষেত্রবিশেষে তাদের মতামত গুরুত্ব না দেওয়ায় উদ্যোগগুলোর স্থায়িত্বের সংকট দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ, সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের মতামত উপেক্ষা করে মোবাইল ভ্যান তৈরি, অটিস্টিক ও বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী বিদ্যালয় এমপিওভুক্তিকরণ। বেশির ভাগ মোবাইল অকেজো হয়ে রয়েছে এবং অটিস্টিক ও বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী বিদ্যালয় এমপিওভুক্তির সময় বিদ্যালয়ের অর্থ এনজিও কর্তৃক তছরুপ হয়, এমনকি কয়েকটি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রভিডেন্ড ফান্ডের টাকা দেওয়া হয় না। এ ছাড়া দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনায় প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের অংশগ্রহণে ঘাটতি রয়েছে। উন্নয়ন প্রকল্পের পরিকল্পনা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নকশা প্রণয়নকারী সংস্থা, দাতা সংস্থা এবং প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সংগঠনের অংশগ্রহণের সুযোগ না থাকায় প্রকল্প প্রতিবন্ধীবান্ধব হয় না (ব্যতিক্রম মেট্রোরেল প্রকল্প)। এ ছাড়া কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকারি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে অধিকাংশ সময় প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সংগঠন ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণের সুযোগ রাখা হয় না।

স্বচ্ছতা

‘প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩’ বাস্তবায়নে প্রণীত কর্মপরিকল্পনায় উল্লিখিত বিভিন্ন উদ্যোগ ও প্রকল্পসংক্রান্ত তথ্যের ঘাটতি রয়েছে এবং প্রকাশিত তথ্য হালনাগাদ নয়। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে কমিটিসংক্রান্ত এবং সমাজসেবা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে গত ছয় বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন না থাকায় প্রতিবন্ধিতা-সম্পর্কিত তথ্যের ঘাটতি রয়েছে। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটের বিভিন্ন লিংক কার্যকর নয়। যেমন সমাজসেবা অধিদপ্তর ও এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্টের ওয়েবসাইট। এ ছাড়া সরকারি অনেক ওয়েবসাইটের পরিচিতি ছাড়া ভেতরের তথ্য এবং ওয়েবনির্ভর বা অনলাইন সেবা, বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার এবং অ্যাপ দৃষ্টিপ্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের জন্য অভিগম্য নয়, যেমন রেলওয়ের টিকিট কাটা।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে উপজেলা বা শহর সমাজসেবা কার্যালয় এবং প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রে হালনাগাদ নাগরিক সনদ এবং তথ্যবোর্ডে প্রয়োজনীয় তথ্যের ঘাটতি রয়েছে। প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের জন্য বরাদ্দের পরিমাণ, কতজন বরাদ্দ পাচ্ছে, কীভাবে সেবা পেতে পারে এ-সংক্রান্ত তথ্যের ঘাটতি বিদ্যমান। ‘দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কার্যক্রম’-এর বিস্তারিত তথ্য নেই। এ ছাড়া প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের বিভিন্ন সেবাসংক্রান্ত তথ্য প্রচার-প্রচারণায় ও সচেতনতামূলক কার্যক্রমে ঘাটতি রয়েছে। সুবর্ণকার্ড করার জন্য প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের একাংশ এবং তাদের অভিভাবক কোনো কোনো সময় প্রয়োজনীয় নথিপত্র ছাড়াই সমাজসেবা অফিসে যান। এ ছাড়া সচেতনতামূলক কার্যক্রমে ঘাটতি থাকার কারণে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সঙ্গে আচরণ ও পরিচর্যার ক্ষেত্রে অধিকাংশ অভিভাবকের পাশাপাশি সামাজিক অসচেতনতা বিদ্যমান

এবং এ কারণে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিরা সামাজিক অন্তর্ভুক্তিতে প্রতিবন্ধকতাসহ নানা ধরনের সমস্যা ও হয়রানির শিকার হন।

জবাবদিহি

ক. জবাবদিহির ব্যবস্থা ও তদারকি

'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩' বাস্তবায়নে জাতীয় পর্যায় থেকে মাঠপর্যায় পর্যন্ত গঠিত বিভিন্ন কমিটির নিয়মিত সভা হয় না। এ ক্ষেত্রে জেলা ও উপজেলা কমিটির সভাপতির অন্যান্য প্রশাসনিক ব্যস্ততা কারণ হিসেবে দেখানো হয়। ফলে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে ধীরগতি হচ্ছে এবং এর সুফল প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিরা পাচ্ছে না। প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের কল্যাণে গৃহীত বিভিন্ন সেবা প্রদান কার্যক্রম ও প্রকল্পে তদারকির (সরেজমিন পরিদর্শন, বিভিন্ন অনিয়ম-দুর্নীতির তদন্ত ইত্যাদি) ঘাটতি বিদ্যমান - শিক্ষা, ঋণ ও ভাতা, প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি শনাক্তকরণ ও সুবর্ণকার্ড বিতরণ কার্যক্রম ইত্যাদি। এ ছাড়া মাঠপর্যায়ে প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের কার্যক্রম, বিশেষ করে স্বাস্থ্যসেবা, কাউন্সেলিং, থেরাপি ও সহায়ক উপকরণ বিতরণ কার্যক্রমের ওপর যথাযথ তদারকির ঘাটতি রয়েছে।

খ. অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তির ব্যবস্থা

অধিকাংশ শহর বা উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ে লিখিত অভিযোগ দায়েরের সুযোগ থাকলেও নির্ধারিত ফরম ও অভিযোগ গ্রহণের রেজিস্টার নেই এবং অধিকাংশ কার্যালয়ে অভিযোগ বাক্স নেই। লিখিত অভিযোগ জানানোর পদ্ধতি সম্পর্কে প্রচারণা না থাকায় অধিকাংশ প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি সেবা-সম্পর্কিত কোনো অভিযোগ করেন না। এ ছাড়া সেবা ও যেকোনো ধরনের হয়রানিসংক্রান্ত অভিযোগ জানানোর জন্য হটলাইন থাকলেও প্রচার-প্রচারণার ঘাটতির কারণে অধিকাংশ প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি এটি ব্যবহার করেন না।

গ. নিরীক্ষা

১৯৯৬-২০১৯ সালের মধ্যে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সেবা প্রদান কার্যক্রমের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত অধিকাংশ উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ে কোনো নিরীক্ষা হয়নি। এ ছাড়া সমাজসেবা মন্ত্রণালয়ের কোনো কার্যালয়ে ২০১৬-এর পরে নিরীক্ষা হয়নি। এ ছাড়া এখন পর্যন্ত দেশের ৬৪টি জেলায় প্রতিষ্ঠিত ১০৩টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রে নিরীক্ষা হয়নি। জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনে ২০১৬-এর পরে নিরীক্ষা হয়নি।

সংবেদনশীলতা

ক. প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের প্রতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আচরণ

সমাজসেবা অফিসে গিয়ে আবেদন না করলে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি শনাক্তকরণের আওতায় আসেন না এবং বাড়ি বাড়ি গিয়ে শনাক্তকরণ কার্যক্রম কয়েক বছর ধরে বন্ধ রয়েছে। সরকারি হাসপাতালগুলোর দায়িত্বপ্রাপ্ত ডাক্তারদের একাংশ প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের চিকিৎসা দেওয়ার

বিষয়ে সহমর্মী নন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ডাক্তাররা বিরক্তি প্রকাশ করেন। উপজেলা পর্যায়ে ডাক্তারদের কাছে প্রতিবন্ধিতাসহ গর্ভবতী নারী গেলে তাদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে বিরক্তি প্রকাশ করা এবং সিজারের সময় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যানের কাছ থেকে সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে আনতে বলা হয়। অনেক সময় থেরাপির প্রয়োজন হলেও প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট ডাক্তার থেরাপিস্টের কাছে রেফার করেন না। প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের মূলধারায় অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে সাধারণ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একাংশের বিরূপ আচরণ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। সাধারণ বিদ্যালয়ের পাশে প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বলেছেন, 'এরা স্কুলের পরিবেশ নষ্ট করে।' প্রতিবন্ধীবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি না হওয়ায় এমপিওভুক্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ কম।

প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের জন্য কোটা থাকলেও তা চাকরির বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ করা হয় না। পাবলিক সার্ভিস কমিশনে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধিতাসহ প্রার্থীরা নানা ধরনের বৈষম্যের শিকার হন। আদালতে শারীরিক প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের প্রবেশগম্যতা তৈরির ক্ষেত্রে উদ্যোগের ঘাটতি রয়েছে। বাক-শ্রবণপ্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের জন্য ইশারা ভাষায় দক্ষ ব্যাখ্যাকারী দেওয়া হয় না। দৃষ্টি, বুদ্ধিপ্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের স্পর্শজনিত বক্তব্য আমলে না নেওয়ায় ধর্ষণের শিকার অধিকাংশ দৃষ্টি ও বুদ্ধিপ্রতিবন্ধিতাসহ শিশু ও নারী ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হয়।

ঢাকায় অধিকাংশ গণপরিবহনে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি, নারী ও শিশুদের জন্য আসন নির্দিষ্ট করা হলেও প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের জন্য তা সুনির্দিষ্ট করা হয়নি। যেসব আসন বরাদ্দ করা হয়েছে তা চালকের ও ইঞ্জিনের পাশাপাশি যা প্রশস্ত নয় এবং প্রতিবন্ধীবান্ধব নয়। গণপরিবহনে অনেক সময় নির্দিষ্ট সিটে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের বসতে দেওয়া হয় না। প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি ও তার অভিভাবক গণপরিবহনে চলার সময় খারাপ আচরণের সম্মুখীন হন। এ ছাড়া সারা দেশের অধিকাংশ সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের শৌচাগার ও গণশৌচাগার প্রতিবন্ধীবান্ধব করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উদ্যোগের ঘাটতি রয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে ঘাটতি রয়েছে।

খ. কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কর্তৃপক্ষের সাড়া প্রদান

প্রতিবন্ধিতাসহ শিক্ষার্থীদের পাঠদান কার্যক্রম-সম্পর্কিত প্রজ্ঞাপন দেরিতে জারি হয়। প্রজ্ঞাপন জারি হওয়ার পরে অনলাইন ক্লাসের মাধ্যমে প্রতিবন্ধিতাসহ শিক্ষার্থীদের পাঠদান কার্যকর করার ক্ষেত্রে পদক্ষেপ গ্রহণে ঘাটতি লক্ষ করা যায়। দরিদ্র প্রতিবন্ধিতাসহ শিক্ষার্থীরা স্মার্টফোন না থাকায় অনলাইন পাঠদান কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারে না। যারা নিয়মিত বিশেষ বিদ্যালয়ে আসত, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পরও দীর্ঘদিন স্কুলের বাইরে থাকার কারণে তাদের স্কুল থেকে ঝরে পড়ার ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুসারে অনেকের নিয়মিত চিকিৎসা ও বিভিন্ন ধরনের থেরাপির (স্পিচ থেরাপি, অকুপেশনাল থেরাপি, সাইকোলজিক্যাল থেরাপি, আচরণ থেরাপি ইত্যাদি) প্রয়োজন হয়। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে এপ্রিল-মে মাস পর্যন্ত প্রতিবন্ধী সেবা ও

সাহায্য কেন্দ্রে থেরাপি ও কাউন্সেলিং সেবা বন্ধ থাকায় এবং পরবর্তী সময়ে এসব সেবা প্রদানের পরিসর সীমিত হওয়ায় সাধারণ মানুষের চেয়ে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সার্বিক স্বাস্থ্যঝুঁকি বৃদ্ধি পেয়েছে। কোভিড-১৯ টেস্টের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের জন্য অধিকাংশ পরীক্ষাকেন্দ্রে পৃথক সারি ও চিকিৎসার জন্য পৃথক হাসপাতাল নির্দিষ্ট করা হয়নি এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোভিড হাসপাতালে করোনা আক্রান্ত প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের চিকিৎসা করা হয়নি।

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে অধিকাংশ কর্মহীন দরিদ্র পরিবারের পক্ষে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিকে বেসরকারিভাবে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও থেরাপি দেওয়া সম্ভব হয়নি এবং চিকিৎসার জন্য সরকারি অর্থসাহায্য পাওয়া যায়নি। সরকারিভাবে ২ হাজার ৫০০ টাকার অর্থসহায়তার কর্মসূচিতে তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি এবং এ ক্ষেত্রে সমাজসেবা মন্ত্রণালয় কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। সরকারের পক্ষ থেকে অধিকাংশ এলাকায় শুধু যাদের কার্ড আছে, তাদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করা হয়েছে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে চাল নিম্নমানের ছিল। অধিকাংশ প্রান্তিক প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি যাদের সুবর্ণকার্ড নেই, তারা আরও বেশি প্রান্তিক হয়েছেন এবং তাদের জীবন সংগ্রামে টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়েছে। কোনো কোনো এলাকায় প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণের সময় সামাজিক দূরত্ব বজায় না রাখায় তাদের স্বাস্থ্যঝুঁকি বৃদ্ধি পেয়েছে।

অনিয়ম-দুর্নীতি

ক. প্রতিবন্ধী শনাক্তকরণ ও সুবর্ণকার্ডসংক্রান্ত অনিয়ম-দুর্নীতি

কোনো কোনো সরকারি হাসপাতালের দায়িত্বপ্রাপ্ত ডাক্তার এবং তার সহকারীদের একাংশের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ কার্যক্রমে ১ হাজার থেকে ১ হাজার ৫০০ টাকা নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়ের অভিযোগ রয়েছে। অধিকাংশ জেলা সদর হাসপাতালে প্রতিবন্ধী শনাক্তকরণ কার্যক্রমে দায়িত্বপ্রাপ্ত ডাক্তার 'অনেক ব্যস্ত' থাকায় প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিরা সময়ক্ষেপণের পাশাপাশি হয়রানির শিকার হচ্ছে। উপজেলা বা শহর সমাজসেবা কার্যালয়ে তথ্যভান্ডারে নাম অন্তর্ভুক্তকরণে ক্ষেত্রবিশেষে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি বা তার নিকটাত্মীয়ের কাছ থেকে ১০০-২০০ টাকা নিয়মবহির্ভূতভাবে আদায় করা হয়। স্থানীয় সাংসদ, সচিবালয়, জেলা প্রশাসন অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশ কর্তৃক তাদের আত্মীয়স্বজন ও পরিচিতজন প্রকৃত প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি না হওয়া সত্ত্বেও সুবর্ণকার্ড প্রদানের জন্য সমাজসেবা কার্যালয়ে তদবির করে। তদবিরের মাধ্যমে যাদের সুবর্ণকার্ড দেওয়ার কথা নয়, তাদের কার্ড দেওয়া হচ্ছে। ফলে প্রকৃত প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিরা সুবর্ণকার্ড পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ইউনিয়ন পর্যায়ে জনপ্রতিনিধিদের একাংশের বিরুদ্ধে সুবর্ণকার্ডের জন্য ১ হাজার থেকে ৩ হাজার টাকা নিয়মবহির্ভূতভাবে আদায়ের অভিযোগ রয়েছে। আবার সুবর্ণকার্ড থাকা সত্ত্বেও প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা না পাওয়া এবং প্রাপ্য সুবিধা পেতে মধ্যস্থতা করার অভিযোগ রয়েছে।

খ. প্রতিবন্ধী ভাতাসংক্রান্ত অনিয়ম-দুর্নীতি

মাঠপর্যায়ে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের ভাতা পাওয়ার বিষয়টি নির্ভর করে জনপ্রতিনিধিদের সদিচ্ছার ওপর। ভাতাপ্রাপ্তির কার্ড পেতে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ রয়েছে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে জনপ্রতিনিধিদের একাংশ কর্তৃক প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের কাছ থেকে ১ হাজার থেকে ৩ হাজার টাকা নিয়মবহির্ভূতভাবে আদায়ের মাধ্যমে তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির অভিযোগ রয়েছে। টিআইবি পরিচালিত সেবা খাতে দুর্নীতিবিষয়ক জাতীয় খানা জরিপ ২০১৭-এর বিশ্লেষণ অনুযায়ী ২৩ দশমিক ৪ শতাংশ খানাকে ভাতায় অন্তর্ভুক্ত হতে নিয়মবহির্ভূতভাবে অর্থ দিতে হয়েছে। এ ছাড়া সময়ক্ষেপণ, স্বজনপ্রীতির ও প্রতারণার শিকার যথাক্রমে ১৯ দশমিক ৩ শতাংশ খানা, ১১ শতাংশ খানা এবং ৭ দশমিক ৯ শতাংশ খানা।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে যে নতুন দুই লাখ প্রতিবন্ধীতাসহ ব্যক্তি ভাতার আওতায় এসেছে ক্ষেত্রবিশেষে তাদের ভাতার অর্থের অংশবিশেষ আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে। প্রথমবার ভাতার বইয়ে সমাজসেবা কর্মকর্তার স্বাক্ষর লাগে বিধায় উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্মকর্তা এবং ইউনিয়ন পরিষদের জনপ্রতিনিধিদের একাংশ অর্থ আত্মসাতের সঙ্গে জড়িত থাকে। এ ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ভাতা প্রাপ্তির প্রথম কিস্তি পেতে ২৪ থেকে ৬৭ শতাংশ অর্থ আত্মসাৎ হয়ে থাকে।

গ. ক্রয়সংক্রান্ত অনিয়ম-দুর্নীতি

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন কর্তৃক ক্রয়কৃত বিভিন্ন থেরাপি মেশিন এবং প্রতিবন্ধিতাসহ শিশু ও ব্যক্তিদের জন্য সহায়ক উপকরণ নিম্নমানের, যদিও এ ধরনের ক্রয়ের জন্য যথাযথ আর্থিক বরাদ্দ থাকে। প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের একাংশের পরিচিত ও আত্মীয়দের বাসা ভাড়া নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। যোগসাজশের মাধ্যমে উভয় পক্ষ আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার অভিযোগ রয়েছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব ভাড়া করা কেন্দ্রের অবকাঠামো প্রতিবন্ধীবান্ধব নয়।

ঘ. এনজিওদের অনুদানসংক্রান্ত অনিয়ম-দুর্নীতি

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন শর্তসাপেক্ষে এনজিওদের আর্থিক সাহায্য দিয়ে থাকে। সাহায্যপ্রাপ্ত এনজিওদের একাংশ ফাউন্ডেশনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগসাজশের মাধ্যমে অনুদান পেয়ে থাকে। অনুদান পাওয়ার ক্ষেত্রে নিয়মবহির্ভূতভাবে ২০ হাজার থেকে ৭০ হাজার টাকা আদায়ের অভিযোগ রয়েছে। নিয়মবহির্ভূতভাবে অর্থ দিতে হয় বিধায় এসব এনজিও অঙ্গীকারবদ্ধ সব কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে না।

ঙ. সভার কার্যবিবরণীসংক্রান্ত অনিয়ম-দুর্নীতি

বছরের নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য কোনো কোনো উপজেলা কমিটি সভা না করেই সভাপতিসহ সবার স্বাক্ষর গ্রহণ করে সভার কার্যবিবরণী তৈরি করে।

চ. পরিবহন ভাড়াসংক্রান্ত অনিয়ম-দুর্নীতি

গণপরিবহনে কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের কার্ড থাকা সত্ত্বেও নির্ধারিত অর্ধেক ভাড়া না নিয়ে সম্পূর্ণ ভাড়া নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

টিআইবি পরিচালিত সেবা খাতে দুর্নীতিবিষয়ক জাতীয় খানা জরিপ ২০১৭-এর তথ্য বিশ্লেষণ অনুযায়ী দেখা যায় প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিরা তাদের অক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের মতো সব সেবা নিতেই অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার হয়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকারসহ সব ক্ষেত্রেই তারা কম-বেশি দুর্নীতির শিকার হয় (সারণি ৫)।

সারণি ৫ : সেবার খাতভেদে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তির দুর্নীতির শিকার হওয়ার চিত্র

সেবার খাত	সেবার ধরন	দুর্নীতির শিকার (%)	ঘুষের শিকার (%)	গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)
শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	উপবৃত্তির তালিকাভুক্তি, বইপ্রাপ্তি, ভর্তি/পুনঃ ভর্তি, প্রবেশপত্র	১১.৩	৮.০	২৫০
স্বাস্থ্য (সরকারি)	টিকিট ক্রয়, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, শয্যা, হুইলচেয়ার ব্যবহার, ওষুধ	১৩.৬	৫.৫	২৩৬
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	বিভিন্ন ধরনের সনদ ও প্রত্যয়নপত্র, ভাতা, সালিস	৩৪.৭	১৪.১	১৩৬১
ব্যাংকিং	ভাতা ও রেমিট্যান্স উত্তোলন	৪.২	১.৭	-*
সমাজসেবা কার্যালয়	শনাক্তকরণ ও সুবর্ণকার্ড, ভাতা	১৭.৪	৮.৭	-*

*পর্যাপ্ত তথ্য না থাকায় বিশ্লেষণ করা হয়নি

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

গবেষণায় দেখা যায়, নীতিগত ও আইনগতভাবে গুরুত্ব দেওয়া সত্ত্বেও বাস্তবে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের কল্যাণে বিদ্যমান কর্মপরিকল্পনা অন্তর্ভুক্তিমূলক নয় এবং তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সক্ষমতার ঘাটতি রয়েছে। রাষ্ট্রীয় বাজেটে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের জন্য বরাদ্দ বাস্তবসম্মত ও যথেষ্ট নয় এবং যে বরাদ্দ দেওয়া হয় তা-ও নানা অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে যথাযথভাবে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছায় না।

সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর নিয়মিত তদারকি ও নিরীক্ষা না হওয়ায় সেবা প্রদান কার্যক্রমে অনিয়ম-দুর্নীতি অব্যাহত রয়েছে। প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের প্রকৃত সংখ্যা নির্ধারণে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে ঘাটতি থাকায় অধিকাংশ প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি মৌলিক মানবধিকার ও রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। জাতিসংঘ প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের অধিকার সনদ এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের বিভিন্ন লক্ষ্য অনুসারে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের কল্যাণ ও উন্নয়নে অন্তর্ভুক্তিতে যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সংগঠনের মধ্যে সমন্বয় ও অংশগ্রহণের ঘাটতি রয়েছে।

অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, কর্মসংস্থান, পরিবহন, সার্বিক অবকাঠামো, সম্পদের ওপর সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা ও ন্যায়বিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে কার্যকর উদ্যোগের ঘাটতির কারণে উন্নয়নে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তির প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে।

সুপারিশ

আইন-সংক্রান্ত

১. আইন ও বিধিমালার সময়োপযোগী সংস্কার এবং আইনের বাস্তবায়ন করতে হবে।

ক. প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩-এর আওতায়:

- শারীরিক প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের গণপরিবহনে ওঠানামার ক্ষেত্রে র‍্যাম্পের বিষয়টি উল্লেখ করতে হবে।
- আইনটি কোন কোন আইনের ওপর প্রাধান্য পাবে, তা সুনির্দিষ্ট করতে হবে।
- পরিচয়পত্র ব্যতীত প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তির জন্য নির্ধারিত সুবিধা গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে।

খ. প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা বিধিমালা, ২০১৫-এর আওতায় :

- সব কমিটিতে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার প্রক্রিয়া উল্লেখ করতে হবে।
- কমিটিগুলোর সদস্যদের দায়িত্ব এবং কমিটির সভার সময়সীমা সুনির্দিষ্ট করে কমিটিগুলো জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে।
- কমিটিগুলোর সমন্বয়ের পদ্ধতি সুনির্দিষ্ট করতে হবে।

গ. প্রতিবন্ধিতা-সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা, ২০১৯-এর আওতায় :

- স্বীকৃত এমপিওভুক্ত বিদ্যালয়কে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য সরকারি জমি লিজ দিতে হবে, ভবন তৈরির উদ্যোগ নিতে হবে এবং এ-সংক্রান্ত ধারা ১৩ (৬) সংস্কার করতে হবে।

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতাসংক্রান্ত

২. জাতীয় বাজেটে প্রতিবন্ধিতাসংশ্লিষ্ট খাতের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে আলাদাভাবে বরাদ্দ রাখতে হবে এবং চাহিদার নিরিখে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিবন্ধিতা-সম্পর্কিত বাজেট বৃদ্ধি করতে হবে।

৩. সব ধরনের প্রতিষ্ঠান, রাস্তাঘাট, ব্রিজ, গণশৌচাগারসহ সংশ্লিষ্ট সব অবকাঠামো প্রতিবন্ধীবান্ধব করতে হবে।

৪. জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রতিটি সরকারি হাসপাতালে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের চিকিৎসার জন্য পৃথক ইউনিট করতে হবে যেখানে একজন ডাক্তার, নার্সসহ প্রয়োজনীয় জনবল থাকবে এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা উপকরণের ব্যবস্থাসহ চিকিৎসক, সমাজকর্মী ও স্বাস্থ্যকর্মীদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী বিশেষায়িত বিদ্যালয় এবং প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৬. প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সেবা প্রদানকারী সংশ্লিষ্ট সব প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ দিতে হবে এবং এসব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৭. প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি শনাক্তকরণে স্বীকৃত আন্তর্জাতিক পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে এবং এর মাধ্যমে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের গ্রহণযোগ্য প্রকৃত সংখ্যা নির্ণয় করতে হবে।

সংবেদনশীলতা, সমন্বয় ও অংশগ্রহণসংক্রান্ত

৮. সব ধরনের দুর্যোগকালীন প্রতিবন্ধিতাসহ শিশু ও ব্যক্তিদের জীবনধারণের মৌলিক চাহিদা পূরণে (বিশেষত তাদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সেবা, খাদ্যসহায়তা) সরকারিভাবে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে। এসব উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সংগঠনকে সম্পৃক্ত করতে হবে।

৯. প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে অন্তর্ভুক্ত করে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং এ লক্ষ্যে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের যুগোপযোগী বিভিন্ন বিষয়ের ওপর কার্যকর প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

১০. প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের উন্নয়নে অন্তর্ভুক্তিতে যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সংঠনের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ ও সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে।

স্বচ্ছতাসংক্রান্ত

১১. সংশ্লিষ্ট সব প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট তথ্যবহুল করতে হবে (বার্ষিক প্রতিবেদন, কমিটিসংক্রান্ত তথ্য, গৃহীত প্রকল্পসংক্রান্ত তথ্য) ও তথ্যগুলো নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে। সেবাসংক্রান্ত

তথ্য প্রচার-প্রচারণা ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম বৃদ্ধি করতে হবে। এ ছাড়া ওয়েবনির্ভর বা অনলাইন সেবা, বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার, অ্যাপ প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের জন্য অভিগম্য করতে হবে।

জবাবদিহি ও অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধসংক্রান্ত

১২. প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সেবা প্রদানকারী সব কার্যালয়ে কার্যকর তদারকি এবং অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধে জবাবদিহিমূলক নিয়মিত নিরীক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। এ ছাড়া সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়কে অন্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিবন্ধিতা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম তদারকির করতে হবে।

১৩. প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সেবা প্রদানকারী সংশ্লিষ্ট সব কার্যালয় কর্তৃক অভিযোগ দায়ের ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রচার-প্রচারণার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের অভিযোগ দায়েরের জন্য পৃথক হটলাইন চালু করতে হবে।

১৪. প্রতিবন্ধিতা সংশ্লিষ্ট সেবায় দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শাস্তির আওতায় আনতে হবে।

সরকারি সেবায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অভিগম্যতা জবাবদিহি ব্যবস্থার বিশ্লেষণ*

মো. মোস্তফা কামাল, অমিত সরকার ও জুলিয়েট রোজেটি

গবেষণার প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নৃতাত্ত্বিক, পেশাগত ও বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যভিত্তিক শ্রেণি-পরিচয়ের ন্যূনতম ৩ কোটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে; যারা বিভিন্নভাবে প্রান্তিকীকরণের শিকার। প্রান্তিকীকরণ বলতে এমন একটি অবস্থা বোঝানো হয়, যেখানে কোনো গোষ্ঠী বা ব্যক্তি সমাজের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পদ এবং অর্থনৈতিক, ধর্মীয় বা রাজনৈতিক ক্ষমতার বলয়ে অভিগম্যতা পায় না। আবার সামাজিকভাবে বর্জন, অন্তর্ভুক্তিতে দুর্বলতা এবং কালিমালেপনসহ সামাজিক বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতকে প্রান্তিকীকরণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিশু, আদিবাসী, দলিত, চরম দরিদ্র, নারী ও পুরুষ যৌনকর্মী, এইচআইভি/এইডস আক্রান্ত, হিজড়া এবং প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের বিভিন্ন ঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সংবিধানে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা, তাদের মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ এবং ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের ভিত্তিতে বৈষম্য প্রদর্শন না করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। জাতিসংঘের ‘টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টে’ ‘কাউকে পেছনে না রাখার’ প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা হয়েছে, যার লক্ষ্যমাত্রা ১০ দশমিক ২-এ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন এবং তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে, সদস্যরাষ্ট্র হিসেবে যা পূরণে বাংলাদেশ অঙ্গীকারবদ্ধ।

টিআইবির জাতীয় খানা জরিপ, ২০১৭-এ দুর্নীতিকে দরিদ্র, নিম্ন আয়, স্বল্পশিক্ষিত ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য একটি বোঝা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। জরিপের তথ্যমতে, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ওপর ঘুষ ও নিয়মবহির্ভূত অর্থের লেনদেনের প্রভাব তুলনামূলকভাবে বেশি। এ ছাড়া বাংলাদেশে সরকারি বিভিন্ন সেবাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে জবাবদিহি ব্যবস্থায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অভিগম্যতা ও অন্তর্ভুক্তি-সম্পর্কিত জ্ঞানের ঘাটতি রয়েছে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ওপর দুর্নীতির বোঝা এবং সম্ভাব্য জবাবদিহি ব্যবস্থা সম্পর্কে জানার আগ্রহ এবং টিআইবির পূর্ববর্তী গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় বর্তমান গবেষণার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ওপর দুর্নীতির বোঝা এবং সম্ভাব্য জবাবদিহি ব্যবস্থা সম্পর্কে জানার জন্য নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজা হয়েছে এই গবেষণায়।

---

* ২০২১ সালের ২১ অক্টোবর ঢাকায় ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশিত গবেষণার সারসংক্ষেপ।

- সরকারি সেবা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে জবাবদিহি করার ক্ষেত্রে বিদ্যমান ব্যবস্থায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য সুনির্দিষ্টভাবে কী কী সুযোগ রয়েছে?
- তারা কি এই সুযোগগুলো ব্যবহার করেন? সুযোগগুলো ব্যবহার করলে কী ধরনের প্রতিকার পান?
- তারা যদি এই সুযোগগুলো ব্যবহার না করতে পারেন বা কোনো প্রতিকার না পান, তাহলে তারা কী কী উপায় অবলম্বন করেন?
- সেবা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে জবাবদিহি করার ক্ষেত্রে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সুযোগ সৃষ্টির জন্য কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে?

গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য সরকারি বিভিন্ন সেবা গ্রহণকালে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী কর্তৃক বিদ্যমান জবাবদিহি ব্যবস্থায় অভিগম্যতা এবং তার প্রয়োগ সুশাসনের আঙ্গিকে পর্যালোচনা করা। গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে :

- বিভিন্ন সরকারি সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে বিদ্যমান জবাবদিহি কাঠামোয় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি পর্যালোচনা করা;
- সরকারি সেবায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য জবাবদিহি ব্যবস্থার কার্যকারিতা পর্যালোচনা করা;
- প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে সেবা প্রদানকারীদের জবাবদিহি নিশ্চিতে সুপারিশ প্রদান করা।

গবেষণার পরিধি

সব প্রান্তিক গোষ্ঠীকে কোনো একক গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা কঠিন বলে নৃতাত্ত্বিক, বর্ণভিত্তিক সংখ্যালঘু, শারীরিক প্রতিবন্ধকতা, জীবিকা, ভৌগোলিক অবস্থান, লিঙ্গ পরিচয় ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় নিয়ে এ গবেষণায় আদিবাসী, অ্যাসিড-সন্ত্রাসের শিকার, দলিত, চা-বাগানের শ্রমিক, হিজড়া জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গবেষণায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সুরক্ষাদান ও সামর্থ্য বৃদ্ধিতে প্রেক্ষাপট বিবেচনায় মৌলিক সেবা খাত, যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভূমি এবং সামাজিক নিরাপত্তাসহ স্থানীয় সরকারের সংশ্লিষ্ট সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে যেসব আইন, নীতি ও চর্চা বিদ্যমান রয়েছে তা গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ ছাড়া গবেষণার আওতায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য বিদ্যমান জবাবদিহি ব্যবস্থা এবং এর চর্চার বিভিন্ন দিক অন্তর্ভুক্ত।

গবেষণাপদ্ধতি ও সময়কাল

এটি একটি গুণগত গবেষণা। গবেষণায় গুণবাচক এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিমাণবাচক তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণায় প্রত্যক্ষ উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার পদ্ধতির মাধ্যমে নির্ধারিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সেবাগ্রহীতাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। মুখ্য তথ্যদাতা সাক্ষাৎকার পদ্ধতি ব্যবহার করে এবং স্থানীয় পর্যায়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর গোত্রপ্রধান, ইউনিয়ন পরিষদের জনপ্রতিনিধি ও কর্মচারী, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা,

সমাজসেবা কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, শিক্ষা কর্মকর্তা, মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তা, আইনজীবী, সাংবাদিকদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। একই পদ্ধতি প্রয়োগ করে জাতীয় ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে বাংলাদেশ চা-বোর্ড, শ্রম অধিদপ্তর এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা; প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জাতীয় পর্যায়ের নেতা, সংশ্লিষ্ট এনজিও, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি এবং খাতবিষয়ক বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। পরোক্ষ তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতি, সরকারি নথি, গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন, গবেষণা প্রতিবেদন ও প্রবন্ধ পর্যালোচনা করা হয়েছে। গবেষণার তথ্য সংগ্রহ অক্টোবর ২০২০ থেকে সেপ্টেম্বর ২০২১-এর মধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে।

বিশ্লেষণকাঠামো

প্রান্তিক জনগোষ্ঠী কর্তৃক বিদ্যমান জবাবদিহি ব্যবস্থায় অভিগম্যতা এবং তার প্রয়োগের তথ্য বিশ্লেষণ করতে সুশাসনের নির্দেশক আইনি সক্ষমতা, জবাবদিহি, স্বচ্ছতা ও অংশগ্রহণের ভিত্তিতে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

সারণি ১ : গবেষণায় ব্যবহৃত বিশ্লেষণকাঠামো

নির্দেশক	উপনির্দেশক/অন্তর্ভুক্ত বিষয়
আইনি সক্ষমতা	সেবা কাঠামোয় প্রান্তিক জনগোষ্ঠী অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকারী আইন, নীতিমালা, প্রবিধান
জবাবদিহি	অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভুক্তি, সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের তদারকি ব্যবস্থা
স্বচ্ছতা	তথ্যপ্রাপ্তিতে অভিগম্যতা, সেবা সংশ্লিষ্ট স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ
অংশগ্রহণ	গৃহীত উদ্যোগের উপযোগিতা মূল্যায়ন ও কার্য-ব্যবস্থাপনা/পরিচালনা কমিটিতে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ

গবেষণার ফলাফল

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীদের জন্য বিশেষ ইতিবাচক পদক্ষেপ

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :

আইনি সংস্কার বা সংস্কার প্রস্তাব : দলিত ম্যানুয়াল ২০১৩ প্রণয়ন; ২০১৯ সালে ৫০টি আদিবাসী গোষ্ঠীকে তালিকাভুক্ত করা, যদিও 'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী' হিসেবে নামকরণ করাকে তাদের আত্মপরিচয়ের মৌলিক অধিকার হরণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। শরিয়া ও সংবিধান অনুসরণ করে হিজড়া জনগোষ্ঠীর জন্য নতুন উত্তরাধিকার আইনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিক্ষাবিষয়ক সহায়তা প্রদান : সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১৯-২০ অর্থবছরে দলিত শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবৃত্তি (১৯ হাজার জন) ও হিজড়া শিক্ষার্থীদের (১ হাজার ২২৫ জন) উপবৃত্তি দেওয়া হয়েছে।

স্বাস্থ্যবিষয়ক সহায়তা প্রদান : দুর্গম এলাকার আদিবাসীদের স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কর্মকাঠামো এবং কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

প্রশিক্ষণ ও আয়বর্ধনমূলক উদ্যোগ গ্রহণ : সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২ হাজার ৪২০ জন দলিতকে বৃত্তি ও আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং ২ হাজার জনকে প্রশিক্ষণোত্তর আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

আর্থিক সহায়তা : অ্যাসিড-সন্ত্রাসের শিকার ভুক্তভোগীদের সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক ২০০২-২০ পর্যন্ত মোট ২ হাজার ১৪২ জনকে পুনর্বাসনের জন্য অর্থ সাহায্য এবং আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতির জন্য ক্ষুদ্রঋণ দেওয়া হয়েছে। সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১৯-২০ অর্থবছরে পঞ্চাশোর্ধ্ব দলিতদের বয়স্ক ভাতা (৪৫ হাজার), পঞ্চাশোর্ধ্ব অক্ষম ও অসচ্ছল হিজড়াদের (২ হাজার ৬০০) বিশেষ মাসিক ভাতা দেওয়া হয়েছে।

বিশেষ সহায়তা ও উদ্যোগ গ্রহণ : 'সমতলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন সহায়তা কর্মসূচি'র আওতায় আদিবাসী শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষাবৃত্তি এবং শিক্ষাসহায়ক উপকরণ বিতরণ; বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও অনুদান প্রদান; বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। চা-বাগানের শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি বৃদ্ধির উদ্যোগ (সর্বশেষ প্রস্তাবিত মজুরি বাস্তবতার নিরিখে অন্য যেকোনো খাতের চেয়ে সর্বনিম্ন), সুপেয় পানির ব্যবস্থা ও শ্রমিকদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধিতে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

সেবায় অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকারী আইন ও নীতিমালার পর্যালোচনা

বাংলাদেশ সংবিধানে রাষ্ট্রের মূলনীতি ও নাগরিকের অধিকার সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে, যেখানে নাগরিকের বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্যের কারণে অধিকার ও সেবাপ্রাপ্তিতে তার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাবে না উল্লেখ করা হয়েছে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক 'খসড়া বৈষম্য বিলোপ আইন' প্রণয়ন করা হয়েছে, যা এখনো পাস হয়নি। খসড়া আইনে অভিযোগ অনুসন্ধানকারী ও তদন্তকারী কর্মকর্তা এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে জবাবদিহি করার বিষয়টি উল্লেখ নেই, যার ফলে সঠিক অনুসন্ধান ও তদন্তে ঝুঁকি থেকে যাবে। অন্যদিকে, তদন্তের স্বার্থে 'সময় বর্ধিত' করা এবং 'যুক্তিসংগত' কারণে মামলা মুলতবির সুযোগ আইনে দেওয়া আছে, যার পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা খসড়া আইনে অনুপস্থিত। এর ফলে মামলা সম্পন্ন হতে দীর্ঘসূত্রতার সুযোগ থেকে যাবে। বৈষম্যবিরোধী আইন না থাকায় উদ্ভূত পরিস্থিতিতে মামলা করতে না পারার মতো বিষয় এ গবেষণায় উঠে এসেছে।

বাংলাদেশে সরকারি সেবাপ্রাপ্তির সুযোগ সব নাগরিকের জন্য সমান। তবে সেবায় অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতে কিছু কিছু প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বিশেষ অবস্থা ও চাহিদাকে গুরুত্ব দিয়ে প্রয়োজনীয় আইন এবং আলাদা নির্দেশনা প্রদান করা হয়ে থাকে।

আইনগতভাবে সব আদিবাসীর পরিচয় ও তাদের ভূমি অধিকারের স্বীকৃতি নেই। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের জন্য ভূমি কমিশন থাকলেও সমতলে বসবাসরত বৃহৎ আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভূমি সমস্যা সমাধানে ভূমি কমিশন নেই।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ এবং নীতিমালা, ২০১৫-এ অ্যাসিড-সন্ত্রাসের শিকার ভুক্তভোগীদের প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করে সরাসরি নিবন্ধনের সুযোগ রাখা হয়নি। এ ছাড়া নির্বাচন কমিটি কার কাছে জবাবদিহি করবে, সে বিষয়ে দিকনির্দেশনা আইনে নেই। ফলে অ্যাসিড-সন্ত্রাসের শিকার ভুক্তভোগীদের প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি হিসেবে নিবন্ধিত হওয়ার জন্য নির্বাচন কমিটির অনির্দিষ্ট বিবেচনা পদ্ধতির ওপর নির্ভরশীল হতে হয়।

অ্যাসিড দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির চিকিৎসা, আইনগত সহায়তা ও পুনর্বাসন বিধিমালা, ২০০৮-এ অ্যাসিড-সন্ত্রাসের শিকার ভুক্তভোগীদের চিকিৎসা, আইনি সহায়তা ও পুনর্বাসনের বিষয়ে একাধিক ব্যক্তির দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বলা হলেও কার কাছে তারা জবাবদিহি করবে, সে বিষয়ে আইনে দিকনির্দেশনা দেওয়া নেই। ফলে ভুক্তভোগীদের সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়।

জাতীয় শিক্ষা নীতি, ২০১০-এ আদিবাসী ভাষার বই বিতরণ, এর পাঠদান নিশ্চিত, শিক্ষক চাহিদা নিরূপণ ও তাদের প্রশিক্ষণ তদারকির বিষয়টি অনুল্লিখিত থাকায় তদারককারীদের জবাবদিহি নিশ্চিত করা যায় না।

শ্রম আইন, ২০০৬ এবং শ্রম বিধিমালা, ২০১৫-এ চা-শ্রমিকদের মৌলিক চাহিদাগুলো বাগান কর্তৃপক্ষ দিতে অপারগ হলে শুধু বাগান কর্তৃপক্ষই তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে লিখিত আকারে অবহিত করার বিধান রাখা হয়েছে। ফলে বাগানমালিক বা বাগান কর্তৃপক্ষকে শ্রমিকরা এ বিষয়ে জবাবদিহি ব্যবস্থার আওতায় আনতে পারেন না।

সার্বিকভাবে বিদ্যমান অভিযোগ নিরসন (জিআরএস) ও জবাবদিহি কাঠামো

সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিদ্যমান জবাবদিহি কাঠামো নিম্নরূপ (সারণি ২)।

সারণি ২ : সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিদ্যমান জবাবদিহি কাঠামো

ধরন	ব্যবস্থাসমূহ
প্রাতিষ্ঠানিক	অফলাইনে সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে সরাসরি ও ডাকযোগে, অভিযোগ বাক্সে লিখিত অভিযোগ দায়ের, হটলাইন নম্বরে অভিযোগ দায়ের, গণশুনানি, তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ
	অনলাইনে জিআরএস, ই-মেইল, ফেসবুক, ব্লগের মাধ্যমে অভিযোগ দায়ের
	অন্যান্য : প্রাতিষ্ঠানিক তদারকি ও নিরীক্ষা, ওয়ার্ড সভা, উন্মুক্ত বাজেট অধিবেশন, বিদ্যালয়ে অভিভাবক সভা এবং বিদ্যালয়, কমিউনিটি ক্লিনিক ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ব্যবস্থাপনা কমিটি
সামাজিক	ইউনিয়ন পরিষদে সামাজিক নিরীক্ষা, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে আলোচনা সভা

বিদ্যমান জবাবদিহি কাঠামোগুলো পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে পদ্ধতিগুলো ব্যবহারকারীবান্ধব নয়। এই পদ্ধতিগুলো ক্ষেত্রবিশেষে নির্দিষ্ট অভিযোগ ফরমের ওপর নির্ভরশীল। কোনো কোনো অভিযোগ নিরসন (জিআরএস) পদ্ধতি ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় ডিভাইস ও ইন্টারনেট-সুবিধা থাকা জরুরি। ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে যে জবাবদিহিমূলক কার্যক্রম পরিচালিত হয় তা অংশগ্রহণমূলক নয় এবং ক্ষমতাশালী দ্বারা বিভিন্ন সিদ্ধান্ত প্রভাবিত হয়ে থাকে। সামাজিক নিরীক্ষা সম্পাদন করতে সংশ্লিষ্টদের প্রতিবন্ধকতা তৈরি করার চর্চা রয়েছে এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি ও এনজিওদের এ কাজকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গুরুত্ব দেওয়া হয় না।

সংক্ষিপ্তভাবে বলা যায় যে জবাবদিহি ব্যবস্থা সম্পর্কে পরিচিতির অভাব ও এর প্রক্রিয়াগত জটিলতা, সেবা প্রদানকারীদের নেতিবাচক মানসিকতা ও চর্চার কারণে জবাবদিহি কাঠামো প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য সহজলভ্য বা অন্তর্ভুক্তিমূলক নয়।

সরকারি সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিতে বেসরকারি পদক্ষেপ

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনে সাড়া প্রদানে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের কার্যক্রম ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। যেমন দলিত জনগোষ্ঠীদের একটি প্ল্যাটফর্ম দলিত তাদের মধ্য থেকে কমিউনিটি লিডার ও প্রতিনিধি তৈরি করে, যারা সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে দলিত জনগোষ্ঠীদের সহায়তা করে থাকে। উত্তরাঞ্চলের একটি এনজিও ইউনিয়ন পরিষদে সামাজিক নিরীক্ষা (সোশ্যাল অডিট) ও উন্মুক্ত আলোচনা সভার আয়োজন করে থাকে। একটি আন্তর্জাতিক এনজিও সেবাদাতা ও সেবাগ্রহীতাদের (প্রান্তিক জনগোষ্ঠী) একত্র করে সচেতনতামূলক সভার আয়োজন করে থাকে। আরেকটি আন্তর্জাতিক এনজিও একটি এলাকায় বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অভিভাবকদের সমন্বয়ে সচেতনতা সভার আয়োজন এবং আরেকটি এলাকায় এ প্রতিষ্ঠানটি স্থানীয় ভূমি অফিসে আদিবাসীদের ভূমি সমস্যা নিয়ে 'ল্যান্ড ক্লিনিক' পরিচারলনা করে থাকে। দক্ষিণাঞ্চলের একটি সংগঠন দলিত জনগোষ্ঠীদের জীবনাচরণ সম্পর্কে সচেতনতামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে থাকে, যা মূলধারার জনগোষ্ঠীদের সংবেদনশীলতা বৃদ্ধিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে বলে তারা দাবি করেন।

এসব কার্যক্রম এনজিওদের সহায়তায় পরিচালিত হয় এবং ক্ষেত্রবিশেষে প্রকল্পনির্ভর হয়ে থাকে। ফলে কার্যক্রমগুলোর কার্যকারিতা সেবা প্রদানকারীদের মনোভাবের ওপর নির্ভর করে এবং প্রকল্প শেষ হয়ে গেলে এর সুফল পরবর্তী সময়ে আর টেকসই হয় না।

জবাবদিহি : অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভুক্তি

প্রান্তিক পরিচয়ের কারণে অভিযোগ দাখিল করতে না পারা : দলিত পরিচয়ের কারণে স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের সেবা ও জবাবদিহি কাঠামোয় অভিগম্যতায় বাধার সম্মুখীন হতে হয় এবং সেবা না পেলে অভিযোগ দায়ের করা তাদের জন্য আরও দুরূহ হয়ে পড়ে। সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে অভিগম্যতায় বাধার সম্মুখীন হওয়া প্রসঙ্গে একটি দলিত অধিকার সংগঠনের প্রধান বলেন, 'আমাদের একটি কর্ম এলাকার দরিদ্র দলিত পরিবারের ওপর পরিচালিত জরিপের ফলাফলে দেখা যায় যে এই এলাকার শতভাগ পরিবার বেসরকারি হাসপাতালে প্রসবসেবা নিয়েছে। এসব

পরিবার সিজারিয়ান অপারেশনের মাধ্যমে ৯৮ শতাংশ বাচ্চা প্রসব করিয়েছেন, যার খরচ সরকারি হাসপাতালের তুলনায় এখানে বেশি। কতটা নিগৃহীত হলে দরিদ্র মানুষেরা এসব ব্যয়বহুল জায়গায় যায়।'

অন্য আরেক জায়গায়, কোভিড-১৯ অতিমারির সময় হিজড়া জনগোষ্ঠীদের সরকারি ত্রাণসহায়তার লাইনে দাঁড়াতে দেওয়া হয়নি। এ বিষয়ে তারা জনপ্রতিনিধির কাছে অভিযোগ জানাতে চাইলে ওয়ার্ড কমিশনার অফিসের কর্মচারীরা তাদের বাধা দিয়েছেন। অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অভিযোগ করতে না পারার উদাহরণ রয়েছে। যেমন ঘুষ দিয়েও বয়স্ক ভাতায় তালিকাভুক্ত না হওয়া এবং অভিযোগ দায়ের করতে না পারা প্রসঙ্গে দলিত জনগোষ্ঠীর একজন বর্ণনা করেন, 'ওয়ার্ড মেম্বারের নামে কার কাছে অভিযোগ করব? চেয়ারম্যানের কাছে? তারা তো একই দলের লোক। পানিতে নেমে তো আর কুমিরের সঙ্গে মারামারি করা যায় না।'

শিক্ষাসংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অভিযোগ করে সমাধান না পাওয়া : বিদ্যালয়ে 'মূলধারা'র সহপাঠী ও শিক্ষকদের বর্ণবাদমূলক আচরণের অভিযোগে সমাধান না পাওয়ার বিষয়টি গবেষণায় উঠে এসেছে। এ ক্ষেত্রে অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকজন শিক্ষার্থী ও অভিভাবককে শিক্ষকদের বিরূপ মন্তব্যেরও শিকার হতে হয়েছে। একটি জায়গায় মূলধারার শিক্ষার্থী কর্তৃক দলিত শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান ব্যবহারিক পরীক্ষাগারের সরঞ্জাম ধরতে না দেওয়া প্রসঙ্গে ব্যবহারিক পরীক্ষাগারের শিক্ষককে অভিভাবকরা অভিযোগ জানালে এই শিক্ষক বলেন, 'আপনাদের (দলিত জনগোষ্ঠীর) সন্তানরা ভালোভাবে ব্যবহারিক পরীক্ষা করতে পারে না। অন্যরা (মূলধারার শিক্ষার্থীরা) তো ঠিকই বলেছে, ভালো হয় আপনাদের সন্তানরা যন্ত্রপাতি না ধরে অন্যরা কীভাবে পরীক্ষা করে তা দেখুক।' অন্য আরেক জায়গায়, মূলধারার একজন শিক্ষার্থী দলিত শিক্ষার্থীকে তার বাবার পেশা ও বর্ণপরিচয় নিয়ে করা কটূক্তির প্রতিকার পেতে অভিভাবক অভিযোগ করলে শিক্ষক বলেন, 'আমি কী করতে পারি? আমি তো ওদের এসব শিক্ষা দিই না। আর ওরা তো বাচ্চা, ওরা এসব বলতেই পারে।' আরেকটি জায়গায়, শিক্ষক কর্তৃক দলিত শিক্ষার্থীদের দিয়ে বিদ্যালয়ের শৌচাগার পরিষ্কার করানোর প্রতিবাদের কারণে দলিত শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় অকৃতকার্য করার অভিযোগ রয়েছে। এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে লিখিত অভিযোগ দিলে তিনি উপজেলা শিক্ষা এবং সমাজসেবা কর্মকর্তার সমন্বয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করে দেন। তদন্তকারী কর্মকর্তারা অভিযোগকারী অভিভাবকদের সরকারি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানো হলে ভালো ফল বয়ে আনবে না বলে হুমকি দেন। বিষয়টি পরে অমীমাংসিত রয়ে গেছে।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অভিযোগ দিয়েও প্রতিকার না পাওয়া : কোভিড-১৯ অতিমারির সময় একটি দলিত কলোনির সব পরিবার ত্রাণসহায়তা পায়নি। ত্রাণের তালিকার ত্রুটি নিয়ে জেলা প্রশাসককে অভিযোগ জানিয়ে কোনো সমাধান না পাওয়ার উদাহরণ রয়েছে। এ বিষয়ে জেলা প্রশাসক বলেন, 'আমাদের কাজ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সহায়তা করা। তাদের তৈরি করা তালিকাই মূল তালিকা, আমি এখানে হাত দিতে পারি না।' সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিযোগ করা ও প্রতিকার না পাওয়া নিয়ে আদিবাসী সংগঠনের একজন নেতা বলেন, 'চেয়ারম্যান প্রকাশ্যেই আমাদের "ভারতীয়", "বহিরাগত", "পাহাড় দখলকারী" বলে এবং সেই

মনোভাব থেকে আমাদের বিভিন্ন সনদ দেওয়া ও ভাতার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা থেকে বিরত থাকে। মেম্বাররাও যে আমাদের কাছ থেকে এ জন্য ঘুষ নেয় তা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানেন, কারণ আমিই তাদের জিনিসগুলো জানিয়েছি। কিন্তু জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে গেলে ঝামেলা হয় বলে সংশ্লিষ্টরা কোনো কিছু করে না।'

ভূমিসংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অভিযোগ জানিয়েও সহযোগিতা না পাওয়া : স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের কাছে অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও 'সংরক্ষিত বনাঞ্চল' দখলমুক্ত করার নামে বন বিভাগ কর্তৃক আদিবাসীদের তাদের জমি থেকে উচ্ছেদ করা হয়। মধুপুরে 'সংরক্ষিত বনাঞ্চল' ঘোষণা অনিয়মতান্ত্রিকভাবে করা হয়েছে উল্লেখ করে পরিবেশবাদী সংগঠনের মামলায় উচ্চ আদালতের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা অবজ্ঞা করে 'সংরক্ষিত বনাঞ্চল' দখলমুক্ত করা ও সামাজিক বনায়নের নামে আদিবাসীদের বসত-ভিটা ও আবাদি জমিতে বন বিভাগের উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করার প্রমাণ রয়েছে। আবার শেরপুরে স্থানীয় আদিবাসীদের বাড়ি ও আবাদি জমি বন বিভাগের উল্লেখ করে 'অবৈধ দখলকারী'দের তালিকা তৈরি করে উচ্ছেদ ও সামাজিক বনায়নের লক্ষ্যে জমির ফসল ও বাগানের গাছপালা ধ্বংস করার দৃষ্টান্ত রয়েছে। আদিবাসীদের ভূমি অধিকার সম্পর্কে আদিবাসী সংগঠনের একজন নেতা বলেন, 'আদিবাসীদের জন্য মাতৃভাষার অধিকার থেকে ভূমি অধিকারের সংকট এখন একটি বড় চ্যালেঞ্জ। সমতলের আদিবাসীদের জন্য কোনো ভূমি কমিশন নেই। ফলে ভূমি অধিকারসংক্রান্ত অনেক সমস্যা অসমাপ্ত থেকে যাচ্ছে। আর্থসামাজিক সমস্যাসহ বিভিন্ন কারণে আগামী ২০ বছরের মধ্যে ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ আদিবাসী ভূমিহীন হয়ে যাবে।'

অভিযোগ দাখিলের বিরূপ প্রতিক্রিয়া : অভিযোগ করার ফলে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীদের নেতিবাচক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় কম ত্রাণ পেয়ে অভিযোগ করার কারণে আদিবাসী পরিবারের ত্রাণসহায়তা বন্ধ হয়ে গেছে। অন্য এক জায়গায়, উচ্চবর্ণের হিন্দুদের প্রতিরোধের কারণে একজন দলিত ব্যক্তির লাশ একটি শ্মশানে দাহ করতে দেওয়া হয়নি। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে এ বিষয়ে অভিযোগ করলে তার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ভিন্ন শ্মশানে লাশ দাহ করতে বলেন। আরেকটি জায়গায়, দলিতদের খাবার হোটেলে প্রবেশ ও বসে খাবার খেতে বাধা দেওয়ার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক দলিতদের জন্য আলাদা বসার জায়গা ও তৈজসপত্র ব্যবহারের লিখিত নির্দেশ প্রদান করেন। আদিবাসীদের মধ্যে শতভাগ স্যানিটেশন নিশ্চিত করা হয়নি অভিযোগ করায় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর একজন অধ্যাপককে জনপ্রতিনিধি ও সরকারি কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে সভা থেকে বের করে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে– এমন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

জবাবদিহি : সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের তদারকি ব্যবস্থাপনায় চ্যালেঞ্জ

তদারকির ঘাটতি : অভিযোগ দায়ের ব্যবস্থার তদারকি সুসংহত নয়। আদিবাসী পরিচয়ের কারণে শিক্ষা, ভূমি ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বিষয়ক লিখিত অভিযোগ সরাসরি উপস্থিত হয়ে দাখিল করা হলেও তা রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ, সংরক্ষণ ও ফলোআপ না করার উদাহরণ রয়েছে।

প্রান্তিক জনসংখ্যার তথ্য : প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলোর জনসংখ্যাবিষয়ক তথ্য সংগ্রহে তদারকির ঘাটতি ও সমন্বয়হীনতার বিষয়টি লক্ষণীয়। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও সমাজসেবা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে ও বিভিন্ন প্রতিবেদনে এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে ও প্রতিবেদনে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীদের ভিন্ন ভিন্ন জনসংখ্যা এবং সংজ্ঞা উল্লেখ করার বিষয়টি দেখা যায়।

শিক্ষায় তদারকির ঘাটতি : শিক্ষাসংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের তদারকির ঘাটতির কারণে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের শিক্ষার বিষয়টি উপেক্ষিত থেকে যায়। উদাহরণস্বরূপ, চা-বাগানের বিদ্যালয়ে অবকাঠামোগত সুবিধা ও শ্রেণিকক্ষে প্রয়োজনীয় আসবাবের অনুপস্থিতি রয়েছে। অবাঙালি শিক্ষার্থীদের পাঠদান ও পরীক্ষার প্রশ্ন বুঝতে না পারার বিষয়ে শিক্ষকদের অসহযোগিতামূলক আচরণ বিদ্যমান।

স্বাস্থ্যসেবায় তদারকির ঘাটতি : চা-বাগান কর্তৃপক্ষ বিধান অনুযায়ী শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসেবার সামান্যই পূরণ করছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের তদারকির ঘাটতির কারণে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসেবা উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে। অন্যদিকে, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও তৎসংলগ্ন সমতলে সুপেয় পানির সুবিধা, স্যানিটেশন ও সরকারি টিকাদান কর্মসূচিতে তদারকির ঘাটতির কারণে স্থানীয়ভাবে ডায়রিয়া ও হামের প্রকোপ দেখা যায়। এই প্রকোপকে স্থানীয়ভাবে 'অজানা অসুখ' আখ্যায়িত করে তদারকির ঘাটতিকে এড়িয়ে যাওয়া হয় এবং ক্ষেত্রবিশেষে দোষী ব্যক্তিদের শাস্তিস্বরূপ সর্বোচ্চ অন্যত্র বদলি করা হয়। এসব সমস্যা নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের একজন আদিবাসী বলেন, 'এখানে সেনাবাহিনীর ক্যাম্প স্থাপন হলেই রাস্তা তৈরি হয়, ক্যাম্পে সুপেয় পানির সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়। কিন্তু আদিবাসীদের ছড়া বা নদী থেকেই পানি সংগ্রহ করতে হয়। সরকার এত টাকা খরচ করে পদ্মা নদী জয় করছে, আমাদের সঙ্গে সেতুবন্ধ স্থাপন এর থেকে কম খরচে করা যেত। রাষ্ট্র যে আমাদের গুরুত্ব দেয় না তার প্রমাণ হচ্ছে জাতীয় সম্প্রচারমাধ্যমে "বান্দরবানে পোস্টিং করে দিব" বিজ্ঞাপন।'

স্বচ্ছতা : তথ্যে অভিগম্যতায় চ্যালেঞ্জ

সেবাসংক্রান্ত তথ্যে অভিগম্যতা : দলিত শিক্ষার্থীরা উপবৃত্তি না পেলে তার কারণ শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা জানতে চাইলে শিক্ষকরা তা জানান না। অন্যদিকে, দলিত জনগোষ্ঠী কর্তৃক তথ্য অধিকার আইনে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে ওষুধ বিতরণ-সম্পর্কিত তথ্যের আবেদন করায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় প্রভাবশালীদের বিড়ম্বনা ও হুমকির শিকার হওয়ার দৃষ্টান্ত রয়েছে।

জবাবদিহি-সংক্রান্ত তথ্যে অভিগম্যতা : সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির তালিকাভুক্তিতে অনিয়ম নিয়ে অভিযোগ জানানোর প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে চাইলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিরা এ-সম্পর্কে তথ্য প্রদান না করে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা হয়।

তথ্যে অভিগম্যতায় ঘাটতির কারণ : সেবা গ্রহীতা ও খাতবিষয়ক বিশেষজ্ঞদের মতে, ভৌগোলিক চ্যালেঞ্জ, সেবা সম্পর্কে অসচেতনতা, স্বল্প শিক্ষা বা নিরক্ষরতা, অনীহা, আর্থসামাজিক অবস্থা, সামাজিক বঞ্চনার কারণে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী তথ্যের অভিগম্যতায় চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে থাকে।

স্বচ্ছতা : সেবাসংশ্লিষ্ট স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশে ঘাটতি

সেবাসংক্রান্ত তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে অস্বচ্ছতা : সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উপকারভোগী বাছাইকরণে অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করা হয়। যেমন উপকারভোগী বাছাইকরণ সম্পর্কে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে প্রচার করা হয় না এবং সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় কোনো আবেদনকারী না এলে তার কারণ তাকে জানানো হয় না। এমনকি দলিতদের জন্য আবাসন প্রকল্পের আওতায় তাদের স্থানান্তর ও পুনর্বাসনের তথ্য তারা জানতে চাইলে তা না জানানোর দৃষ্টান্ত রয়েছে।

স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের চর্চায় ঘাটতি : ভূমিসংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে গণশুনানির আয়োজন করা হলেও তার প্রচার আদিবাসী-অধ্যুষিত এলাকায় করা হয় না। এর পাশাপাশি সেবা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সেবা ও অভিযোগ নিরসনব্যবস্থা সম্পর্কে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের চর্চাও নগণ্য। এ প্রসঙ্গে একজন সাবেক অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা বলেন, 'আমরা চাই না যে লোকজন অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা সম্পর্কে অবগত হয় এবং অভিযোগ করে। এগুলো তদন্ত করা, সমাধান করা ঝামেলার ব্যাপার। তাই এই ডিপার্টমেন্টে লোকজন বদলি হয়ে আসতে চায় না, আর বেশি দিন থাকতেও চায় না। এ জন্য সরকারি ওয়েবসাইটে ক্ষেত্রবিশেষে অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তার (অনিক) নাম, ফোন নম্বর দেওয়া থাকে না।'

অংশগ্রহণ : মূল্যায়ন ও কার্য-ব্যবস্থাপনা/পরিচালনা কমিটিতে অংশগ্রহণ

প্রান্তিক জনগোষ্ঠী-অধ্যুষিত এলাকার বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সভায় সংশ্লিষ্ট প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয় না। যেমন বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটিতে জমিদাতাকে সদস্য করার বিধান থাকলেও দলিত ও আদিবাসী ব্যক্তির দান করা জমিতে নির্মিত বিদ্যালয়ের কমিটিতে দাতা বা তার পরিবার, এমনকি তার গোষ্ঠীর কাউকে না রাখার দৃষ্টান্ত রয়েছে। আবার বিদ্যালয় কমিটির নির্বাচিত দলিত সদস্যকে নিয়মিতভাবে সভার তারিখ সম্পর্কে না জানানোর চর্চা গবেষণায় উঠে এসেছে। এ ছাড়া ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় দলিত জনগোষ্ঠীর সদস্যদের মতামত নেওয়া হয় না বা তাদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। এই সভায় তাদের অংশগ্রহণে বাধা সৃষ্টি করতে স্থানীয় প্রভাবশালী 'মূলধারার' ব্যক্তিদের নেতিবাচক প্রভাব কাজ করে।

বিভিন্ন স্থায়ী কমিটি এবং উপকারভোগী বাছাইয়ের উপজেলা কমিটিতে আদিবাসী ও দলিতদের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব রাখা হয় না। সমাজসেবা অধিদপ্তরের বিশেষ কর্মসূচির উপকারভোগী বাছাই কমিটিতে নিষ্ক্রিয় দলিত প্রতিনিধি বা প্রভাবশালীদের আজ্ঞাবহ দলিত প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এসব কমিটির আদিবাসী ও দলিত প্রতিনিধিদের সভার তারিখ ও সভায় অংশগ্রণের আমন্ত্রণ জানানো হয় না। গবেষণাধীন একটি এলাকায়, প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের বিশেষ কর্মসূচির আওতায় উপজেলা সমন্বয় কমিটিতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার অফিসের একজন পিয়নকে সদস্য করা হয়, যিনি নির্বাহী কর্মকর্তার উপস্থিতির কারণে সভাকক্ষের চেয়ারে বসতে চাইতেন না। এ বিষয়ে একজন আদিবাসী নেত্রী প্রতিবাদ করলে নির্বাহী কর্মকর্তা তাকে শাসিয়ে বলেন, 'আমি কমিটিতে কাকে নেব, বাদ দেব, তা কি আপনাদের জিজ্ঞেস করে ঠিক করব? সরকার এ বিষয়ে আপনাদের মতামত নিতে বাধ্য না। বেশি বাড়াবাড়ি করলে আপনাদের সংগঠনের কাজ বন্ধ করে দেব।'

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট উপাত্তের অনুপস্থিতি তাদের প্রতি উদাসীনতা ও অবজ্ঞার বহিঃপ্রকাশ এবং তাদের মূলধারায় নিয়ে আসার ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে সরকারি সেবা ও জবাবদিহি ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রচারে ঘাটতি বিদ্যমান। আবার আইনি সীমাবদ্ধতা বা আইনের অনুপস্থিতি, আইনের যথাযথ প্রয়োগে ব্যর্থতার কারণে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সেবায় অভিগম্যতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয় থাকে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো বিভিন্ন সেবা প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান জবাবদিহি কাঠামো অনেক ক্ষেত্রে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক নয়। কারণ এ ক্ষেত্রে তাদের ভাষাগত দক্ষতা, আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সামর্থ্য ইত্যাদি সীমাবদ্ধতা বিবেচনায় নেওয়া হয়নি। আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীদের নেতিবাচক মানসিকতা ও চর্চা, অভিযোগ দাখিলে প্রত্যাশিত ফলাফল না পাওয়া বরং বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হওয়ার কারণে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী জবাবদিহি কাঠামো ব্যবহারে নিরুৎসাহিত হন। সর্বোপরি, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মৌলিক সেবা নিশ্চিতে জবাবদিহি ব্যবস্থা শক্তিশালী করা না হলে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের 'কাউকে পেছনে না রাখা' লক্ষ্য অর্জন করা কঠিন হবে।

সুপারিশ

১. বিভিন্ন সেবায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তিতে বাধা দূর করতে এবং বৈষম্যহীন ও জবাবদিহিমূলক সেবা নিশ্চিত করতে বৈষম্য বিলোপ আইন দ্রুত প্রণয়ন করতে হবে।

২. সব প্রান্তিক গোষ্ঠীর ভৌগোলিক অবস্থান ও জনসংখ্যা সম্পর্কে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতে হবে এবং তা নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে।

৩. সরকারি প্রতিষ্ঠানের সেবা ও জবাবদিহি ব্যবস্থা সম্পর্কে মাঠপর্যায়ে এবং সব গণমাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ভাষায় যথাযথ এবং নিয়মিত প্রচার পরিচালনা নিশ্চিত করতে হবে। প্রচার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও সংশ্লিষ্ট বেসরকারি অংশীজনদের সম্পৃক্ত করতে হবে।

৪. সেবাসংক্রান্ত অভিযোগ কাঠামো প্রান্তিক জনগোষ্ঠীবান্ধব করার জন্য সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠী থেকে মৌখিক অভিযোগ গ্রহণ ও তা লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা করতে হবে এবং সমাধানে নিয়মিত ফলোআপ করতে হবে।

৫. সরকারি প্রতিষ্ঠানের গণশুনানিতে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সমস্যা নিয়ে আলাদা সময় বরাদ্দ করতে হবে এবং তাদের সমস্যা প্রকাশে উৎসাহিত করতে হবে।

৬. সমতলের আদিবাসীদের ভূমি সমস্যা দূর করতে এবং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের জবাবদিহি নিশ্চিত করতে আদিবাসীদের দিয়ে নিয়মিত গণশুনানি করতে হবে।

৭. প্রান্তিক জনগোষ্ঠী-অধ্যুষিত এলাকার সেবা প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বকারীদের সেবা প্রদানকারী হিসেবে নিয়োগ বা পদায়ন করার ক্ষেত্রে প্রাধান্য দিতে হবে।

৮. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণ নিশ্চিতে সংরক্ষিত প্রতিনিধিত্ব/সদস্যপদ তৈরি করতে হবে।

৯. সংবিধান প্রতিশ্রুত অন্তর্ভুক্তি, বৈষম্যহীন ও জবাবদিহিমূলক সেবা নিশ্চিত করতে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সম্পর্কে সেবা প্রদানকারীদের মানসিকতা এবং চর্চায় পরিবর্তন আনতে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

১০. চলমান সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমগুলোর স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করতে করণীয় নির্ধারণে সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি অংশীজনের সমন্বয়ে নিয়মিত মূল্যায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে।

সরকারি গণগ্রন্থাগার সেবা ও ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়*

কুমার বিশ্বজিত দাশ

গবেষণার প্রেক্ষাপট

মানুষের জ্ঞান-সমৃদ্ধির কেন্দ্রস্থল গ্রন্থাগার, যা মানুষকে পড়ার প্রতি আগ্রহী, স্বশিক্ষিত ও রুচিশীল করে তোলে। গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য তথ্যসম্পদ সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, বিতরণ ও তথ্যসেবা দানের মাধ্যমে শিক্ষা, গবেষণা ও অন্যান্য মৌল উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সহযোগিতা করা। বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগারের মধ্যে সমাজ ও জাতি গঠনে গণগ্রন্থাগারের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। শিশু-কিশোরদের মানস গঠন থেকে আরম্ভ করে জাতি গঠনের সব স্তরে সেবা বিতরণে গণগ্রন্থাগার উদারহস্ত। গণগ্রন্থাগার সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে শিক্ষা অর্জনকে পূর্ণতাদানে সহায়তা করে। সে জন্য গণগ্রন্থাগারকে জনগণের বিশ্ববিদ্যালয় বলা যায়। মোটকথা, জাতি গঠনের ক্ষেত্রে গণগ্রন্থাগারের ভূমিকা অসামান্য।

বাংলাদেশ পরিষদের অধীন গণগ্রন্থাগারগুলোর উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৮৩ সালে এনাম কমিটির সুপারিশে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়। গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন পর্যায়ে ৭১টি সরকারি গণগ্রন্থাগার পরিচালিত হচ্ছে, যেখানে মোট সংগৃহীত পুস্তকের সংখ্যা প্রায় ২৮ লাখ ২০ হাজার ২৯৫টি এবং নিবন্ধিত সদস্য পাঠকের সংখ্যা প্রায় ১১ হাজার। ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ৩৪ লাখ ৯২ হাজার ৮০৩ জন পাঠক এসব গণগ্রন্থাগার থেকে বিভিন্ন ধরনের সেবা গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন নীতি ও পরিকল্পনায় গণগ্রন্থাগারের সেবা উন্নয়নের ওপর জোর দেওয়া এবং বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। তবে এসব পদক্ষেপের ফলে কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হলেও পাঠকসেবা প্রদান ও ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে এখনো নানাবিধ সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ রয়েছে। বিভিন্ন গবেষণা ও গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে গণগ্রন্থাগারগুলোর সেবা ও ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের ঘাটতি ও সীমাবদ্ধতার চিত্র উঠে এলেও এ-সম্পর্কে বিস্তারিত গবেষণার ঘাটতি বিদ্যমান। টিআইবি তার কর্মক্ষেত্রের অংশ হিসেবে শিক্ষা খাতসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সুশাসনের চ্যালেঞ্জ বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে; শিক্ষাক্ষেত্রে গণগ্রন্থাগারের গুরুত্ব বিবেচনায় বর্তমান গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে।

---

* ২০২১ সালের ৬ মে টিআইবির ওয়েবসাইটে প্রকাশিত গবেষণার সারসংক্ষেপ।

গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য সরকারি গণগ্রন্থাগার পরিচালনার ক্ষেত্রে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় অনুসন্ধান করা। এ ছাড়া সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে:

- গণগ্রন্থাগার সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও নীতিকাঠামো পর্যালোচনা করা।
- সেবা ও ব্যবস্থাপনায় প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা ও কার্যকারিতা পর্যালোচনা করা
- সেবা ও ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন, ক্ষেত্র ও মাত্রা চিহ্নিত করা।
- বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণের উপায় সুপারিশ করা।

গবেষণাপদ্ধতি, পরিধি ও সময়কাল

এটি একটি গুণবাচক গবেষণা। গবেষণার উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রত্যেক্ষ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। মুখ্য তথ্যদাতা হিসেবে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি গণগ্রন্থাগারে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারী (চিফ লাইব্রেরিয়ান/পরিচালক, প্রিন্সিপাল লাইব্রেরিয়ান/ উপপরিচালক, সহকারী পরিচালক, লাইব্রেরিয়ান, সহকারী লাইব্রেরিয়ান, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, জুনিয়র লাইব্রেরিয়ান, টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট বা ক্যাটালগার, রিডিংহল অ্যাসিস্ট্যান্ট, লাইব্রেরি অ্যাসিস্ট্যান্ট), শিক্ষাবিদ, গ্রন্থাগার পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তি, সাংবাদিক ও বিভিন্ন শ্রেণির পাঠক উল্লেখযোগ্য। পরোক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে সংশ্লিষ্ট আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা, প্রাসঙ্গিক গবেষণা প্রতিবেদন, গণগ্রন্থাগার অফিস থেকে সংগৃহীত তথ্য, ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য এবং গণমাধ্যম প্রকাশিত সংশ্লিষ্ট সংবাদ ও প্রবন্ধ পর্যালোচনা করা হয়েছে।

তথ্য সংগ্রহের জন্য দেশের বিভিন্ন পর্যায়ের ৭১টি সরকারি গণগ্রন্থাগারের মধ্যে থেকে ২০টি গণগ্রন্থাগার স্তরভিত্তিক দৈবচয়নের মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়েছে। এ ২০টি সরকারি গণগ্রন্থাগারের মধ্যে দৈবচয়নের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ের ১টি, বিভাগীয় পর্যায়ের ৭টি গণগ্রন্থাগার থেকে ৫টি, জেলা পর্যায়ের ৫৬টি গণগ্রন্থাগার থেকে ১২টি, উপজেলা পর্যায়ের ২টি গণগ্রন্থাগার থেকে ১টি এবং শাখা পর্যায়ের ৪টি গণগ্রন্থাগার থেকে ১টি নির্বাচন করা হয়েছে।

এই গবেষণায় গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর ও গণগ্রন্থাগারগুলোর সুশাসন বিশ্লেষণে বহুল ব্যবহৃত কয়েকটি সাধারণ নির্দেশক, যেমন সক্ষমতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, কার্যকারিতা ও দুর্নীতি প্রতিরোধ ব্যবহার করা হয়েছে।

গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের অধীনে দেশের বিভিন্ন পর্যায়ে পরিচালিত সরকারি গণগ্রন্থাগারের সেবা ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম এই গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ গবেষণাটি জুলাই ২০১৯ হতে নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে পরিচালনা করা হয়েছে।

গবেষণার ফলাফল

সেবার কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে সাম্প্রতিক পদক্ষেপ (২০১৫-২০২০)

গণগ্রন্থাগারের সেবার কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। একটি খসড়া জাতীয় গণগ্রন্থাগার নীতিমালা ২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে। অবকাঠামোগত উন্নয়নে তিনটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারি গণগ্রন্থাগারের ওয়েবপোর্টাল জাতীয় তথ্য বাতায়নে সংযুক্ত করা হয়েছে। অনলাইনে গণগ্রন্থাগারগুলোর ব্যবস্থাপনার জন্য কেন্দ্রীয় ডেটা সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে। পুস্তক ক্রয়ের জন্য পুস্তকের তালিকা অনলাইনে গ্রহণে সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে। সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগারে অনলাইনভিত্তিক গ্রন্থাগার সেবা পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়েছে। ব্রিটিশ কাউন্সিলের সহায়তায় বিভাগীয় ও জেলা গণগ্রন্থাগারে ইন্টারনেট সেবা প্রদানের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। 'দেশব্যাপী ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি' প্রকল্পের আওতায় ৭৬টি ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার গাড়ির মাধ্যমে দেশের ৬৪টি জেলার ৩১৮০টি এলাকায় বইপড়া কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। দক্ষতা বৃদ্ধিতে অধিদপ্তর ও গণগ্রন্থাগারের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদান করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গণগ্রন্থাগারের জন্য বিভিন্ন শ্রেণির মোট ৩৬৬টি নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।

নীতি ও বিধিমালাসংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা ও প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ

সরকারি গণগ্রন্থাগারের সেবা ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনায় পৃথক আইন নেই। মূলত বিভিন্ন নীতিমালা এবং নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে এর সব কার্যক্রম পরিচালিত হয়। গণগ্রন্থাগার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন নীতি ও বিধিমালায় কিছু সীমাবদ্ধতা লক্ষণীয়। এগুলোর মধ্যে প্রেষণে মহাপরিচালক ও পরিচালক নিয়োগের শর্তাবলি উল্লেখ না থাকা এবং পরিচালক (চিফ লাইব্রেরিয়ান) পদে প্রেষণে পদায়নে সুনির্দিষ্টভাবে চাকরির অভিজ্ঞতাসহ পদমর্যাদা উল্লেখ না থাকা; উন্নতমানের গ্রন্থ ক্রয়ে প্রচলিত টেন্ডার পদ্ধতির বাধ্যবাধকতা শিথিল করে বিশেষ পণ্য হিসেবে দেশি বইকে প্রচলিত টেন্ডার পদ্ধতির বাইরে রাখা; একজন সদস্যের শুধু তার নিজ এলাকার গণগ্রন্থাগার থেকে বই ধারে বাধ্যবাধকতা; সময়ের প্রেক্ষাপটে অপর্যাপ্ত জামানত; গণগ্রন্থাগারে ইন্টারনেট ব্যবহারে স্থায়ী সদস্যপদ বাধ্যতামূলক হওয়া, জামানতের টাকা জমা রাখার বাধ্যবাধকতা, সর্বোচ্চ ২০ মিনিট পর্যন্ত ইন্টারনেট ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা এবং অনুমোদনহীন, অশালীন ও আপত্তিকর ওয়েবসাইট ব্যবহারে পদক্ষেপ গ্রহণ সম্পর্কে উল্লেখ না থাকা উল্লেখযোগ্য। উল্লিখিত বিষয়গুলোর অনুপস্থিতির কারণে প্রেষণে নিয়োগ ও পদোন্নতিতে স্বেচ্ছাচারিতা ও স্বজনপ্রীতি, রাজনৈতিক প্রভাব এবং অপেশাদার প্রার্থী নিয়োগের ঝুঁকি ও সুযোগ সৃষ্টি হয়। তা ছাড়া ক্রয় কমিটি কর্তৃক সরাসরি পুস্তক ক্রয়ের ফলে চাহিদা অনুযায়ী গ্রন্থ ক্রয় না হওয়া, দরপত্র আহ্বানের পরিবর্তে সরাসরি পুস্তক ক্রয়ের সুযোগ থাকায় দুর্নীতির ঝুঁকি, প্রয়োজনীয় বই থেকে পাঠকের বঞ্চিত হওয়া, প্রয়োজনীয় কাজ সমাপ্ত করতে না পারায় ইন্টারনেট ব্যবহারে অনাগ্রহ এবং কার্যকর তদারকির ঘাটতির কারণে ইন্টারনেটের অপব্যবহারের ঝুঁকি ও সুযোগ সৃষ্টি হয়।

প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ

জনবলের ঘাটতি : গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের মোট ৮২২টি অনুমোদিত পদের বিপরীতে ৩৮৭ জন কর্মরত (সার্বিকভাবে ৫৩ শতাংশ পদ খালি)। এর মধ্যে প্রথম শ্রেণির পদগুলোর ৫৩ শতাংশ, দ্বিতীয় শ্রেণির পদগুলোর ২৮ শতাংশ, তৃতীয় শ্রেণির পদগুলোর ৫৫ শতাংশ এবং চতুর্থ শ্রেণির পদগুলোর ৫৪ শতাংশ শূন্য। এই গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত বিভাগীয় গ্রন্থাগারে গড়ে ২৩টি পদের বিপরীতে ৮ জন কর্মরত আছেন, জেলা পর্যায়ের গ্রন্থাগারে গড়ে ৯ জনের পদের বিপরীতে ৪ জন কর্মরত আছেন ও উপজেলা পর্যায়ের গ্রন্থাগারে গড়ে ৮ জনের পদের বিপরীতে ৩ জন কর্মরত আছেন। গবেষণাভুক্ত গণগ্রন্থাগারের খালি পদগুলোর মধ্যে পরিচালক (৪টি পদের সব কটি খালি), প্রিন্সিপাল লাইব্রেরিয়ান কাম উপপরিচালক (৮টি পদের মধ্যে ৩টি খালি), সিনিয়র লাইব্রেরিয়ান (১২টি পদের সব কটি খালি) ও সহকারী প্রোগ্রামার (৪টি পদের সব কটি খালি)। এর পাশাপাশি দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির বেশির ভাগ পদ খালি থাকার কারণে সার্বিকভাবে পাঠক সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না।

অবকাঠামোগত ঘাটতি : বেশির ভাগ সরকারি গণগ্রন্থাগারে অবকাঠামোগত দুর্বলতা, সীমাবদ্ধতা ও অপ্রতুলতা বিদ্যমান। দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের অভাবে অনেক গ্রন্থাগার ভবন জীর্ণ হয়ে পড়ার ফলে যেকোনো সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনার ঝুঁকি রয়েছে। তা ছাড়া সামান্য বৃষ্টিতে ছাদ চুঁইয়ে পানি পড়ে ভবনের ভেতরের দেয়ালগুলো স্যাঁতসেঁতে হয়ে পড়েছে। ফলে গ্রন্থাগারের সংগৃহীত বই নষ্ট হচ্ছে। তা ছাড়া রিডিং রুমে স্থান সংকট, শিশুদের জন্য আলাদা পাঠকক্ষের সংকট, জেলা পর্যায়ের গণগ্রন্থাগারে প্রয়োজনীয় অফিস কক্ষের ঘাটতি, স্টোর রুমের সংকট, পৃথক কম্পিউটার কক্ষের ঘাটতি, প্রয়োজনের তুলনায় মানসম্পন্ন শৌচাগারের অপর্যাপ্ততা, অগ্নিনির্বাপণের নিজস্ব কার্যকর ব্যবস্থা না থাকাসহ বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামোগত সমস্যা বিদ্যমান।

উল্লিখিত বিষয়গুলো ছাড়াও অধিকাংশ গ্রন্থাগার ভবনে প্রতিবন্ধী পাঠকের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা বা সুযোগ-সুবিধার ঘাটতি লক্ষ করা যায়, বিশেষ করে গ্রন্থাগারে প্রবেশের জন্য র‍্যাম্প, বিশেষ কক্ষ ও কর্নারের ঘাটতি। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত অন্তত দুটি গ্রন্থাগার ভবনের অবস্থান মূল শহরের অনেক বাইরে, যার কারণে নিরিবিলি পরিবেশে মাদকসেবী ও বখাটেদের আড্ডাস্থলে পরিণত হয়েছে গ্রন্থাগার চত্বর। আবার শহরের বাইরে অবস্থানের কারণে নারী পাঠকরা গ্রন্থাগারে যেতে আগ্রহী হন না।

লজিস্টিকস ঘাটতি : সব পর্যায়ের সরকারি গণগ্রন্থাগারের অফিসে প্রয়োজনীয় লজিস্টিক যেমন আসবাব, কম্পিউটার, প্রিন্টার, ফটোকপি মেশিন, বিভিন্ন ধরনের ফরম, বিভিন্ন ধরনের রেজিস্টার, বইয়ের তাক, ক্যাটালগ কার্ড, ক্যাটালগ বক্স, ক্যাটালগ প্রিন্টার ইত্যাদির ঘাটতি রয়েছে। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ২০টি গ্রন্থাগারের মধ্যে ১৭টিতেই এমন চিত্র দেখা যায়। এসব উপকরণের অভাবে গ্রন্থাগারের সব বই ক্যাটালগ করা সম্ভব হচ্ছে না এবং পাঠকসেবা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের অফিসগুলোতে দ্রুতগতির ইন্টারনেট সংযোগের অভাব রয়েছে।

এ ছাড়া জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের অফিসগুলো পরিদর্শনের জন্য বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের কোনো যানবাহনের ব্যবস্থা নেই।

বাজেট ঘাটতি : সার্বিকভাবে অধিদপ্তর ও এর নিয়ন্ত্রণাধীন গণগ্রন্থাগারে বাজেটের ঘাটতি রয়েছে। গণগ্রন্থাগারগুলো গড়ে চাহিদার প্রায় ৭০ শতাংশ বরাদ্দ পেয়ে থাকে, যা দিয়ে দাপ্তরিক ব্যয় নির্বাহ করা অত্যন্ত কঠিন। সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিভিন্ন জাতীয়, রাষ্ট্রীয় দিবস পালন করা ও প্রচারণার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে হয়, যদিও এর জন্য সর্বসাকল্যে ৫০-৬০ হাজার টাকার বরাদ্দ আসে। কিন্তু এই বাজেটে দুই-তিনটির বেশি অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয় না। মেরামত ও সংরক্ষণ খাতে বাজেট বরাদ্দের ঘাটতির কারণে কম্পিউটার, প্রিন্টার, ফটোকপি মেশিন ইত্যাদি একবার নষ্ট হলে সহজে মেরামত করা যায় না। অধিদপ্তরের সর্বশেষ চার অর্থবছরের বার্ষিক গড় অর্থ বরাদ্দ (পরিচালন) ২৭ কোটি ৩৭ লাখ টাকা এবং দেশি-বিদেশি পুস্তক ও সাময়িকী ক্রয়ে গড়ে মোট বাজেটের মাত্র ৭ শতাংশ বরাদ্দ দেওয়া করা হয়েছে, যা প্রয়োজনীয় ভালো মানের বই কেনার জন্য যথেষ্ট নয়।

গ্রন্থাগার সেবায় ডিজিটাইজেশনের ঘাটতি : ডিজিটাইজেশনের ক্ষেত্রে সরকারি গণগ্রন্থাগার এখন পর্যন্ত অনেক পিছিয়ে আছে। গণগ্রন্থাগারের সংগ্রহে কোনো অনলাইন ক্যাটালগ বা সংগ্রহের তালিকার কোনো ডেটাবেইস নেই এবং গণগ্রন্থাগারের সদস্য পাঠকদের কোনো কেন্দ্রীয় তথ্যভান্ডার নেই। গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর ২০১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে ৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে 'অনলাইনে গণগ্রন্থাগারের ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্প শুরু করে। কিন্তু প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করার পরও এখন পর্যন্ত এ ব্যবস্থা পুরোপুরি কাজ শুরু করতে পারেনি। শুধু সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগারে সীমিত পর্যায়ে পরীক্ষামূলক ডিজিটাল গ্রন্থাগার সেবা প্রদানের কাজ শুরু হয়েছে কিন্তু বাস্তবিক অর্থে প্রকল্পের উদ্দেশ্য পূরণে ঘাটতি রয়েছে।

গণগ্রন্থাগার সেবা ও ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও কার্যকারিতার ঘাটতি

নাগরিক সনদসংক্রান্ত : গবেষণাধীন ২০টি গণগ্রন্থাগারের মধ্যে ১৩টিতে নাগরিক সনদ থাকলেও কিছু ক্ষেত্রে নাগরিক সনদ সেবাগ্রহীতাদের দৃষ্টিগ্রাহ্য স্থানে রাখা হয়নি। কিছু ক্ষেত্রে তথ্য হালনাগাদ নয়, লেখা অস্পষ্ট ও ছোট। যে ১৩টি গণগ্রন্থাগারে নাগরিক সনদ আছে তার মধ্যে ৩টিতে নাগরিক সনদ সেবাগ্রহীতাদের কাছে দৃশ্যমান নয়। এ ছাড়া ৬টি গণগ্রন্থাগারে নাগরিক সনদের তথ্য হালনাগাদ নয় এবং প্রায় সব নাগরিক সনদে বিভিন সেবার ফি, সদস্য নিবন্ধনের ফি, সদস্য ফরমের দাম ও অন্যান্য সেবার ফির উল্লেখ নেই।

তথ্য বোর্ডসংক্রান্ত : গবেষণাভুক্ত ২০টি গণগ্রন্থাগারের মধ্যে ১৫টিতে তথ্য বোর্ড আছে। এর মধ্যে ৪টি গণগ্রন্থাগারের তথ্য বোর্ড সেবাগ্রহীতাদের দৃষ্টিগোচর স্থানে প্রদর্শিত নয়। ৬টি প্রতিষ্ঠানের তথ্য বোর্ডে বিভিন্ন সেবার ফির উল্লেখ নেই। এ ছাড়া ১৫টির মধ্যে ১৪টি তথ্য বোর্ডে তথ্য কর্মকর্তার নাম ও তার সঙ্গে যোগাযোগের জন্য কোনো ফোন কিংবা মোবাইল নম্বরের উল্লেখ নেই। সচিবালয়ের নির্দেশমালা-২০১৪ অনুযায়ী, গণগ্রন্থাগারের বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদানের ফির তালিকা গণগ্রন্থাগার

কার্যালয়ের বাইরে কোনো দৃষ্টিগোচর স্থানে জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রদর্শন করার বাধ্যবাধকতা থাকলেও গবেষণার আওতাভুক্ত অধিকাংশ গণগ্রন্থাগার অফিসগুলোর প্রাঙ্গণে বা কার্যালয়ের বাইরে এমন কোনো ফিসের তালিকা কোনো দৃষ্টিগোচর স্থানে প্রদর্শিত হতে দেখা যায়নি।

তথ্য অনুসন্ধান ডেস্ক সংক্রান্ত : গবেষণার আওতাধীন জাতীয়, বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের ২০টি গণগ্রন্থাগারের কোনোটিতেই পৃথক কোনো তথ্য অনুসন্ধান ডেস্ক পরিলক্ষিত হয়নি। গবেষণাভুক্ত সব গণগ্রন্থাগার অফিসে সেবাসংক্রান্ত কোনো নির্দিষ্ট তথ্য কোথায় পাওয়া যাবে সে-সম্পর্কে কোনো দিকনির্দেশনা চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়নি।

দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা ও আপিল কর্তৃপক্ষসংক্রান্ত : তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯, তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা ২০০৯, তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা ২০১০ এবং স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা অনুযায়ী, প্রতিটি সরকারি কার্যালয়ে তথ্য প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপিল কর্তৃপক্ষের নাম, পদবি, যোগাযোগের নম্বর ও মাধ্যম গণগ্রন্থাগার কার্যালয়ের বাইরে কোনো দৃষ্টিগোচর স্থানে জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রদর্শন করতে হবে। কিন্তু গবেষণাভুক্ত বেশির ভাগ গণগ্রন্থাগার অফিসে তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং আপিল কর্তৃপক্ষের নাম ও যোগাযোগের মাধ্যম প্রদর্শিত নেই।

তথ্য ব্যবস্থাপনায় ঘাটতি : ম্যানুয়াল ও অনলাইন উভয় তথ্য ব্যবস্থাপনা ও তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে ঘাটতি ও দুর্বলতা লক্ষণীয়। বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের গণগ্রন্থাগারে তথ্য ব্যবস্থাপনার কাজ এখনো ম্যানুয়ালি করা হচ্ছে। তথ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন তথ্য, যেমন অধিদপ্তর ও গণগ্রন্থাগারভিত্তিক (জাতীয়, বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের) জনবল, গ্রন্থাগার সদস্যের তালিকা, ধারকৃত বইয়ের সংখ্যা ও তালিকা, গ্রন্থাগারে সংগৃহীত বইয়ের তালিকা, সংগৃহীত পত্রিকা ও সাময়িকীর সংখ্যা ও তালিকা ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য কেন্দ্রীয় ও সমন্বিতভাবে নেই। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ২০টি গণগ্রন্থাগারের প্রায় সবগুলোতেই তথ্য প্রদানের জন্য পৃথক কোনো রেজিস্টার ব্যবহার করা হয় না।

ওয়েবসাইট সংক্রান্ত : গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর ও তার নিয়ন্ত্রাণাধীন গণগ্রন্থাগারে কোনো স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নীতিমালা নেই এবং তথ্য কমিশন প্রণীত স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকার আলোকে ওয়েবসাইটে তথ্য প্রকাশ করা হয় না। গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট তুলনামূলকভাবে তথ্যবহুল ও মোটামুটিভাবে হালনাগাদকৃত হলেও বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের গণগ্রন্থাগারগুলোর ওয়েবসাইটে অনেক তথ্যের ঘাটতি রয়েছে এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রদানকৃত তথ্য হালনাগাদ নয়। আবার তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপিল কর্তৃপক্ষের নাম, পদবি, যোগাযোগের ঠিকানা, যোগাযোগের মাধ্যম ও ফোন নম্বর ইত্যাদি তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক হলেও ওয়েবসাইটে এসব তথ্যের ঘাটতি বিদ্যমান।

কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কার্যক্রম তদারকি : পরিদর্শন নীতিমালা না থাকায় জেলা ও উপজেলা গণগ্রন্থাগারগুলো কার্যকর পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণে ঘাটতি রয়েছে। বিভাগীয় পরিচালক/উপপরিচালক কর্তৃক জেলা ও উপজেলা গণগ্রন্থাগার পরিদর্শনের ক্ষেত্রে মহাপরিচালকের অনুমতির বাধ্যবাধকতা থাকায় এবং অনেক সময় অনুমতি প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রতায় পরিদর্শন কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হয়। তা ছাড়া বিভাগীয় পরিচালক/উপপরিচালক কর্তৃক অধস্তন গণগ্রন্থাগারগুলো পরিদর্শন না করলেও এর জন্য জবাবদিহি না থাকা এবং এ ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে ঘাটতি বিদ্যমান। এ ছাড়া পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের ঘাটতির কারণে গণগ্রন্থাগারে নিয়মিত স্টক টেকিং (সংগৃহীত পাঠসামগ্রী ও অন্যান্য সামগ্রীর হিসাব-নিকাশ, বিশেষ করে হারানো, নষ্ট হয়ে যাওয়া ও ইস্যুকৃত বই ফেরত না পাওয়া ইত্যাদি) কার্যক্রম ব্যাহত হয়। বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উপস্থিতি ও কার্যক্রম তদারকির ঘাটতির কারণে মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রায়ই দেরি করে অফিসে আসা এবং অনিয়ম ও দুর্নীতিতে জড়িত হওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। তা ছাড়া অনেক ক্ষেত্রে অধস্তন কর্মচারীদের দায়িত্ব অবহেলা (অনুমতি ব্যতীত কর্মস্থলে দীর্ঘদিন অনুপস্থিত, পাঠকসেবা প্রদানে অবহেলা, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অমান্য ইত্যাদি) সংক্রান্ত বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করলেও দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয় না, ফলে সার্বিক তদারকি কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হয়।

অভিযোগ ব্যবস্থাপনা ও গণশুনানি : অনলাইন ও প্রচলিত পদ্ধতিতে (লিখিত ও সরাসরি) অভিযোগ গ্রহণ বা দাখিলের ব্যবস্থা থাকলেও তা কার্যকর নয়। অনলাইনে অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সম্পর্কে প্রচারণা না থাকায় অধিকাংশ সেবাগ্রহীতা অভিযোগ করেন না। গবেষণাভুক্ত অধিকাংশ গ্রন্থাগারে (২০টির মধ্যে ১৮টি) অভিযোগ বাক্স ছিল না। যে দুটি কার্যালয়ে অভিযোগ বাক্স ছিল, সেখানে কোনো অভিযোগ জমা হয়নি। প্রতিটি গণগ্রন্থাগারে প্রতি মাসে একটি নির্দিষ্ট দিনে গণশুনানি হওয়ার কথা থাকলেও তা নিয়মিত হয় না।

আর্থিক নিরীক্ষাসংক্রান্ত : মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় (সিএজি) থেকে অধিদপ্তরের আর্থিক নিরীক্ষা নিয়মিতভাবেই সম্পাদন করা হলেও বিভাগীয় ও জেলা গণগ্রন্থাগারে আর্থিক নিরীক্ষা নিয়মিত হয় না এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রদানে বিলম্ব হয়। তা ছাড়া নিরীক্ষা প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে ঘাটতি বিদ্যমান। গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সিএজি কর্তৃক সম্পন্ন নিরীক্ষা কার্যক্রমে মোট ৭টি বিষয়ে নিরীক্ষা আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে, যেখানে মোট অর্থের পরিমাণ প্রায় ২৪ কোটি ৬৮ লাখ টাকা। নিরীক্ষা আপত্তির ধরনের মধ্যে রয়েছে এক খাতের অর্থ অন্য খাতে ব্যয়, কর্মকর্তাদের ভ্রমণ বিলসংক্রান্ত, উপপরিচালকের সিলেকশন গ্রেড প্রাপ্তি, খরচের হিসাবে তারতম্য ইত্যাদি।

প্রকল্প বাস্তবায়নে ধীরগতি : গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের অধীন পরিচালিত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নে ধীরগতি লক্ষণীয়। 'ছয়টি জেলা পাবলিক লাইব্রেরির উন্নয়ন (সংশোধিত) প্রকল্প' চতুর্থবারের মতো মেয়াদ বৃদ্ধি করেও ২০১৯ সালের জুন মাসের মধ্যে প্রকল্পটি সার্বিকভাবে সমাপ্ত

করা সম্ভব হয়নি। 'অনলাইনে গণগ্রন্থাগারের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন' প্রকল্প ২০১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে শুরু হয়ে ২০১৯ সালের নভেম্বর মাসের মধ্যে শেষ হওয়ার কথা, কিন্তু এ প্রকল্পের মেয়াদ একবার বাড়ানোর পর ২০২০ সালের জুলাই মাস শেষেও কাজ সমাপ্ত হয়নি। 'চট্টগ্রাম মুসলিম ইনস্টিটিউট সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্স স্থাপন' প্রকল্প ২০১৮ সালের জুন মাসে শুরু হয়ে ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসে শেষ হওয়ার কথা। দুই বছরে প্রকল্পের অগ্রগতি হয়েছে মাত্র ২৪ শতাংশ, যদিও এই প্রকল্পের মেয়াদ ইতিমধ্যেই একবার বাড়িয়ে ২০২১ সালের জুন পর্যন্ত করা হয়েছে। কাজের অগ্রগতি ও বাজেট ব্যয়ের চিত্র থেকে এটা স্পষ্ট বোঝা যায়, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এই প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করা মোটেও সম্ভব হবে না।

গণগ্রন্থাগারের পাঠকসেবায় কার্যকারিতা : মানহীন পাঠসামগ্রী, দক্ষতাসম্পন্ন ও প্রয়োজনীয় জনবলের সীমাবদ্ধতা, পাঠকের চাহিদা অনুযায়ী বই, সাময়িকী ও অন্যান্য পাঠ্যসামগ্রীর জোগানে সীমাবদ্ধতা, গণগ্রন্থাগারে সংগৃহীত বইয়ের ব্যবস্থাপনায়, বিশেষ করে সংযোজন, ক্যাটালগিং ও ক্লাসিফিকেশন (সূচিকরণ ও শ্রেণিকরণ), বিষয়ভিত্তিক গ্রন্থ তালিকা প্রণয়ন, অধিক পুরোনো সংবাদপত্র ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি কার্যক্রমে ঘাটতি ও সীমাবদ্ধতার কারণে গণগ্রন্থাগারে সার্বিকভাবে পাঠকসেবা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। তা ছাড়া গণগ্রন্থাগারে বসার সুষম ব্যবস্থা না থাকায় ও স্থানস্বল্পতায় চাকরিপ্রত্যাশী পাঠকের চাপে অন্যান্য পাঠকেরা গ্রন্থাগারসেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এ ছাড়া তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর ডিজিটাল সেবা ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, দক্ষতাসম্পন্ন প্রয়োজনীয় জনবল (গ্রন্থাগারিক, ক্যাটালগার, রিডিং হল সহকারী ইত্যাদি) এবং গণগ্রন্থাগারের কর্মীদের একাংশের সেবা প্রাদানে আন্তরিকতার অভাবে কার্যকর পাঠকসেবা কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। গণগ্রন্থাগারের সংগৃহীত অর্ধেকের বেশি বই মানহীন বলে পাঠকদের অভিযোগ রয়েছে।

অনিয়ম ও দুর্নীতি

জনবল নিয়োগে অনিয়ম ও দুর্নীতি : সরকারের অন্যান্য বিভাগ বা দপ্তরের মতো গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের বিভিন্ন পদে জনবল নিয়োগে, বিশেষ করে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির বিভিন্ন পদে সরাসরি নিয়োগ, আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে নিয়োগ, প্রেষণে অধিদপ্তরে কর্মকর্তার সংযুক্তি এবং প্রকল্প পরিচালক নিয়োগে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। অধিদপ্তরের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে সরাসরি আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ পাওয়া যায়। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী তৃতীয় শ্রেণির পদের জন্য ক্ষেত্রবিশেষ ২-৩ লাখ টাকা পর্যন্ত নেওয়ার নজির আছে। আর চতুর্থ শ্রেণির পদের ক্ষেত্রে এ অবৈধ লেনদেনের পরিমাণ ১-২ লাখ টাকা পর্যন্ত। ২০১৯-২০ অর্থবছরে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন বিভাগ ও জেলা পর্যায়ের চতুর্থ শ্রেণির নবসৃষ্ট দুটি পদে (ইলেকট্রিশিয়ান ও অফিস সহায়ক) মোট ৩৩ জনকে আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে নিয়োগ প্রদান করা হয়। এই নিয়োগের ক্ষেত্রেও অধিদপ্তরের এক শ্রেণির কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আর্থিক সুবিধা আদায়ের অভিযোগ রয়েছে।

পদায়ন ও বদলিতে অনিয়ম : নিয়মবহির্ভূতভাবে অর্থপ্রাপ্তির সুযোগ রয়েছে এমন ধরনের কয়েকটি পদে পদায়ন ও বদলিতে অনিয়ম লক্ষণীয়। সাধারণ কর্মকর্তাদের পদায়ন, বদলি ও পদোন্নতির

ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের নির্দিষ্ট কিছু পদে এবং সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগারের বিভিন্ন শাখায় কিছু ব্যক্তির যোগসাজশের মাধ্যমে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন এবং প্রকল্প পরিচালক হিসেবে 'সুনজরে থাকা' ব্যক্তিকে দায়িত্ব দেওয়া ও সুনজরে না থাকা ব্যক্তিকে বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ের গণগ্রন্থাগারে বদলি করার অভিযোগ রয়েছে। অধিদপ্তরে অনেক কর্মকর্তা ২০ বছরের অধিক অধিদপ্তরে সংযুক্তি হিসেবে আছেন। এ ছাড়া অধিদপ্তরে কিছু কর্মকর্তা ও কর্মচারীর একটা শক্তিশালী সিন্ডিকেট থাকার অভিযোগ পাওয়া যায়; যারা গ্রুপিংয়ের মাধ্যমে অধিদপ্তরে থাকে এবং সব ধরনের ক্রয় থেকে শুরু করে প্রকল্প বাস্তবায়নে নিজেদের প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে সব ধরনের দুর্নীতিতে জড়িত থাকে। এই গ্রুপের কোনো সদস্যকে ঢাকার বাইরে বদলি করলে অল্প কিছু দিনের মধ্যেই প্রভাব খাটিয়ে আবার অধিদপ্তরে সংযুক্তি পদায়ন করিয়ে নেয়।

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণে অনিয়ম : গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণে অনিয়মের যেসব অভিযোগ পাওয়া যায়– তার মধ্যে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা না করা, প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচনে পক্ষপাত উল্লেখযোগ্য। স্থানীয় ও বিদেশে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিবেচনা ও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের 'সুনজরের' ওপর ভিত্তি করে কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচনের অভিযোগ রয়েছে। বিদেশে প্রশিক্ষণ, শিক্ষা সফর, ভ্রমণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে অধিদপ্তরে প্রেষণে নিয়োগপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে আধিক্য লক্ষ করা যায়। এ ছাড়া প্রশিক্ষণে বরাদ্দকৃত অর্থ আত্মসাতের জন্য একই সময়ে, একই অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়ে একই স্থানে একাধিক প্রশিক্ষণ আয়োজনের অভিযোগ রয়েছে।

ক্রয়-প্রক্রিয়ায় অনিয়ম : গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের বিভিন্ন ধরনের ক্রয়-প্রক্রিয়ায় অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। চাহিদা নিরূপণের ক্ষেত্রে উপযোগিতা বিবেচনা না করে ক্রয় পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করার অভিযোগ রয়েছে। স্থানীয় পাঠকের চাহিদা বিবেচনা না করে অধিদপ্তর তার নিজের ইচ্ছামতো বই-পুস্তক ক্রয় করে, যার প্রধান কারণ কমিশন-বাণিজ্য। এই ক্রয়-প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট সিন্ডিকেটের সদস্যরা প্রকাশক ও পরিবেশকদের কাছ থেকে ১০ থেকে ১২ শতাংশ পর্যন্ত কমিশন পেয়ে থাকে। সেই হিসাবে বলা যায়, ২০১৯-২০ অর্থবছরে বই-সাময়িকী ক্রয় খাতে প্রায় ২০ লাখ থেকে ২৩ লাখ টাকার দুর্নীতি হয়েছে (বই-সাময়িকী ক্রয় খাতে বাজেট বরাদ্দ ২ কোটি ৩১ লাখ টাকা)। দরপত্র মূল্যায়ন ও ঠিকাদার নির্বাচন পর্যায়ে সমঝোতামূলক দুর্নীতিসহ অধিদপ্তরের একশ্রেণির কর্মকর্তা ও তাদের পরিবারের একাংশের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ রয়েছে। আবার বাস্তবায়ন পর্যায়ে তদারকির ঘাটতির কারণে ক্ষেত্রবিশেষে কার্যাদেশ অনুযায়ী বই সরবরাহ না করা এবং নিম্নমানের বই সরবরাহের অভিযোগ রয়েছে। মূল্যায়ন ও নিরীক্ষার (বিল জমা, বিল প্রদান) ক্ষেত্রে কার্যাদেশে উল্লিখিত সম্পূর্ণ কাজ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক যাচাই না করা, ঠিকাদারের বিল সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক তৈরি করে দেওয়া, বিল পাওয়ার ক্ষেত্রে হিসাব বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ঘুষ প্রদান এবং ঠিকাদার ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার যোগসাজশে

কাজ না করে ভুয়া বিল-ভাউচারের মাধ্যমে টাকা উত্তোলনের অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া স্থানীয় পর্যায়ের যেকোনো ক্রয়-প্রক্রিয়ার বিল উত্তোলনের জন্য সংশ্লিষ্ট হিসাবরক্ষণ কার্যালয়ে ৩-৫ শতাংশ হারে কমিশন দিতে হয়, না দিলে তারা বিল পাস করতে বিলম্ব করে এবং অনেক সময় হয়রানি করা হয়। অনেক সময় ট্রাভেল ও অ্যালাউন্স বিল উত্তোলনের সময়ও এই কমিশন দিতে বাধ্য করা হয়।

প্রকল্প বাস্তবায়নে অনিয়ম ও দুর্নীতি : গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সাধারণ অভিযোগগুলোর মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়নে ধীরগতি ও ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়া, নিম্নমানের কাজ করা, প্রকল্পগুলোর সুষ্ঠু পরিবীক্ষণ ও তদারকির ঘাটতি, পরামর্শক ও প্রকল্প পরিচালক নিয়োগে অনিয়ম, আর্থিক অনিয়মসহ সরকারের বিভিন্ন ক্রয়নীতির ব্যত্যয় উল্লেখযোগ্য। উদাহরণস্বরূপ, একটি প্রকল্প বাস্তবায়নে কর্তৃপক্ষের অবহেলা ও ধীরগতির কারণে অনুমোদিত মেয়াদ অতিক্রম করে দুই বছর পার হলেও কাজ শেষ হয়নি। এ ক্ষেত্রে তিনবার মেয়াদ বৃদ্ধির কারণে প্রকল্পের ব্যয় প্রায় ৩ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায়। এ ছাড়া গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের সদ্য সমাপ্ত ও চলমান দু-একটি প্রকল্পে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগে স্বজনপ্রীতি ও অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। প্রকল্প গ্রহণের সময় অসম্ভব ব্যয় নির্ধারণ, অভিজ্ঞতা গ্রহণের নামে অপ্রয়োজনীয় বিদেশ ভ্রমণের বরাদ্দ রাখাসহ অন্যান্য খাতে অসম্ভব বরাদ্দ রেখে প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, 'গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের বহুতল ভবন নির্মাণ প্রকল্প' প্রস্তাবনা অনুযায়ী বহুতল ভবন নির্মাণে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে বিদেশ সফরে যাবেন ৩০ জন কর্মকর্তা, যার জন্য মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ৩ কোটি টাকা। এ ছাড়া ১০তলা ভবন নির্মাণে বিদেশি পরামর্শক নিয়োগে বিবিধ ব্যয়সহ ২৮ কোটি ২২ লাখ টাকার প্রস্তাব করা হয়েছে।

শুদ্ধাচার বাস্তবায়নে কর্মপরিকল্পনা ও উদ্যোগের ঘাটতি : গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অনেকেই শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে গুরুত্ব দেন না, যে কারণে শুদ্ধাচার কৌশল কাগজে-কলমে ও একটি নমুনা প্রতিবেদনে সীমাবদ্ধ। ২০১৮-১৯ সালে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, প্রতিবেদনে গৃহীত পদক্ষেপ হিসেবে উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও ওয়েবসাইটে শুদ্ধাচার সেবাবক্স হালনাগাদ করা হয়নি, ওয়েবসাইটে তথ্য অধিকার আইকন হালনাগাদ করা হয়নি। এ ছাড়া তথ্য বাতায়নে সংযোজিত সংশ্লিষ্ট তথ্য হালনাগাদ না থাকা, দাপ্তরিক সব কাজে ইউনিকোড ব্যবহার না করা, সোশ্যাল মিডিয়ার একটি লিংক ওয়েবসাইটে দেওয়া থাকলেও তা কার্যকর না থাকার বিষয়গুলো লক্ষ করা যায়।

দায়িত্ব পালনে অবহেলা : সরকারি গণগ্রন্থাগারে পাঠকসেবা প্রদান সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন না করার অভিযোগ পাওয়া যায়। অনেক ক্ষেত্রে বই বা সাময়িকীসহ অন্যান্য পাঠসামগ্রী খুঁজে না পেলে দায়িত্বরত কর্মচারীরা তা খুঁজতে সাহায্য করেন না। এ ছাড়া কর্মকর্তাদের ইচ্ছা করে দেরিতে অফিসে আসার অভিযোগ রয়েছে।

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

গণগ্রন্থাগারের আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে কার্যকর উদ্যোগ ও পরিকল্পনার ঘাটতি রয়েছে। তা ছাড়া সরকারের শিক্ষানীতিসহ অন্যান্য জাতীয় নীতি ও পরিকল্পনায় গণগ্রন্থাগারকে গুরুত্ব দিয়ে কৌশল নির্ধারণ ও কার্যক্রম গ্রহণ করা হলেও তা বাস্তবায়নে কার্যকর উদ্যোগের ঘাটতি লক্ষণীয়। গণগ্রন্থাগারগুলোকে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পাঠকপর্যায়ে কার্যকর সেবা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে যুগোপযোগী করে তোলার উদ্যোগে ঘাটতি এবং নিয়োগ, পদায়ন, বদলি, প্রশিক্ষণ, ক্রয়-প্রক্রিয়া ও প্রকল্প বাস্তবায়নে অনিয়ম-দুর্নীতির প্রবণতা লক্ষণীয়। এ ছাড়া ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ও কর্মকর্তাদের স্বচ্ছতা, কার্যকর তদারকি ও জবাবদিহির ঘাটতিতে কর্মীদের একাংশ অনিয়ম-দুর্নীতিতে জড়িত হওয়ার প্রবণতা এবং সার্বিকভাবে সুশাসনের ঘাটতির কারণে সাধারণ জনগণের কাছে সহজে ও সুলভে শিক্ষা ও তথ্যসেবা পৌঁছে দেওয়াার মতো সম্ভাবনাময় একটি প্রতিষ্ঠান যথাযথভাবে বিকশিত হতে পারছে না, কার্যকর পাঠকসেবা কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

সুপারিশ

এই গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে টিআইবি গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর ও তার নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি গণগ্রন্থাগারকে অধিকতর কার্যকর ও সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিচের সুপারিশ প্রস্তাব করছে।

আইন ও নীতিসংক্রান্ত

১. জাতীয় গ্রন্থাগার নীতি ২০০১-এর আলোকে গণগ্রন্থাগারের জন্য একটি পৃথক আইন প্রণয়ন করতে হবে।

২. নীতিমালাগুলো সময়োপযোগী সংস্কার করে বাস্তবায়ন করতে হবে এবং সব নীতিমালার সমন্বয়ে সরকারি গণগ্রন্থাগারের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ নীতমালা প্রণয়ন করতে হবে।

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতাসংক্রান্ত

৩. শূন্যপদগুলোয় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জনবল নিয়োগ করতে হবে। কর্মীদের যথাযথ প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নিতে হবে এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে সব নিয়োগ ও প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন নিশ্চিত করতে হবে।

৪. যথাযথ চাহিদা নিরূপণ সাপেক্ষে আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধি, অবকাঠামো ও লজিস্টিকস এবং নিজস্ব আধুনিক অগ্নিনির্বাপণব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৫. গণগ্রন্থাগারগুলোকে যুগোপযোগী করে ডিজিটাল সেবার আওতাভুক্ত করতে হবে। সব গণগ্রন্থাগারে ওয়াই-ফাই ইন্টারনেটের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬. পাঠকের চাহিদা সংগ্রহ করার কাঠামো তৈরি করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী প্রয়োজনীয়

পাঠসামগ্রী ক্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। ক্রয়-প্রক্রিয়া স্বচ্ছ করার জন্য সরকারের ক্রয় আইন ও নীতিমালার যথাযথ অনুসরণ করতে হবে।

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি-সংক্রান্ত

৭. স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নীতিমালা প্রণয়ন ও তদনুযায়ী তথ্যের উন্মুক্ততা নিশ্চিত করতে হবে এবং তথ্য কর্মকর্তা ও আপিল কর্তৃপক্ষের নাম, ঠিকানা ও যোগাযোগ নম্বর প্রদর্শন করতে হবে।

৮. কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কার্যক্রম কঠোর তদারকির আওতায় আনতে হবে, আকস্মিক পরিদর্শন ও ডিজিটাল উপস্থিতি ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং সব পর্যায়ে নিরীক্ষা কার্যক্রম যথাযথ ভাবে নিয়মিত সম্পাদন নিশ্চিত করতে হবে।

৯. অভিযোগ দায়েরসংক্রান্ত প্রচারণা ও নিয়মিত গণশুনানির ব্যবস্থা করতে হবে এবং একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর সেবার মান মূল্যায়নের ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।

দুর্নীতি প্রতিরোধসংক্রান্ত

১০. অনিয়ম ও দুর্নীতির ঘটনা আমলে নিয়ে বিভাগীয় তদন্ত সাপেক্ষে দ্রুত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

তৃতীয় অধ্যায়
ব্যক্তিমালিকানাধীন খাত

তৈরি পোশাক খাতে করোনাভাইরাস উদ্ভূত সংকট সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও করণীয়*

নাজমুল হুদা মিনা ও মোহাম্মদ নূরে আলম

গবেষণার প্রেক্ষাপট

ডিসেম্বর ২০১৯ হতে চীনের উহান থেকে করোনাভাইরাস পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ার ফলে বৈশ্বিক 'সাপ্লাই চেইন' (উৎপাদন, বিপণন ও সরবরাহ শৃঙ্খল) ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়, যার মধ্যে তৈরি পোশাক খাত অন্যতম। বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতের প্রায় ৫০ শতাংশ কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি আমদানিতে চীনের ওপর নির্ভরশীলতার কারণে জানুয়ারি ২০২০ থেকে এ খাত চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন দেশে মহামারি ছড়িয়ে পড়ার কারণে লকডাউন ঘোষণা করে। ফলে ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল ২০২০ পর্যন্ত ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলো ৩ দশমিক ১৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার পরিমাণ চলমান ক্রয়াদেশ স্থগিত বা বাতিল করে। এপ্রিল মাসে পোশাক রপ্তানি ৭৭ দশমিক ৬৭ শতাংশ কমে যায়; যা জুন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এ সময়কালে ৪১৮টি কারখানা সাময়িক বা স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যায় এবং প্রায় সংশ্লিষ্ট কারখানার শ্রমিকরা কাজ হারান। দেশের তৈরি পোশাক খাতের ওপর রপ্তানি বাণিজ্যের অধিক নির্ভরশীলতা (প্রায় ৮৪ শতাংশ) এবং মহামারির শুরুতে বৈশ্বিক বাণিজ্যের নজিরবিহীন এই সংকোচনের কারণে বাংলাদেশ সবচেয়ে ঝুঁকিতে অবস্থানকারী দেশ হিসেবে চিহ্নিত হয়।

জানুয়ারি-জুন ২০২০ পর্যন্ত করোনা মহামারির কারণে বিশ্ব বাণিজ্যে অচলাবস্থা বিরাজ করায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ঋণাত্মক (-২৪ দশমিক ৬৮ শতাংশ) হয়। কার্যাদেশ বাতিল, মালিকপক্ষের আর্থিক সক্ষমতা না থাকার যুক্তি এবং কারখানা বন্ধের কারণে শ্রমিকদের মজুরি প্রদানে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়। তা ছাড়া সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটি উপেক্ষা করে কারখানা মালিকপক্ষ কর্তৃক অপরিকল্পিতভাবে কারখানা খুলে দেওয়ায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চল

চিত্র ১ : ২০১৫-১৬ থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানির পরিমাণ (মিলিয়ন মার্কিন ডলারে)

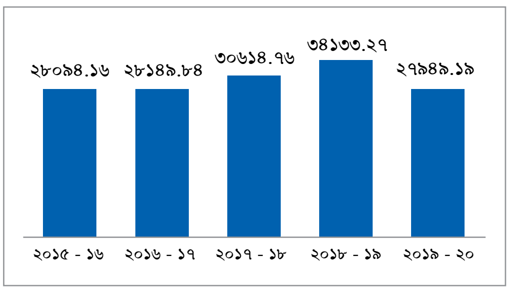

* ২০২০ সালের ১৭ ডিসেম্বর ঢাকায় ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশিত গবেষণার সারসংক্ষেপ।

থেকে কারখানা-অধ্যুষিত এলাকায় শ্রমিকরা চলে আসেন। পরে সমালোচনার মুখে একই দিনে কারখানা বন্ধের ঘোষণা দেওয়ায় কারখানার শ্রমিকরা পুনরায় নিজ এলাকায় ফিরে যান। ফলে সমগ্র দেশে ব্যাপকভাবে করোনাভাইরাস ছড়ানোর ঝুঁকি সৃষ্টি হয়।

বাংলাদেশের পোশাক খাতের চলমান এসব ঝুঁকি নিরসনে সরকার, ক্রেতা প্রতিষ্ঠান ও আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা মহামারির সময়কালে বিভিন্ন প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করে এবং সরকার ও মালিকপক্ষ (বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ) শ্রমিক অধিকার ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। তবে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম এবং গবেষণা প্রতিবেদনে চুক্তিভঙ্গ করে ক্রেতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কার্যাদেশ বাতিল, চলমান মহামারিকালে শ্রমিকদের মজুরি ও ভাতা প্রদান না করা, লে-অফ ঘোষণা, শ্রমিক ছাঁটাই, স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত না করা ইত্যাদি বিভিন্ন অভিযোগ পাওয়া যায়। বর্তমানে প্রাথমিক দুর্যোগ কাটিয়ে উঠে তৈরি পোশাক খাত ঘুরে দাঁড়ানোর অবস্থায় সমগ্র বিশ্বে করোনা সংকটের দ্বিতীয় পর্যায়ের সংক্রমণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ অবস্থায় অধিকহারে উপরিউক্ত ঝুঁকির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

টিআইবি রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পর থেকে তৈরি পোশাক খাতে নিয়মিতভাবে গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট নির্দেশকের ভিত্তিতে সুশাসনের বিভিন্ন ঘাটতি চিহ্নিত করা এবং গুরুত্বপূর্ণ অংশীজনের সঙ্গে অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরই ধারবাহিকতায় করোনা সংকটের সময়ে এ খাতে কী ধরনের সুশাসনের চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান ছিল বা এখনো অব্যাহত রয়েছে ও কীভাবে এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে, তা নিরূপণ করা এই খাতে সংকট মোকাবিলায় একটি কার্যকর কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য অত্যন্ত জরুরি।

গবেষণার উদ্দেশ্য

গবেষণার মুখ্য উদ্দেশ্য তৈরি পোশাক খাতে করোনাভাইরাস উদ্ভূত সংকট মোকাবিলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও করণীয় চিহ্নিত করা। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো :

- বিভিন্ন অংশীজন (সরকার, মালিকপক্ষ ও ক্রেতা প্রতিষ্ঠান) কর্তৃক করোনা সৃষ্ট সংকট মোকাবিলায় গৃহীত পদক্ষেপে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা; এবং
- করোনা উদ্ভূত বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সংকট মোকাবিলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণে অংশীজনদের করণীয় চিহ্নিত করা।

গবেষণাপদ্ধতি

এটি একটি গুণগত গবেষণা, তবে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার পদ্ধতি প্রয়োগ করে গবেষণার প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে শ্রম মন্ত্রণালয়, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডিআইএফই), শ্রম অধিদপ্তর, বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ কর্মকর্তা, কারখানা মালিক ও কর্মকর্তা, ট্রেড ইউনিয়ন বা ফেডারেশনের নেতা, শ্রমিক এবং সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। পরোক্ষ তথ্যের জন্য বিভিন্ন ধরনের নথি পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইন, নীতি, দাপ্তরিক নথি,

সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট, গবেষণা প্রতিবেদন ও প্রবন্ধ, সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদন ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়। গবেষণাকর্মটি মে-নভেম্বর ২০২০ সময়ে সম্পন্ন করা হয়েছে।

বিশ্লেষণ কাঠামো

গবেষণার প্রাপ্ত তথ্য সুশাসনের ছয়টি (৬টি) সুনির্দিষ্ট নির্দেশক ও সংশ্লিষ্ট উপনির্দেশকের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত নির্দেশক হলো– আইনি সীমাবদ্ধতা ও প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ, সাড়া প্রদান, অংশগ্রহণ ও সমন্বয়, স্বচ্ছতা, শ্রমিক অধিকার ও নিরাপত্তা এবং জবাবদিহি।

সারণি ১ : গবেষণায় ব্যবহৃত সুশাসনের নির্দেশক ও উপনির্দেশক

নির্দেশক	উপনির্দেশক
আইনি সীমাবদ্ধতা ও প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ	প্রাসঙ্গিক আইন ও তার অনুসরণ
সাড়া প্রদান	পরিকল্পনা ও কৌশল প্রণয়ন, সংক্রমণরোধে পদক্ষেপ, প্রশিক্ষণ, প্রণোদনা ও আর্থিক সহায়তা
অংশগ্রহণ ও সমন্বয়	করোনা সংকট মোকাবিলায় সরকার, মালিকপক্ষ ও শ্রমিক সংগঠনের অংশগ্রহণ এবং সমন্বয়
স্বচ্ছতা	তথ্যের উন্মুক্ততা, স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ও প্রচার
শ্রমিক অধিকার ও নিরাপত্তা	মজুরি ও ভাতা, চাকরির নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা, পরীক্ষা, চিকিৎসাসেবা, মাতৃত্বকালীন সুবিধা ও শ্রমিক সংগঠনের ভূমিকা
জবাবদিহি	কারখানা পরিদর্শন, অভিযোগ ব্যবস্থাপনা, মালিকপক্ষ ও ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহি নিশ্চিতে ব্যবস্থা

গবেষণার ফলাফল

আইনি সীমাবদ্ধতা ও প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ

শ্রম আইন, ২০০৬ : ধারা ১৬(১)– এ লে-অফ ঘোষণা করা কারখানায় এক বছরের কম কাজ করা শ্রমিকদের কোনো ক্ষতিপূরণ প্রদান না করা এবং ৪৫ দিনের বেশি লে-অফ হলে ধারা ২০-এর অধীন ছাঁটাই করার বিধান থাকায় মালিকপক্ষ একতরফা সুবিধা ভোগ করে। করোনা মহামারিকালে এর ফলে মালিকপক্ষের ব্যবসায়িক স্বার্থ নিশ্চিতে কারখানা লে-অফ করার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন শ্রমিকরা। উল্লিখিত দুটি ধারার কারণে করোনা সংকটকালেও এক বছরের কম সময় কাজ করা প্রায় ২০ শতাংশ শ্রমিক কোনো ধরনের ক্ষতিপূরণ পাননি। তা ছাড়া ধারা ২০– এর ২(ক) অনুযায়ী, শ্রমিক ছাঁটাইয়ের কারণ উল্লেখ করে এক মাসের অগ্রিম নোটিশ দিতে হবে। কোনো কারণে নোটিশ দিতে ব্যর্থ হলে এক মাসের বেতন দেওয়ার বিধান থাকলেও করোনা মহামারিকালে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ ধারা লঙ্ঘন করে শ্রমিকরা ছাঁটাইয়ের শিকার হয়েছেন।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২ : সরকারের নির্বাহী আদেশে দেশব্যাপী সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হলেও কারখানার ক্ষেত্রে তা কীভাবে প্রতিপালিত হবে স্পষ্ট করা হয়নি। ফলে করোনা উদ্ভূত

সংকটে মালিক কর্তৃক একতরফাভাবে কারখানা লে-অফ ঘোষণা এবং শ্রমিকদের অধিকার উপেক্ষা করা হয়। উল্লেখ্য, লকডাউন ঘোষণার ক্ষেত্রে ভারতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৫ এবং পাকিস্তানে মহামারি রোগসংক্রান্ত আইন, ২০১৪-এর প্রয়োগ করা হয়েছে। ওই আইন প্রয়োগ করে দেশ দুটির সরকার কারখানা লে-অফ করতে পারবে না এমন স্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করে।

সংক্রমণ রোগ প্রতিরোধ আইন, ২০১৮ : স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ১৬ এপ্রিল সংক্রমণ রোগ প্রতিরোধ আইন, ২০১৮-এর ধারা ১১(১) ক্ষমতাবলে জনগণকে বাইরে বের হতে নিষেধ করার জন্য প্রজ্ঞাপন জারি করে। তবে কারখানার কর্মরত শ্রমিকদের জন্য এ ক্ষেত্রে কী করণীয়, সে-সম্পর্কে শ্রম মন্ত্রণালয় সম্পূরক কোনো নির্দেশনা জারি করেনি। ফলে মালিক পক্ষ অপরিকল্পিতভাবে কারখানা খুলে দিয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শ্রমিকদের পোশাক কারখানা-অধ্যুষিত এলাকায় নিয়ে আসা এবং সমালোচনার কারণে আবার ফিরিয়ে দেওয়ার ফলে সংক্রমণ বৃদ্ধির ঝুঁকি সৃষ্টি হলেও মন্ত্রণালয় কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

সাড়া প্রদান

পরিকল্পনা ও কৌশল প্রণয়ন

সরকার ও মালিকপক্ষ মার্চ ২০২০ পর্যন্ত করোনা সংকট মোকাবিলায় তৈরি পোশাক খাতে কোনো পরিকল্পনা ও কৌশল প্রণয়ন করেনি। সরকার করোনার পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবে শ্রমিকদের উপেক্ষা করে মূলত মালিকপক্ষের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করে। তা ছাড়া এ খাতের নেতা কর্তৃক করোনা মহামারির কারণে চীন থেকে তৈরি পোশাক ব্যবসার একটি বড় অংশ বাংলাদেশে চলে আসবে এমন আত্মতুষ্টিতে ভোগার উদাহরণ রয়েছে। বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ সরকারের কাছে সম্ভাব্য করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় ফেব্রুয়ারি মাসে তিনটি দাবি উত্থাপন করে–(১) ব্যয় সংকোচনের জন্য আপৎকালীন তহবিল গঠন, (২) 'ব্যাক টু ব্যাক' এলসি নীতিমালায় সংশোধন, এবং (৩) ঋণের নিশ্চয়তাসহ বিভিন্ন স্কিম সুবিধা। বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ কর্তৃক উত্থাপিত এসব দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। তন্মধ্যে 'ব্যাক টু ব্যাক' এলসির নীতিমালায় রপ্তানি বিল দেশে আনার সময়সীমা দুই মাস বাড়িয়ে ছয় মাস নির্ধারণ এবং আপৎকালীন তহবিল গঠন ও ঋণের নিশ্চয়তাসহ বিভিন্ন স্কিম সুবিধা প্রদান অন্যতম।

এপ্রিল-মে পর্যন্ত সরকার বিভিন্ন ক্রেতা প্রতিষ্ঠান ও দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে বাতিলকৃত ক্রয়াদেশ পুনর্বহাল ও নতুন কার্যাদেশের জন্য কৌশল প্রণয়ন করে। সরকারের এই উদ্যোগের কারণে নেদারল্যান্ডস ও সুইডেন সরকার ক্রয়াদেশ বাতিল না করার অঙ্গীকার করে এবং বিভিন্ন ক্রেতা প্রতিষ্ঠান ও দেশ বাতিল করা ক্রয়াদেশের একাংশ পুনর্বহালের অঙ্গীকার করে। ফলে আগস্ট ২০২০ পর্যন্ত বাতিলকৃত ক্রয়াদেশের মধ্যে ৯০ শতাংশ পুনর্বহাল হয় এবং প্রায় ১১ বিলিয়ন ডলারের নতুন কার্যাদেশ বাংলাদেশে এসেছে। তবে সরকার ও মালিকপক্ষ নানা উদ্যোগ গ্রহণের পরেও অক্টোবর ২০২০ পর্যন্ত প্রায় ১০ শতাংশ (প্রায় ৩১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বা ২ হাজার ৬৯৩ কোটি টাকা) বাতিলকৃত ক্রয়াদেশের উৎপাদিত পণ্য কারখানার মালিক শিপমেন্ট করতে পারেনি। অধিকাংশ ক্রেতা প্রতিষ্ঠান করোনার ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতির সুযোগ নিয়েছে বলে

মালিকপক্ষের অভিযোগ রয়েছে। ক্রেতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক চলমান ও নতুন কার্যাদেশে পণ্যের ৫ থেকে ১৫ শতাংশ মূল্যছাড় এবং অর্থ পরিশোধের জন্য ৯০-১৮০ দিন সময় দাবি করা হয়। ফলে সরবরাহকারী দেশি তৈরি পোশাক প্রতিষ্ঠানগুলো শ্রমিকদের মজুরি প্রদান ও ব্যবসা পরিচালনায় সংকটে পড়ে, পোশাকশিল্পে নগদ প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে চলমান ব্যবসা বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়।

প্রণোদনা

রপ্তানি প্রণোদনা ও কর অব্যাহতি : সরকার ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটে তৈরি পোশাক খাতের জন্য বিভিন্ন সুবিধা অব্যাহত রাখার ঘোষণা দেয়। এ ক্ষেত্রে রপ্তানি প্রণোদনার জন্য ২ হাজার ৮২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ; নতুন বাজারের জন্য চলমান ৫ শতাংশ প্রণোদনা অব্যাহত রাখা এবং করহার পরবর্তী দুই বছরের জন্য ১০-১২ শতাংশ অব্যাহত রাখার ঘোষণা দেওয়া হয়। তা ছাড়া তৈরি পোশাক খাতে কাঁচামাল আমদানিতে কর হ্রাস এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অব্যাহতি প্রদান করা হয়। এ খাতের কাঁচামাল আমদানির ওপর আগাম কর ৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৪ শতাংশ নির্ধারণ এবং তুলা ও অগ্নি প্রতিরোধ যন্ত্রপাতি আমদানিতে কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়। উৎপাদন পর্যায়ে সুতা উৎপাদনে কর হার হ্রাস এবং পিপিই ও মাস্ক উৎপাদনে কর অব্যাহতি দেওয়া হয়।

শ্রমিকদের মজুরি-ভাতা প্রদানে সরকারের আর্থিক প্রণোদনা : সরকার রপ্তানিমুখী শিল্পে কর্মরত শ্রমিকের এপ্রিল-জুলাই মাসের বেতন-ভাতা দেওয়ার জন্য মোট ১০ হাজার ৫০০ কোটি টাকার স্বল্প সুদে ঋণ 'প্রণোদনা প্যাকেজ' ঘোষণা করে। শ্রমিকদের মজুরি-ভাতা প্রদানের এই আর্থিক প্রণোদনা সরকারি ও বেসরকারি ৪৭টি ব্যাংকের মাধ্যমে বিজিএমইএর ১ হাজার ৩৭০টি এবং বিকেএমইএর ৪২০টি কারখানাসহ মোট ২ হাজার ৪৪টি প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হয়। প্রণোদনার অর্থ শ্রমিকদের সরাসরি দেওয়ার লক্ষ্যে মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসের (এমএফএস) মাধ্যমে নিজস্ব মোবাইল অ্যাকাউন্টে প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। তা ছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংকের রপ্তানি উন্নয়ন তহবিলে তৈরি পোশাক খাতের ঋণের পরিমাণ ৩৫০ থেকে ৫০০ কোটি ডলারে উন্নীতকরণ এবং সুদের হার কমানো হয়।

মূলধন ঋণসহায়তা প্যাকেজ : সরকার কার্যকরী মূলধন ঋণসহায়তা প্যাকেজ ঘোষণা করে এবং তা ৩১ আগস্টের মধ্যে বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের (পোশাক খাতের প্রায় ১ হাজার ৫০০টি) জন্য বরাদ্দকৃত ২০ হাজার কোটি টাকার মধ্যে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত প্রায় ৩৯ শতাংশ বিতরণ করা হয় এবং বৃহৎ শিল্পের (যার মধ্যে পোশাক খাতের কারখানা প্রায় ৩ হাজারটি) জন্য বরাদ্দকৃত মোট ৩৩ হাজার কোটি টাকার মধ্যে প্রায় ৮৫ শতাংশ বিতরণ করা হয়।

উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, দেশ ও ক্রেতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক শ্রমিক কল্যাণে আর্থিক সহায়তা : বাংলাদেশের বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী এবং ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে তৈরি পোশাক খাতের শ্রমিকদের করোনা মহামারির সংকট মোকাবিলায় কয়েকটি তহবিল গঠন করে। এর মধ্যে জার্মানি, এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি), এফসিডিও, ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ), এইচএন্ডএম ফাউন্ডেশন, লেভিস্ট্রস এবং টেক্স-অ্যাবো ইন্টারন্যাশনাল অন্যতম।

প্রণোদনা ও আর্থিক সহায়তা বিতরণ ও বাস্তবতা : করোনা সংকট মোকাবিলায় বাংলাদেশ তৈরি পোশাক খাতকে দেওয়া বিভিন্ন অংশীজনের প্রণোদনা ও সহায়তা বিশ্লেষণে দেখা যায়- মোট প্রণোদনার ৯৮ দশমিক ৫৭ শতাংশ (প্রায় ৬১ হাজার ৯৮০ কোটি টাকা) বাংলাদেশ সরকার দিয়েছে। এ ছাড়া উন্নয়ন সহযোগী দেশ ও প্রতিষ্ঠান দেয় মোট প্রণোদনার ১ দশমিক ৪০ শতাংশ (প্রায় ৮৭৫ কোটি টাকা) এবং বিভিন্ন ক্রেতা প্রতিষ্ঠান দেয় শূন্য দশমিক ০৩ শতাংশ (প্রায় ১৯ দশমিক ৭১ কোটি টাকা)। সরকারের দেওয়া মোট প্রণোদনার ৯৩ দশমিক ৯৬ শতাংশ (প্রায় ৫৯ হাজার ৯০ কোটি টাকা) ভর্তুকি সুদে ঋণসহায়তা প্যাকেজের আওতায় দেওয়া হয়।

সারণি ২ : একনজরে তৈরি পোশাক খাতে প্রণোদনার পরিমাণ (প্রাক্কলিত)

প্রণোদনা/ সহায়তার ধরন	প্রণোদনা/সহায়তা	প্রণোদনা/ সহায়তার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	মোট অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)
ঋণ সহায়তা	এপ্রিল-জুলাই মাসের বেতন-ভাতা দেওয়ার জন্য ঋণসহায়তা প্যাকেজ	৯,১৮৮.০০*	৫৯,০৯০.০০
	রপ্তানি উন্নয়ন তহবিলে ঋণের পরিমাণ ৫০০ কোটি ডলারে উন্নীতকরণ	১০,৮২২.০০**	
	বৃহৎ শিল্পের কার্যকরী মূলধন ঋণসহায়তা প্যাকেজ	৩৪,৮০০.০০*	
	ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের কার্যকরী মূলধন ঋণসহায়তা প্যাকেজ	৪,২৮০.০০***	
আর্থিক সহায়তা	ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ও জার্মানি কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের সহায়তা	৮৭৫.০০	৩,৭৮৯.৭১
	এইচএন্ডএম ফাউন্ডেশন নারী পোশাক শ্রমিকদের জরুরি সহায়তা	১১.০০	
	লেভিস্ট্রস সংশ্লিষ্ট কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের জরুরি সহায়তা	৮.৫০	
	‘টেক্স-অ্যাবো ইন্টারন্যাশনাল’ কর্তৃক শ্রমিকদের করোনা পরীক্ষা সহায়তা	০.২১	
	রপ্তানির জন্য নগদ সহায়তা ১% বৃদ্ধি	২,৮৯৫.০০	
মোট		**৬২,৮৭৯.৭১**	**৬২,৮৭৯.৭১**

** দেশের মোট বৃহৎ শিল্পের ৮৭ দশমিক ৫০ শতাংশ তৈরি পোশাক খাতের হিসাবে;*

*** দেশের মোট রপ্তানির ৮৫ দশমিক ২৭ শতাংশ তৈরি পোশাক খাতের হিসাবে;*

**** দেশের মোট ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ২১ দশমিক ৪০ শতাংশ তৈরি পোশাক খাতের হিসাবে;*

বিশ্লেষণে দেখা যায়, সরকারি ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রণোদনার বেশিরভাগ কারখানা মালিকদের ব্যবসায়িক সংকট মোকাবিলায় দেওয়া হয়। করোনা সংকট মোকাবিলায় প্রদত্ত প্রণোদনার প্রায় ৮৪ শতাংশ বা ৫২ হাজার ৮০০ কোটি টাকা দেওয়া হয় তৈরি পোশাক কারখানার মালিকদের ব্যবসায়িক স্বার্থে। কিন্তু এপ্রিল-জুলাই পর্যন্ত তৈরি পোশাক শ্রমিকদের প্রাক্কলিত বেতন-ভাতা প্রায় ১২ হাজার ৬৯২[১] কোটি টাকা হলেও সরকার প্রদেয় এই প্যাকেজে প্রণোদনার পরিমাণ ছিল ৯ হাজার ১৮৮ কোটি টাকা, যা প্রয়োজনের তুলনায় ২৭ দশমিক ৬ শতাংশ কম। ফলে তৈরি পোশাক খাতে কর্মরত মোট শ্রমিকের প্রায় ৪২ দশমিক ০২ শতাংশ[২] (প্রায় ১৪ লাখ) বেতন-ভাতা বাবদ সরকারি প্রণোদনার অর্থ পাননি বা বঞ্চিত হন।

ইইউ ও জার্মানি কর্তৃক পোশাকশ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা সহায়তার তহবিল (শ্রমিক কল্যাণে আন্তর্জাতিক সহায়তার ৯৭ দশমিক ৭৯ শতাংশ বা ৮৭৫ কোটি টাকা) গঠনের প্রায় তিন মাস পর শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। গবেষণার তথ্যানুযায়ী এ ক্ষেত্রে সরকার ও মালিকপক্ষের সংগঠনগুলোর ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের তালিকা প্রণয়নে অনাগ্রহ ও দায়িত্বে অবহেলা ছিল। ফলে সম্ভাব্য সুবিধাভোগী প্রায় ১০ লাখ শ্রমিক সামাজিক সুরক্ষা সহায়তা এখনো পাননি। তালিকা তৈরির পদ্ধতিগত জটিলতা থাকার কারণে তৈরি পোশাক খাতের মালিক সংগঠনের (বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ) বাইরে থাকা কারখানা ও সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের বঞ্চিত হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি হয়।

চিত্র ২ : প্রাপ্ত প্রণোদনা ও সহায়তার হার (%) ও পরিমাণ (কোটি টাকায়)

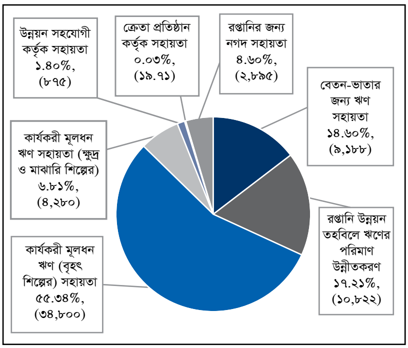

চিত্র ৩: শ্রমিক ও মালিকপক্ষের প্রাপ্ত প্রণোদনা ও সহায়তার হার (%)

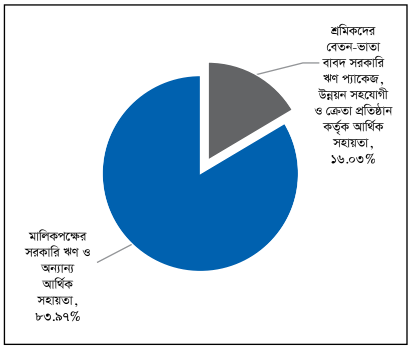

প্রণোদনার অর্থ প্রাপ্তিতে বড় বড় কারখানাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বড় কারখানার মালিকদের বিরুদ্ধে প্রণোদনা প্রাপ্তিতে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার ও তদবিরের অভিযোগ রয়েছে। তা ছাড়া ব্যাংক থেকে অর্থছাড়ের পদ্ধতিগত জটিলতার জন্য কারখানাগুলোর অর্থ প্রাপ্তিতে এক মাসের অধিক সময় ব্যয় হয়। ফলে শ্রমিকরা যথাসময়ে বেতন-ভাতা পাননি এবং

১ তৈরি পোশাক শ্রমিক প্রতি মাসিক ১১৩ মার্কিন ডলার হিসাবে প্রাক্কলন করা হয়েছে।

২ তৈরি পোশাক খাতে কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ৩৩ লক্ষ হিসাবে প্রাক্কলন করা হয়েছে।

করোনা সংকটকালে মানবেতর অবস্থায় পতিত হন। তা ছাড়া এমএফএস অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে বেতন উত্তোলনে সময় ও অর্থ তুলনামূলক বেশি ব্যয় হওয়ায় এ পদ্ধতি ব্যবহারে শ্রমিকরা অনাগ্রহ প্রকাশ করেন। কিছু কারখানা লে-অফ ঘোষণা এবং করোনা সংকটের শুরুতে ছাঁটাই হওয়ার কারণে প্রণোদনাপ্রাপ্ত ৬৪ কারখানার ২১ হাজার শ্রমিকের বেতন-ভাতা না পাওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এ পরিস্থিতিতে সাব-কন্ট্রাক্ট কারখানাগুলোর জন্য কোনো নির্দেশনা না থাকায় সংশ্লিষ্ট প্রায় ৩ হাজার কারখানার প্রায় ১৫ লাখ শ্রমিকের বেতন-ভাতা পাওয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।

প্রণোদনা বিতরণেও বৈষম্য লক্ষ করা গেছে। ঋণের টাকা পরিশোধে বৃহৎ শিল্প খাতের জন্য দুই বছর নির্ধারণ করলেও ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতের জন্য তা এক বছর নির্ধারণ করা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঝুঁকি বিবেচনায় সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলোর ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে ঋণ প্রদানে অনাগ্রহ প্রকাশের অভিযোগ রয়েছে। তা ছাড়া ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতের জন্য গঠিত প্রণোদনা তহবিল ছাড়ে দীর্ঘসূত্রতা লক্ষণীয়। অপরদিকে নতুন অর্থবছরে (২০২০-২১ অর্থবছর) পোশাক খাতের জন্য উৎস কর আগের শূন্য দশমিক ২৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে শূন্য দশমিক ৫০ শতাংশ নির্ধারণ করার ফলে এ খাতের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধ

মার্চ ২০২০-এ করোনা মহামারির শুরুতে সরকার দেশব্যাপী সাধারণ ছুটি ঘোষণা করলেও সরকার বা মালিকপক্ষের কোনো দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষই কলকারখানা বন্ধের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ২৪ মার্চ এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ২৭ মার্চ কারখানা খোলা রাখা যাবে এমন প্রজ্ঞাপন জারি করেই তাদের দায়িত্ব শেষ করে। বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটির সঙ্গে সমন্বয় করে ২৬ মার্চ ও ৫ এপ্রিল কারখানা বন্ধের আহ্বান করে। সরকার ১ এপ্রিল সাধারণ ছুটি বর্ধিত করলেও কারখানার মালিকরা অপরিকল্পিতভাবে কারখানা খুলে দেন। কারখানা খোলার খবরে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তৈরি পোশাকশ্রমিকরা কারখানা-অধ্যুষিত এলাকায় চলে আসেন এবং একই দিনে কারখানা বন্ধ ঘোষণায় পুনরায় ফেরত যেতে বাধ্য হন। এতে করে পরিবহন সংকটে শ্রমিকদের হয়রানির শিকার হতে হয় এবং সারা দেশে ব্যাপকভাবে করোনাভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি সৃষ্টি হয়।

প্রশিক্ষণ

বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ কোভিড-১৯ মহামারি বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কারখানার পার্টিসিপেশন এবং পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য কারখানা মালিকদের নির্দেশনা প্রদান করে। তা ছাড়া বিজিএমইএ ও বিকেএমইএর সহায়তায় আইএলও ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে কারখানা সুরক্ষাবিষয়ক প্রশিক্ষণের জন্য ‘লার্নিং হাব’ প্রকল্প চালু করে। আগস্ট ২০২০ পর্যন্ত লার্নিং হাব প্রকল্পের অধীন মোট ১৫০ জন শ্রমিককে কারখানার সুরক্ষাবিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, যা তৈরি পোশাক খাতের মোট শ্রমিকের সংখ্যা বিবেচনায় অতি নগণ্য। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যমতে, অধিকাংশ তৈরি পোশাক কারখানায় কোভিড-১৯ সচেতনতা বৃদ্ধির

জন্য কোনো ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়নি। তা ছাড়া স্বাস্থ্য সুরক্ষাবিষয়ক দক্ষ প্রশিক্ষকের ঘাটতি রয়েছে এবং কারখানা মালিকদের আগ্রহ ও সচেতনতার ঘাটতি বিদ্যমান।

অংশগ্রহণ ও সমন্বয়

কারখানা মালিক ও শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করে তৈরি পোশাক কারখানায় উৎপাদন অব্যাহত রাখতে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা প্রদান করেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে সরকার, বিজিএমইএ ও কারখানা মালিকদের সমন্বিত উদ্যোগে ২৮ এপ্রিল থেকে ৪ মের মধ্যে অঞ্চলভেদে পর্যায়ক্রমে নির্দিষ্ট সংখ্যক কারখানা খোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তবে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও কারখানা খোলার ক্ষেত্রে শ্রমিক ও শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে মালিকপক্ষ কোনো আলোচনা বা সভা করেনি। এ ক্ষেত্রে সরকার, বিজিএমইএ, মালিকপক্ষ ও শ্রমিক সংগঠনের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি লক্ষণীয়। অঞ্চলভেদে নির্দিষ্ট সংখ্যক কারখানা খোলার পরিবর্তে এবং সংক্রমণের ঝুঁকি বিবেচনা না করে বিশৃঙ্খলভাবে সারা দেশে কারখানা খোলা হয়।

করোনা সংকট মোকাবিলায় সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় সাধনের জন্য জুন মাসে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং বিজিএমইএর কার্যালয়ে 'কন্ট্রোল রুম' স্থাপন করা হয়। একই সময়ে কারখানাগুলোয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত স্বাস্থ্য সুরক্ষা গাইডলাইন প্রতিপালন অবস্থা পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে সভাপতি ও সিভিল সার্জনকে সদস্য সচিব করে ৭ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। এসব উদ্যোগ বাস্তবায়নে সরকারের আন্তমন্ত্রণালয় সমন্বয়ে ঘাটতি লক্ষ করা গেছে, স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে প্রধান করে কমিটি করা হলেও মন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী কারখানা খোলা ও বন্ধের বিষয়ে তাকে জানানো হয়নি। তা ছাড়া স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত তৈরি পোশাক কারখানা পরীবিক্ষণ কমিটিতে শ্রমিক প্রতিনিধি না রাখার ফলে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়নি। অনুরূপভাবে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে গঠিত কমিটিতে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরকে সংযুক্ত না করে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক একক সিদ্ধান্তে কমিটি গঠনের ফলে কমিটিগুলো কার্যকরভাবে পরিদর্শন করতে পারেনি।

স্বচ্ছতা

এপ্রিল ২০২০-এ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর করোনাভাইরাস সংক্রমিত কারখানার শ্রমিকদের তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে ২৩টি কার্যালয়ে রেজিস্টার চালু করে। একই সময়ে শিল্প পুলিশ কর্তৃক কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা এবং শ্রমিক ছাঁটাইয়ের তথ্য প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়। তবে আগের মতো করোনা সংকটকালেও এ খাত বিষয়ে মালিকপক্ষ ও সরকারের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশে ঘাটতি বিদ্যমান ছিল। এ ক্ষেত্রে কলকারখানার ধরন অনুযায়ী প্রাপ্ত প্রণোদনা ও সহায়তার পরিমাণ এবং প্রণোদনা বা সহায়তাপ্রাপ্ত কারখানা ও শ্রমিকের তালিকা সংগ্রহ ও প্রকাশ করা হয়নি। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক রেজিস্টার চালু করা হলেও করোনাভাইরাস সংক্রমিত রোগীর হালনাগাদ কোনো তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। জুলাই মাস পর্যন্ত শিল্প পুলিশ কর্তৃক করোনা সংক্রমিত কারখানা ও শ্রমিকের তথ্য প্রকাশ করা হলেও পরে সরকার ও মালিকপক্ষের চাপে আগস্ট মাস থেকে এ-সংক্রান্ত তথ্য উন্মুক্ত করা থেকে শিল্প পুলিশ বিরত থাকে।

করোনা মহামারির ফলে উদ্ভূত সংকটের শুরুতে বিজিএমইএ কর্তৃক কার্যাদেশ বাতিলের পরিমাণ, ক্ষতিগ্রস্ত কারখানা ও শ্রমিকের সংখ্যা এবং কোভিড-১৯ আক্রান্ত শ্রমিকের সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে। তবে সরকার কর্তৃক প্রকাশিত তথ্যের তুলনায় বিজিএমইএ প্রকাশিত তালিকায় শ্রমিক ছাঁটাই ও করোনা আক্রান্ত শ্রমিকের সংখ্যা কম দেখানো হয়। তা ছাড়া বাতিল হওয়া প্রায় ৯০ শতাংশ কার্যাদেশ পুনর্বহাল হলেও বিজিএমইএ সে বিষয়ে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশে বিরত থাকে। আন্তর্জাতিক শ্রমিক অধিকার কনসোর্টিয়ামে কোনো কোনো ক্রেতা প্রতিষ্ঠান বাতিল ও পুনর্বহালকৃত কার্যাদেশের আর্থিক পরিমাণবিষয়ক তথ্য প্রকাশ করে। তবে ক্রেতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত তথ্যের তুলনায় কারখানা থেকে প্রাপ্ত তথ্যে বাতিলকৃত কার্যাদেশের পরিমাণ কম দেখানো হয়।

শ্রমিক অধিকার ও নিরাপত্তা

বকেয়া মজুরি-ভাতা

এপ্রিল মাসে শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি-ভাতা বিষয়ে সরকার, মালিকপক্ষ ও শ্রমিক সংগঠনের মধ্যে অনুষ্ঠিত ত্রিপক্ষীয় সভায় সাধারণ ছুটিকালীন শ্রমিকদের বেতনের ৬৫ শতাংশ প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ওই সভায় শ্রম আইন ২০০৬ অনুযায়ী লে-অফকৃত কারখানার ৫০ শতাংশ মজুরি প্রদানের বিধান থাকলেও কারখানার মালিক কর্তৃক অধিক হারে (৬৫ শতাংশ) মজুরি প্রদানের অঙ্গীকার করা হয়। তা ছাড়া ঈদ বোনাসের ক্ষেত্রে ঈদের আগে অর্ধেক এবং পরবর্তী ছয় মাসে বেতনের সঙ্গে বাকি অর্ধেক প্রদানের সিদ্ধান্ত হয়। সরকার, বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ কর্তৃক মে মাস থেকে কর্মরত শ্রমিকদের প্রাপ্য মজুরি নিয়মিত প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। গৃহীত সব পদক্ষেপ বাস্তবায়নে অনেক ক্ষেত্রে ব্যত্যয় লক্ষ করা গেছে। অনেক ক্ষেত্রে লে-অফ কারখানার শ্রমিকদের মজুরি ও ঈদ বোনাস অঙ্গীকার অনুযায়ী (৬৫ শতাংশ) প্রদান করা হয়নি। তা ছাড়া মে মাস থেকে শ্রমিকদের মজুরি নিয়মিত প্রদানের বিজিএমইএ কর্তৃক নির্দেশনা থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে শ্রমিকদের নিয়মিত মজুরি দেওয়া হয়নি এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কর্মঘণ্টার প্রাপ্য মজুরি ও ভাতা প্রদান করা হয়নি। ফলে করোনা উদ্ভূত সংকটে তৈরি পোশাক খাতের শ্রমিকরা আর্থিকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হন। ব্র্যাকের একটি গবেষণায় (২০২০) দেখা গেছে, করোনা সংকটকালে ৭৭ শতাংশ শ্রমিক তাদের পরিবারের সব সদস্যের খাদ্যের চাহিদা পূরণ করতে পারছেন না। ক্লিন ক্লথ ক্যাম্পেইনের অপর একটি গবেষণায় (২০২০) করোনা সংকটের কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে মার্চ-মে পর্যন্ত শ্রমিকদের মজুরি ও ঈদ বোনাসের ক্ষেত্রে 'ওয়েজ গ্যাপ' প্রাক্কলন করা হয় যথাক্রমে ৩০ ও ৪০ শতাংশ।

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যমতে, এপ্রিল মাসে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কারখানা লে-অফ ও শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধ করার জন্য সংশ্লিষ্ট মালিক সংগঠন ও মন্ত্রণালয়ে চিঠি পাঠায় এবং বিজিএমইএ কর্তৃক কারখানার মালিকদের শ্রমিক ছাঁটাই না করে বকেয়া মজুরি কম অংশ প্রদানের নির্দেশনা দেওয়া হয়। বিশেষ কারণে কারখানা মালিক কর্তৃক শ্রমিক ছাঁটাইয়ের ক্ষেত্রে দুই মাসের বেতনের সমপরিমাণ অর্থ প্রদানের নির্দেশনাও প্রদান করা হয়। তবে বাস্তবে দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রেই তা প্রতিপালন করা হয়নি। তথ্যানুযায়ী, সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত বিজিএমইএর ৩৪৮টিসহ

মোট ১ হাজার ৯০৪টি কারখানা লে-অফ ও বন্ধ ঘোষণা করে এবং প্রায় ৬০-৬৫ হাজার শ্রমিক ছাঁটাইয়ের শিকার হন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে একত্রে বহু সংখ্যক শ্রমিক ছাঁটাই করা হলেও পরে অল্পসংখ্যক নিয়মিত শ্রমিক ছাঁটাই অব্যাহত রয়েছে। কারখানায় ইচ্ছাকৃত ছাঁটাই আতঙ্ক সৃষ্টির মাধ্যমে কম বেতন ও মজুরি ছাড়া অতিরিক্ত কর্মঘণ্টায় কাজ করানো এবং ছাঁটাই করা শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধ না করার অভিযোগ রয়েছে।

স্বাস্থ্য সুরক্ষা

স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে বিজিএমইএ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহযোগিতায় তৈরি পোশাক কারখানার জন্য একটি স্বাস্থ্য সুরক্ষা গাইডলাইন প্রণয়ন করে। এ ছাড়া শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর টেলিমেডিসিন সেবা এবং করোনা মহামারি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য চারটি অঞ্চলে প্রায় দুই লাখ পোস্টার ও লিফলেট বিতরণ করেছে। শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য গৃহীত এসব পদক্ষেপের কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যত্যয় লক্ষণীয়। অনেক ক্ষেত্রে কারখানা পরিচালনায় বিজিএমইএর গাইডলাইন পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ করা হয়নি। তথ্যানুযায়ী, অধিকাংশ কারখানায় মাস্ক পরা নিশ্চিত করা হলেও হাত ধোয়ার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই; শ্রমিকদের খাবার ও বিশ্রামের জায়গা এবং টয়লেটের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়নি। তা ছাড়া শিফটিং পদ্ধতিতে ৩০-৫০ শতাংশ শ্রমিকের মাধ্যমে কারখানা চালুর নির্দেশনা অধিকাংশ কারখানা মালিক মানেননি।

পোশাকশ্রমিকদের করোনা চিকিৎসায় বিজিএমইএর উদ্যোগে চট্টগ্রাম মহানগরীতে ৫০ শয্যার একটি কোভিড-১৯ ফিল্ড হাসপাতাল চালু করা হয়। এপ্রিল মাসে বিজিএমইএ কর্তৃক তৈরি পোশাক কারখানার শ্রমিকদের বিনা মূল্যে করোনা পরীক্ষার জন্য ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ ও চট্টগ্রামে চারটি পিসিআর ল্যাব স্থাপন এবং এসব ল্যাবে প্রতিদিন প্রতিদিন ১৮০টি নমুনা পরীক্ষার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তবে ঘোষিত চারটির স্থলে গাজীপুরে শুধু একটি পিসিআর ল্যাব স্থাপন করা হয় এবং এই ল্যাবে দৈনিক ৪০-৫০টি নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। স্থাপিত ল্যাবে নমুনা সংগ্রহ এবং ল্যাব পরিচালনার জন্য অভিজ্ঞ ও দক্ষ জনবলের ঘাটতি বিদ্যমান রয়েছে। ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নমুনার পরীক্ষার ফলাফল পেতে সর্বোচ্চ দুই সপ্তাহ সময় লাগার অভিযোগ রয়েছে। ফলে করোনাভাইরাস পরীক্ষার ব্যবস্থা সীমিত হওয়ায় প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও শ্রমিকরা পরীক্ষার সুযোগ পাচ্ছেন না এবং চাকরি হারানোর আতঙ্কে উপসর্গ থাকা সত্ত্বেও শ্রমিক কর্তৃক তা লুকানোর প্রবণতার কারণে কারখানার অন্য শ্রমিকদের স্বাস্থ্যঝুঁকি বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই এ খাতে করোনাভাইরাস আক্রান্ত শ্রমিকের প্রকৃত সংখ্যা জানা যাচ্ছে না। ব্র্যাকের এক জরিপে দেখা গেছে, প্রায় ৮৫ দশমিক ৭ শতাংশ পোশাকশ্রমিক (প্রাক্কলিত প্রায় ২৮ দশমিক ২৮ লাখ) ৫-৭ দিন করোনার লক্ষণে (ঠান্ডা, কফ ও জ্বর) ভুগেছেন বলে জানান; যদিও তাদের নগণ্যসংখ্যক করোনা পরীক্ষা করেছেন।

মালিকদের খরচে অসুস্থ শ্রমিকদের হাসপাতালে পাঠানো এবং কারখানার নিজস্ব ব্যবস্থায় অথবা পার্শ্ববর্তী বেসরকারি হাসপাতালে শ্রমিকদের জন্য পৃথক আইসোলেশন সেন্টারের ব্যবস্থা করার

জন্য বিজিএমইএ নির্দেশনা প্রদান করে। একই সময়ে কর্মরত শ্রমিক করোনায় আক্রান্ত হলে মজুরিসহ সাধারণ ছুটি প্রদান এবং যাবতীয় চিকিৎসার দায়িত্ব নেওয়ার জন্য কারখানার মালিকদের অনুরোধ করা হয়। বিজিএমইএ কর্তৃক দেওয়া এসব নির্দেশনা কারখানার মালিকরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে পালন করেননি। তথ্যানুযায়ী, অধিকাংশ তৈরি পোশাক কারখানার মালিক কর্মরত শ্রমিকদের জন্য পৃথক আইসোলেশন সেন্টারের ব্যবস্থা করেননি। কিছু ক্ষেত্রে করোনা আক্রান্ত বা উপসর্গ থাকা শ্রমিকদের সাধারণ ছুটি দেওয়ার পরিবর্তে ছাঁটাই করা এবং কোনো কোনো কারখানায় আক্রান্ত শ্রমিককে সাধারণ ছুটি দিলেও মজুরিসহ ছুটি না দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। ফলে আগস্ট ২০২০ পর্যন্ত বিজিএমইএর সদস্যভুক্ত কারখানায় ৫১১ জন শ্রমিক করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হন এবং মোট ৬ জন শ্রমিক মৃত্যুবরণ করেন।

মাতৃত্বকালীন সুবিধা

তৈরি পোশাক খাতে কর্মরত নারী শ্রমিকদের জন্য মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় বিজিএমইএ ও বিকেএমইএর কারখানায় 'দ্য ল্যাকটেটিং মাদার এইড ফান্ড প্রজেক্ট' চালু করা হয়। জুন মাসে নিউট্রিশন ইন্টারন্যাশনালের সহযোগিতায় বিকেএমইএর কারখানায় 'নিউট্রিশন অব ওয়ার্কিং উইমেন' প্রকল্প চালু করা হয়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কারখানা মালিক কর্তৃক করোনার কারণে মাতৃস্তন্যপানকারী শিশুদের কর্মস্থলে আনা নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। এর ফলে স্তন্যদায়ী মায়েদের মানসিক অবসাদে ভোগা, সন্তানের জন্য উদ্বিগ্ন হওয়া এবং উৎপাদনশীলতা কমে যাওয়ার তথ্য পাওয়া গেছে। কিছু ক্ষেত্রে মাতৃত্বকালীন সুবিধা প্রদান না করা ও অতিরিক্ত কর্মঘণ্টা কাজ করানোর অভিযোগ রয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে গর্ভবতী নারীদের বিনা কারণে ছাঁটাই করা ও কাজে যোগ দিতে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে।

সংগঠনের অধিকার

করোনা মহামারির সময়ে সরকার কর্তৃক শ্রমিক সংগঠনের নিবন্ধন বন্ধ রাখা হয়েছে। তা ছাড়া জাতীয় শ্রমিক অধিকার সংগঠনগুলো করোনা মহামরিকালীন শ্রমিকদের স্বার্থ সুরক্ষায় মালিকপক্ষ ও সরকারের সঙ্গে বিভিন্ন সভা আয়োজন করেছে এবং শ্রমিক ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে ও পূর্ণাঙ্গ মজুরি-ভাতা পাওয়ার জন্য ঢাকা, গাজীপুর ও চট্টগ্রামে শ্রমিক সমাবেশ আয়োজন করেছে। তথ্যানুযায়ী, কার্যাদেশ না থাকার কারণে ট্রেড ইউনিয়ন আছে এমন অধিকাংশ ক্ষুদ্র কারখানা ও শ্রমিক সংগঠনের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিতে ত্রিপক্ষীয় সভায় শ্রমিক সংগঠনগুলোর দাবি উপেক্ষিত হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকার ও মালিকপক্ষের চাপে শ্রমিকদের অধিকার আদায়ে ট্রেড ইউনিয়নগুলোর নিষ্ক্রিয়তা লক্ষণীয়। তবে আন্তর্জাতিক শ্রমিক অধিকার সংগঠনগুলো করোনা মহামারির ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কার্যাদেশ বাতিল না করার জন্য চাপ প্রয়োগ করে।

জবাবদিহি

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, শ্রম অধিদপ্তর ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে কারখানার জবাবদিহি নিশ্চিতে ২৬টি 'ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটি' গঠন করা হয়। এসব কমিটি

ঢাকার অভ্যন্তরের মাত্র ৫টি কারখানা পরিদর্শন করে। প্রয়োজনীয় যানবাহন ও সুরক্ষা সামগ্রীর ঘাটতির কারণে এসব কমিটি অধিকাংশ কারখানা পরিদর্শন করতে পারেনি। ফলে কারখানায় শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করা যায়নি। কোভিড-১৯ মহামারিকালে শ্রমিক অসন্তোষ নিরসনে কার্যকর ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হওয়ায় প্রায় ১০০-এর অধিক স্থানে শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দেয়। কারখানা পর্যায়ে জবাবদিহি নিশ্চিতে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং বিজিএমইএ কার্যালয়ে কারখানা পর্যায়ের যেকোনো অভিযোগ গ্রহণের জন্য হটলাইন চালু করা হয়। কিন্তু কারখানা পর্যায়ে হটলাইন বিষয়ে প্রচারণার ঘাটতি এবং নির্ধারিত নম্বরে ফোন দিয়ে কাউকে না পাওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

কার্যাদেশে উল্লিখিত শর্ত ভঙ্গ বা কার্যাদেশ বাতিল করা ক্রেতা প্রতিষ্ঠানকে বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ কর্তৃক কালো তালিকাভুক্তকরণে উদ্যোগ গ্রহণ করা। এর ধারাবাহিকতায় যুক্তরাজ্যের একটি ক্রেতা প্রতিষ্ঠানকে প্রথম পর্যায়ে কালো তালিকাভুক্ত করা হয়। তবে মালিকপক্ষের নেওয়া এই উদ্যোগ শুরুতেই সমস্যার সম্মুখীন হয়– মাস্টার এলসির পরিবর্তে শুধু কার্যাদেশনির্ভর বাণিজ্য সম্পাদনের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে অনেক ক্ষেত্রে ক্রেতা প্রতিষ্ঠানকে জবাবদিহির আওতায় আনা সম্ভব হয়নি। ফলে ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলোর চাপে গৃহীত কালো তালিকাভুক্তিকরণ কার্যক্রম থেকেও মালিক সংগঠনকে সরে আসতে বাধ্য করা হয়। অনুরূপভাবে লে-অফকৃত কারখানা সরকার ঘোষিত প্রণোদনা পাবে না– বাংলাদেশ ব্যাংক প্রথমে এমন নির্দেশনা দিলেও পরে মালিকপক্ষের প্রভাব ও চাপে এই নির্দেশনা থেকে সরে আসে।

পরিস্থিতি নজরদারি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিজিএমইএ এলাকাভিত্তিক চারটি ‘জোনাল কমিটি’ এবং পরিচালকদের নেতৃত্বে ছয়টি নিরীক্ষা দল গঠন করে। গঠিত নিরীক্ষা দল মোট ১৪৭টি কারখানা পরিদর্শন করে এবং তিনটি কারখানার সুরক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির জন্য সংশোধনমূলক পরিকল্পনা নিয়ে পুনরায় কার্যক্রম শুরু করার পরামর্শ দেয়। তবে প্রথম পর্যায়ে কারখানা পরিদর্শন কার্যক্রম চালু করলেও বর্তমানে তা ঝিমিয়ে পড়েছে।

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

তৈরি পোশাক খাতে সুশাসনের বিভিন্ন নির্দেশকে উল্লেখযোগ্য ঘাটতি বিভিন্ন সময়ে উঠে এলেও তা নিরসনে সরকার ও মালিকপক্ষের সদিচ্ছা ও কার্যকর পদক্ষেপের ঘাটতি লক্ষণীয়- করোনার সময়ে এই প্রবণতা আরও প্রকট হয়েছে বলে দেখা যায়। আরও দেখা যাচ্ছে, চার দশক ধরে বিকশিত তৈরি পোশাক খাত এখনো প্রণোদনার ওপর নির্ভরশীল; মালিকপক্ষ সরকারের ওপর প্রভাব ও চাপ প্রয়োগ করে নিজেদের সুবিধা আদায় করে। করোনার মতো সংকট মোকাবিলায় এ খাতের নিজস্ব সক্ষমতা এখনো তৈরি হয়নি। মালিকপক্ষ ব্যবসার সম্ভাব্য ক্ষতি পুষিয়ে নিতে সরকারের কাছে বিভিন্ন প্রণোদনা আদায় করলেও শ্রমিকদের অধিকার, সুরক্ষা ও নিরাপত্তায় কোনো প্রকার পরিকল্পনা ও কার্যকর কৌশল প্রণয়ন করেনি। করোনা সংকটকালে ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলো শ্রমিক সুরক্ষার ওপর গুরুত্ব দেয়নি এবং দায়িত্ব এড়িয়ে গেছে; বরং কারখানা মালিকদের চাপে রাখা ও নৈতিক ব্যবসা না করার প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। করোনা সংকটের প্রাথমিক পর্যায়ে শ্রমিকদের

স্বার্থ বিবেচনায় না নিয়ে শুধু ব্যবসায়িক স্বার্থে আইনের অপব্যবহারের মাধ্যমে কারখানা লে-অফ ঘোষণার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। সর্বোপরি করোনা সংকটের কারণে দেশের তৈরি পোশাক খাত ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়; সংকট থেকে উত্তরণের জন্য এ খাতে সরকার কর্তৃক বিপুল প্রণোদনা ও সহায়তা প্রদান করে, যার ক্ষুদ্র অংশ শ্রমিকরা পেয়েছেন।

সুপারিশ

১. করোনা মহামারি বিবেচনায় নিয়ে সব শ্রেণির শ্রমিকের চাকরির নিরাপত্তার বিধান সংযুক্ত করে 'শ্রম আইন, ২০০৬'– এর ধারা ১৬ এবং ধারা ২০ সংশোধন করতে হবে।

২. বিজিএমইএ কর্তৃক প্রণীত গাইডলাইন মোতাবেক শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহ এবং স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন ব্যত্যয় হলে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে 'ইউটিলাইজেশন ডিক্লারেশন (ইউডি)' সুবিধা বাতিল এবং জরিমানার ব্যবস্থা করতে হবে।

৩. বিজিএমইএর অঙ্গীকার করা করোনাভাইরাসের নমুনা পরীক্ষার বাকি তিনটি ল্যাব দ্রুততার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে স্থাপন করতে হবে।

৪. ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলোকে নৈতিক ব্যবসা পরিচালনায় অঙ্গীকারাবদ্ধ হতে হবে। পোশাকের ভিত্তিমূল্য নির্ধারণ ও কার্যাদেশের বিদ্যমান শর্তের সঙ্গে দুর্যোগকালে শ্রমিক অধিকার নিশ্চিতকরণের বিষয় সংযুক্ত করতে হবে।

৫. করোনার দ্বিতীয় পর্যায়ের সংক্রমণ মোকাবিলায় সরকার ও মালিক সংগঠন কর্তৃক গঠিত বিভিন্ন কমিটিকে পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য সুরক্ষাসামগ্রী ও যাতায়াতের ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে এসব কমিটি শ্রমিকদের অধিকার ও কারখানায় তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

৬. লে-অফকৃত কারখানায় এক বছরের কম কর্মরত শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষার আওতায় আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৭. শ্রমিক অধিকার ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিতে সরকার, মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির নিয়মিত ও কার্যকর পরিদর্শন নিশ্চিত করতে হবে।

৮. ইইউ ও জার্মানির সহায়তা তহবিল ব্যবহারের জন্য করোনা মহামারির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের সঠিক তালিকা অবিলম্বে প্রণয়ন করতে হবে।

৯. করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়া, শ্রমিক ছাঁটাই, কার্যাদেশ বাতিল ও পুনর্বহাল, প্রণোদনার অর্থের ব্যবহার ও বণ্টন ইত্যাদি সব তথ্য সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে; এসব তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে।

চতুর্থ অধ্যায়
পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ মোকাবিলা

বন অধিদপ্তর : সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়*

মো. রেযাউল করিম, মোহাম্মদ নূরে আলম ও মো. নেওয়াজুল মওলা

গবেষণার প্রেক্ষাপট

পরিবেশের সুষম ভারসাম্য রক্ষাসহ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য অংশ বন। বন বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক সম্পদ। দেশের মোট জাতীয় উৎপাদনে বনজ সম্পদের অবদান প্রায় ৩ শতাংশ এবং প্রায় ৫৮ লাখ মানুষ জীবন ও জীবিকার জন্য বনের ওপর নির্ভরশীল। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বনভূমির গুরুত্ব বিবেচনা করে জাতিসংঘের ১৫তম টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টে টেকসই বন ব্যবস্থাপনার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। এ ছাড়া 'দি কনভেনশন অন বায়োলজিক্যাল ডাইভার্সিটি'র অনুস্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সম্পদ তথা বন সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে অঙ্গীকারবদ্ধ। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৮(ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, বনভূমি সংরক্ষণ রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িত্ব হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে; যেখানে বলা হয়েছে, রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করবে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্য প্রাণীর সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করবে। 'জাতীয় বননীতি ২০১৬' ও 'বন মহাপরিকল্পনা ২০১৭-২০৩৬' এবং 'সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৬-২০২০'– এ বন, বনভূমি ও বন্য প্রাণী রক্ষায় অগ্রাধিকারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

বাংলাদেশের বন ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা ও উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মূল দায়িত্ব বন অধিদপ্তরের ওপর ন্যস্ত। বন অধিদপ্তর তাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে বন সম্প্রসারণ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, দারিদ্র্য বিমোচন ও বন্য প্রাণী সংরক্ষণকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। এ ছাড়া বন ও জীববৈচিত্র্যের বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, বন সম্প্রসারণ, অবক্ষয়িত বন পুনঃবনায়ন ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রধান দায়িত্ব 'বন অধিদপ্তর'– এর ওপর ন্যস্ত। বর্তমানে বন অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন মোট বনভূমির পরিমাণ প্রায় ৪৬ লাখ ৫২ হাজার ২৫০ একর, যা দেশের মোট আয়তনের প্রায় ১২ দশমিক ৭৬ শতাংশ। বাংলাদেশে অপরিকল্পিতভাবে বনের জমিতে বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়ন ও অবকাঠামো নির্মাণের ফলে বন সংকোচন অব্যাহত রয়েছে। গ্লোবাল ফরেস্ট ওয়াচের তথ্যমতে, ২০০১ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে বাংলাদেশে মোট ৪ লাখ ৩২ হাজার ২৫০ একর এলাকার বৃক্ষ আচ্ছাদন হ্রাস পেয়েছে, যা মোট বৃক্ষ আচ্ছাদিত এলাকার ৯ শতাংশ। বন উদ্বেগজনকভাবে হ্রাস পাওয়ার পেছনে বনকেন্দ্রিক অনিয়ম ও দুর্নীতির ভূমিকাই প্রধান।

---

* ২০২০ সালের ৩০ ডিসেম্বর ঢাকায় ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশিত গবেষণার সারসংক্ষেপ।

বন ও বনজ সম্পদের প্রধান নিয়ন্ত্রক ও রক্ষক হিসেবে বন অধিদপ্তরের ভূমিকা ও কার্যকারিতা প্রশ্নবিদ্ধ। গবেষণা প্রতিবেদন, নিবন্ধনসহ গণমাধ্যমে বন অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতায় ঘাটতি, বনায়ন ও বন সংরক্ষণ কার্যক্রমে অনিয়ম ও দুর্নীতির তথ্য বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে। বনসংক্রান্ত নীতিমালা, মহাপরিকল্পনা ও শুদ্ধাচার কৌশল থাকা সত্ত্বেও বনকেন্দ্রিক দুর্নীতি-অনিয়ম অব্যাহত রয়েছে। ফলে বন অধিদপ্তরকে বন রক্ষায় প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ ও অর্পিত দায়িত্ব পালনে সক্ষমতা ও কার্যকারিতার দিকগুলো সুশাসনের দিক থেকে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ইতিপূর্বে টিআইবি পরিচালিত একটি গবেষণায় (২০০৮) অধিদপ্তরের মাঠপর্যায়ে বন ব্যবস্থাপনা অনিয়ম ও দুর্নীতির চিত্র প্রতিফলিত হয় এবং এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমান গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য বন অধিদপ্তরের কার্যক্রমে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা এবং এসব চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণে সুপারিশ প্রস্তাব করা। এ ছাড়া গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো হলো–

- বন অধিদপ্তরের আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা এবং চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা;
- বন অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকাণ্ডে অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন, মাত্রা ও কারণ চিহ্নিত করা এবং
- বন অধিদপ্তরের সুশাসনের চ্যালেঞ্জ উত্তরণে সুপারিশ প্রস্তাব করা।

গবেষণাপদ্ধতি

এটি একটি গুণগত গবেষণা, তবে প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংখ্যাগত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে গবেষণার প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তবে গবেষণা প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ তথ্য, পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্য মূলত প্রত্যক্ষ উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের মোট ৬০টি কার্যালয়ের ওপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। মাঠপর্যায়ের কার্যালয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে মূলত দুটি বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে। যথা বাস্তুসংস্থানিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বনের প্রকারভেদ এবং সংশ্লিষ্ট এলাকায় অবস্থিত বন অধিদপ্তরের কার্যালয়গুলোর ধরন, যেমন প্রধান বন সংরক্ষকের দপ্তর/সদর দপ্তর, বন সংরক্ষকের দপ্তর, বিভাগীয় বন কর্মকর্তার দপ্তর, রেঞ্জ অফিস, বিট অফিস, ফাঁড়ি/ ক্যাম্প ও চেক স্টেশন। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে দেশের চার ধরনের বনাঞ্চলই অন্তর্ভুক্ত। উল্লেখ্য, দেশের বনভূমির অবস্থান ও বৈচিত্র্যগত গুরুত্ব বিবেচনায় চার ধরনের বন/বনাঞ্চল রয়েছে, যথা : ১. ক্রান্তিয় চিরসবুজ বন বা পাহাড়ি বন। ২. ক্রান্তিয় আর্দ্র পাতাঝরা বন বা শালবন। ৩. প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন বা সুন্দরবন। ৪. সৃজিত ম্যানগ্রোভ বন বা সৃজিত উপকূলীয় বন।

তথ্য সংগ্রহপদ্ধতি

গুণগত তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ব্যবহার করে গবেষণার তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই করা হয়েছে। গবেষণায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ বন অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী

(কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত), গবেষক, বিশেষজ্ঞ ও গণমাধ্যমকর্মীদের কাছ থেকে মোট ১৩০ জন মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। বনে বসবাসরত আদিবাসী, বননির্ভর স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও বনায়ন প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সঙ্গে ছয়টি দলগত আলোচনা করা হয়েছে। প্রধান বন সংরক্ষকের কার্যালয়সহ ৬০টি কার্যালয়কে গবেষণায় সরেজমিন পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। তা ছাড়া বন আইন, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট, দাপ্তরিক নথি, গবেষণা প্রতিবেদন, প্রবন্ধ, সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদন ও ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বিভিন্ন নথি পর্যালোচনা করা হয়েছে। ২০১৯ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২০ নভেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে গবেষণার তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই করা হয়েছে।

বিশ্লেষণ কাঠামো

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য সুশাসনের ছয়টি নির্দেশকের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সুশাসনের নির্দেশক এবং উপনির্দেশকগুলো নিচের সারণিতে উল্লেখ করা হলো :

সারণি ১ : সুশাসনের নির্দেশক ও উপনির্দেশক

গবেষণায় ব্যবহৃত নির্দেশক	উপনির্দেশক
সক্ষমতা	• **আইনি :** সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি
	• **প্রাতিষ্ঠানিক :** আর্থিক ব্যবস্থাপনা, অবকাঠামো, লজিস্টিকস, আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর বন ব্যবস্থাপনা ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা
স্বচ্ছতা	• তথ্যের উন্মুক্ততা, স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ও প্রচার
জবাবদিহি	• তদারকি, পরিবীক্ষণ, নিরীক্ষা ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনা
অংশগ্রহণ	• বনসংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে বনজীবী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি
সুরক্ষা	• বনভূমি সুরক্ষা ও জবরদখলকৃত ভূমি পুনরুদ্ধার
দুর্নীতি ও অনিয়ম	• দুর্নীতি ও অনিয়মের ক্ষেত্র, ধরন ও মাত্রা

তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা

এই প্রতিবেদনে ব্যবহৃত তথ্য, পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্য যাচাই-বাছাই করা হয়েছে। তথ্যের ধারাবাহিকতা, সত্যতা এবং নির্ভরযোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য একই তথ্য একাধিক উৎস ও বন অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায় থেকে গুণবাচক তথ্য সংগ্রহের বিভিন্ন পদ্ধতি সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে। এ ছাড়া পরোক্ষ তথ্যের যথার্থতা যাচাই করার জন্যও বিভিন্ন পর্যায়ে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিবেদনে ব্যবহৃত তথ্য, পর্যবেক্ষণ, মন্তব্য বন অধিদপ্তর ও অন্যান্য অংশীজনের সব পর্যায়ে ও সবার ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়।

গবেষণার ফলাফল

আইনি সক্ষমতা পর্যবেক্ষণ

বন আইন ১৯২৭ : প্রায় ৯৩ বছরের পুরোনো এই আইনে বনের সংজ্ঞা, বনের ধরন, বন সংরক্ষণ-প্রক্রিয়া ও উন্নয়নকাজে বনের জমি ব্যবহার ও বরাদ্দ প্রদান বিষয়ে কিছু উল্লেখ নেই। এ-সংক্রান্ত বিধিমালাও অনুপস্থিত। সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা সংরক্ষিত বনের মর্যাদা রহিতকরণের সুযোগ (ধারা ২৭) রাখা হলেও এ ক্ষেত্রে বন অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি গ্রহণ ও কী প্রক্রিয়ায় রহিত করা হবে তা আইনে অনুপস্থিত; ঢালাওভাবে বনভূমি ব্যবহারের সুযোগ বিদ্যমান। বনভূমির ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় রূপরেখা থাকলেও অবক্ষয়িত ও বেদখলকৃত বন পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া সম্পর্কে আইনে কিছু উল্লেখ নেই এবং এ-সংক্রান্ত বিধিও নেই। বিক্ষিপ্তভাবে বন মামলার কার্যক্রম পরিচালনা করা হলেও এ-সংক্রান্ত আইনের কার্যকর প্রয়োগে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনাসহ বিধিমালা অনুপস্থিত। প্রতিবেশী দেশগুলো বন আইনের ঘাটতি পূরণে সম্পূরক আইন প্রণয়ন করলেও বাংলাদেশের ক্ষেত্রে, যেমন বন সংরক্ষণ আইন, বন অধিকার আইন ইত্যাদি করা হয়নি।

বন্য প্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন ২০১২ : সংকটাপন্ন ও বিপন্ন বন্য প্রাণীর প্রতিবেশ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে ও তা সুরক্ষায় কী করা হবে তা আইনে উল্লেখ নেই এবং এ-সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করার কোনো বিধানও রাখা হয়নি। অপরাধ সংঘটনকালে কিংবা অপরাধের সঙ্গে জড়িত থাকার প্রমাণ/আলামত থাকা সত্ত্বেও আদালতের অনুমতি ছাড়া কাউকে ঘটনাস্থল থেকে তাৎক্ষণিকভাবে আটক করার ক্ষমতা বন অধিদপ্তরের নেই। বন্য প্রাণী হত্যা, চুরি ও চোরাচালানের ঘটনার তদন্ত কে করবে তা-ও আইনটিতে উল্লেখ নেই। এ ছাড়া বন্য প্রাণীর অভয়ারণ্য হিসেবে ঘোষিত বনগুলোতে বিনা অনুমোতিতে প্রবেশ বা অবস্থানের নিষেধাজ্ঞা (ধারা ১৫) অমান্য করার শাস্তির বিষয়ে কিছু উল্লেখ নেই। উল্লেখ্য, ১৯৭৪ সালের বন্য প্রাণী আইনে প্রদত্ত বিনা পরোয়ানায় আটকের ক্ষমতা এই আইনে (২০১২) রহিত করা হয়েছে।

করাত-কল (লাইসেন্স) বিধিমালা ২০১২ : বিধি ৭(ক)– এ পৌর এলাকায় করাত-কল স্থাপন ও পরিচালনার সুযোগ থাকায় সংরক্ষিত বনের পাশ বা মধ্যে অবস্থিত পৌর এলাকায় করাত-কল স্থাপন করে সংরক্ষিত ও রক্ষিত বনের গাছ চুরির ঝুঁকি বাড়িয়ে দিয়েছে। এ ছাড়া করাত-কল (লাইসেন্স) বিধিমালা ২০১২-এর বিধি ১২ অনুযায়ী শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে বিধান লঙ্ঘনকারীকে অনধিক তিন বছরের কারাদণ্ড ও এর অতিরিক্ত ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত দণ্ড বা উভয় দণ্ডের বিধান বন ও পরিবেশের ক্ষতির তুলনায় নগণ্য।

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা

রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ও আর্থিক বরাদ্দ : বন খাত থেকে বছরে প্রায় ১০০ কোটি টাকা রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দেওয়া হয়। এই লক্ষ্যমাত্রা বন রক্ষায় অন্যতম একটি অন্তরায় এবং ক্ষেত্রবিশেষে রাজস্ব সংগ্রহকেন্দ্রিক দুর্নীতি-অনিয়মের সুযোগ ও ঝুঁকি সৃষ্টি হয়। রাজস্ব আহরণের নামে বনকর্মীদের একাংশ কর্তৃক নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য দুর্নীতিতে, যথা- প্রাকৃতিক বন কেটে সামাজিক বনায়ন, রাবার বাগান তৈরি, ইকো-ট্যুরিজম, ইজারা প্রদান, জমি লিজ, কাঠ

বিক্রি ইত্যাদিতে জড়িয়ে পড়ার অভিযোগ রয়েছে। কাঠ বিক্রির মাধ্যমে অধিক রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে দ্রুত বর্ধনশীল কিন্তু প্রাকৃতিক বন এবং স্থানীয় পরিবেশ ও প্রতিবেশের জন্য ক্ষতিকর বৃক্ষ দ্বারা বনায়ন করা হয়। বনায়ন বন অধিদপ্তরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হওয়া সত্ত্বেও এতে অগ্রাধিকারমূলক বরাদ্দ অনুপস্থিত, যেমন বাগান সৃজন বা বনায়নকাজে গাছপ্রতি বরাদ্দ বর্তমানে ১৭ টাকা অথচ এই কাজে ন্যূনতম ২৫-৩০ টাকা বরাদ্দ করা প্রয়োজন। বন মামলার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পৃথক বাজেট বরাদ্দ নেই; রিটেইনার ফি বাবদ (আইনজীবীদের ভাতা) ন্যূনতম বরাদ্দ নেই। উল্লেখ্য, নিম্ন আদালতে মামলার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অর্ধদিবস, পূর্ণদিবস ও মাসিক ফি যথাক্রমে ১২৫, ২৫০ ও ১ হাজার ৫০০ টাকা বরাদ্দ, যা বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়।

অবকাঠামো ও লজিস্টিকস : বন অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ক্ষেত্রে অবকাঠামোগত ও লজিস্টিকস ঘাটতি রয়েছে। মাঠপর্যায়ের কার্যালয়গুলোয় অত্যাবশ্যক অবকাঠামো, যেমন দাপ্তরিক কাজ সম্পাদনের জন্য কক্ষ, বসার জায়গা ও আসবাবের সংকটের কারণে ক্ষেত্রবিশেষে প্রায় পরিত্যক্ত ভবন বা ঘরে বনকর্মীরা দাপ্তরিক কাজ সম্পাদন করেন। জব্দ ও উদ্ধারকৃত বনজসম্পদ এবং বন মামলার আলামত সংরক্ষণের জন্য নিজস্ব সংরক্ষণাগার নেই। ফলে জব্দ ও উদ্ধারকৃত গাছ এবং কাঠ অনির্দিষ্টকাল উন্মুক্ত স্থানে ফেলে রাখায় তা নষ্ট হয়ে সরকারের আর্থিক ক্ষতির উদাহরণ রয়েছে। মাঠ কার্যালয়গুলোয় প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস সুবিধা, যেমন কম্পিউটার, প্রিন্টার, ফটোকপিয়ার ও ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগের ঘাটতি রয়েছে। প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস ঘাটতির কারণে দপ্তরের বাইরে থেকে কম্পোজ, প্রিন্ট ও ফটোকপি করায় দাপ্তরিক গোপনীয় তথ্য ও নথি ফাঁস হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।

আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর বন ব্যবস্থাপনা : বনায়ন, বনভূমি সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পরিচালনার লক্ষ্যে জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেম (জিআইএস) ভিত্তিক প্রযুক্তির ব্যবহার সম্প্রসারণ করা হয়নি, যেমন সার্ভিলেন্স ড্রোন, ট্র্যাকিং ডিভাইস, গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম (জিপিএস), স্যাটেলাইট ইমেজ, ইত্যাদির ঘাটতি রয়েছে। বনভূমির জমির দলিল, রেকর্ডপত্র ও মানচিত্র, মামলার আলামত ইত্যাদি এখনো সনাতন পদ্ধতিতে (পেপারভিত্তিক) সংরক্ষণ করায় সেগুলো বিনষ্ট, চুরি ও হারিয়ে যাওয়ায় বনভূমি জবরদখলের ঝুঁকি বা সুযোগ তৈরি হয়েছে। এ ছাড়া রেঞ্জ ও অধস্তন কার্যালয়গুলোর কর্মীদের বেতন-ভাতা ও সব প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ অনলাইন বা মোবাইল ব্যাংকিংভিত্তিক না হওয়ায় নগদে অর্থ প্রদানকালে বণ্টনকারী কর্তৃক বিধিবহির্ভূতভাবে রেখে দেওয়ার সুযোগ থাকে। এ ছাড়া বনায়ন ও বন সংরক্ষণ কর্মকাণ্ড তদারকি ও পরিবীক্ষণে আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ না হওয়ায় মাঠপর্যায়ে প্রায় বনকেন্দ্রিক অপরাধ তাৎক্ষণিকভাবে বন কর্তৃপক্ষের নজরে আসে না কিংবা কর্মীদের একাংশ তা এড়িয়ে যায়।

মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা : বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় আধুনিক প্রযুক্তির (যেমন রিমোট সেনসিং) ব্যবহারকে প্রাধান্য দিয়ে অধিদপ্তরের সার্বিক জনবলকাঠামো পুনর্বিন্যাসসংক্রান্ত উদ্যোগের অনুপস্থিতি রয়েছে। ফলে বিজ্ঞানভিত্তিক বন ব্যবস্থাপনা চালুর বিষয়ে অধিদপ্তরের একাংশের

মধ্যে, বিশেষকরে মাঠপর্যায়ের কর্মীদের চাকরি হারানো ভীতির পাশাপাশি নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে উদ্যোগ ও জবাবদিহির ঘাটতি বিদ্যমান। গতানুগতিক বন ব্যবস্থাপনাকে (যথা বন টহল) বিবেচনায় নিয়ে বিদ্যমান জনবলের (১০,৩২৭টি) প্রায় ৪২ শতাংশ বৃদ্ধিসহ অধিদপ্তরের জন্য নতুন সাংগঠনিক কাঠামো (১৭,৮২০টি) অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাবিত সাংগঠনিক ও জনবলকাঠামো অনুমোদন করা হলে বাংলাদেশে বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় গুণগত কোনো পরিবর্তন না হওয়া এবং বনকেন্দ্রিক দুর্নীতি ও রাষ্ট্রীয় অর্থ অপচয়ের ঘটনা অব্যাহত থাকার ঝুঁকি রয়েছে। এভাবে সনাতন পদ্ধতিতে মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনায় উচ্চ ব্যয়, বনকেন্দ্রিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির উচ্চঝুঁকি ও সুযোগ বিদ্যমান। প্রতিবেশী দেশ ভারতসহ উন্নত দেশের মতো বিজ্ঞানভিত্তিক (যেমন রিমোট সেনসিংয়ের কার্যকর প্রয়োগ) বন ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন ও তা কার্যকর করা গেলে মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনায় ব্যয় ও বনকেন্দ্রিক প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি হ্রাসের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

স্বচ্ছতা

তথ্যের উন্মুক্ততা, স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ও প্রচার : তথ্যের উন্মুক্ততা ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ঘাটতি বিরাজমান। সংরক্ষিত বনভূমির জমি বৃহৎ প্রকল্পসহ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও সামরিক স্থাপনা নির্মাণে ব্যবহারের অনুমতি বা সম্মতি প্রদান-সম্পর্কিত বন অধিদপ্তরের অবস্থান ও মতামতসংক্রান্ত নথি ওয়েবসাইটে উন্মুক্ত করা হয় না। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাকে দেওয়া ও জবরদখল হওয়া বনভূমির পরিমাণের ওপর মাঠ জরিপভিত্তিক হালনাগাদ তথ্য সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত নেই। ওয়েবসাইটে পূর্ণাঙ্গ বাজেট ও অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ৩২টি উন্নয়ন প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ তথ্য অনুপস্থিত। প্রতিবছর বনভূমির কী পরিমাণ জমি জবরদখল হচ্ছে, কোথায় হচ্ছে ও কারা করছে, তা প্রকাশ করা হয় না। রেঞ্জ, বিট, চেক স্টেশন, ফাঁড়ি, ক্যাম্প ইত্যাদি কার্যালয়ে নাগরিক সনদ প্রদর্শন করা নেই। প্রধান বন সংরক্ষক, বন সংরক্ষক ও বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়-সম্পর্কিত নাগরিক সনদ ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হলেও এসবে বিকল্প তথ্য কর্মকর্তার নাম ও যোগাযোগের মাধ্যম উল্লেখ করা নেই। প্রকল্প এলাকায় প্রকল্পের ব্যয়, বাস্তবায়নকাল, অভিযোগ গ্রহণকারীর নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর প্রদর্শন করা নেই।

জবাবদিহি

তদারকি ও পরিবীক্ষণ : মাঠপর্যায়ের সব স্তরের কার্যালয়ের কর্মকাণ্ড তদারকি ও পরিবীক্ষণে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাসহ আধুনিক প্রযুক্তি না থাকায় তদারকি ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রম নানাভাবে ব্যাহত হয়। ফলে বর্তমানে শুধু প্ল্যান্টেশন বা সৃজিত বাগানসংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ড নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত (যত দিন পর্যন্ত প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ থাকে) পরিবীক্ষণ করা হয়। রেঞ্জ ও বিট পর্যায়ে কোথায় কী হচ্ছে তা বিভাগীয় বন কর্মকর্তাকে (ডিএফও) নিয়মিতভাবে অবহিতকরণের কোনো ব্যবস্থা নেই। শুধু অভিযোগ উঠলে সংশ্লিষ্ট বন সংরক্ষক ও ডিএফও কর্তৃক তা আমলে নেওয়া হয়। এ ছাড়া প্রত্যন্ত ও দুর্গম এলাকায় প্রকল্পের কর্মকাণ্ড অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরেজমিনে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা হয় না এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগ তদন্ত প্রতিবেদনে প্রকৃত চিত্র প্রতিফলিত না হওয়ার

অভিযোগ রয়েছে। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, একটি বিট এলাকায় বন সৃজন প্রকল্পের বনায়নের কাজ এক-তৃতীয়াংশও যথাযথভাবে সম্পন্ন করা না হলেও জরিপ প্রতিবেদনে ৮০ শতাংশের অধিক হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তা ছাড়া তদারকি ও পরিবীক্ষণ কর্মকর্তাদের একাংশের দুর্নীতির অভিযোগ আমলে নেওয়ার উদাহরণ বিরল।

নিরীক্ষা : মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (সিএজি) কার্যালয় কর্তৃক অধিদপ্তরের ওপর গতানুগতিক নিরীক্ষা সম্পন্ন করা হয় এবং সদর দপ্তর থেকে বিভাগীয় বন কার্যালয় পর্যন্ত নথি পর্যালোচনাভিত্তিক নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সিএজির কিছু পর্যবেক্ষণ ও আপত্তির ধরনে দেখা যায়, বিক্রীত গাছের প্রকৃত সংখ্যা নিরূপণ না করায় আর্থিক ক্ষতি, অনাদায়ী টাকা, মূল্য সংযোজন কর ধার্য ও কর্তন না করা, অর্থ অপচয় ইত্যাদি আপত্তি উঠে এলেও তা আমলে নিয়ে যথাযথ তদন্ত সাপেক্ষে বিভাগীয় শাস্তি প্রদানের দৃষ্টান্ত বিরল। এ ছাড়া সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯ মোতাবেক সব বনকর্মীর নিজস্ব ও পরিবারের অন্য সদস্যদের বার্ষিক আয় ও সম্পদের বিবরণী বছর শেষে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেওয়া বা প্রকাশ করা হয় না।

> “নিরীক্ষা দলের সদস্যদের বন অধিদপ্তরের মতো একটি বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানের ওপর নিরীক্ষা করার মতো কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতার অভাব লক্ষ করা যায়। একটি অর্থবছরে কী পরিমাণ গাছ লাগানো হয়েছে; রেঞ্জ ও বিটভিত্তিক জবরদখল হওয়া বনভূমির পরিমাণ ও জবরদখলকারী ইত্যাদি বিষয়ের ওপর পর্যবেক্ষণ নিরীক্ষা প্রতিবেদনে থাকে না। সনাতন নিরীক্ষা পদ্ধতি দাপ্তরিক নথি পর্যালোচনাভিত্তিক হওয়ায় তা দ্বারা বনায়ন ও বন সংরক্ষণ কর্মকাণ্ডের গুণগত মানের প্রকৃত চিত্র তুলে আনা সম্ভব নয়। বনায়ন ও বন সংরক্ষণ কর্মকাণ্ডের প্রকৃত নিরীক্ষার জন্য নিয়মিত ও বাধ্যতামূলকভাবে “ফরেস্ট্রি পারফরম্যান্স অডিট” সম্পন্ন করা অত্যাবশ্যক।”
>
> *- একজন সাবেক প্রধান বন সংরক্ষকের মন্তব্য*

অভিযোগ ব্যবস্থাপনা : বন অধিদপ্তরের অভিযোগ ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন ঘাটতি বিদ্যমান। বনকর্মী ও অংশীজন থেকে বন অধিদপ্তর ও এর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অনলাইন, ফোন কল (ল্যান্ড ফোন) ও প্রচলিত পদ্ধতিতে (লিখিত ও সরাসরি) অভিযোগ গ্রহণ বা দাখিলের ব্যবস্থা থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা কাজ করছে না। এ ছাড়া অভিযোগ জানানোর প্রচলিত পদ্ধতি সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিতকরণে অধিদপ্তরের উদ্যোগের অভাব রয়েছে। অধিদপ্তরের একজন বা কোনো কর্মী অপর কর্মী সম্পর্কে অভিযোগ করলে ক্ষেত্রবিশেষে হয়রানির শিকার হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি হয়। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার কার্যালয়ে ডেকে নিয়ে দুর্ব্যবহার ও তিরস্কার করা, বেতন বৃদ্ধি (ইনক্রিমেন্ট) আটকানো এবং নির্দিষ্ট মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগে দুর্গম ও প্রত্যন্ত এলাকায় বদলি ইত্যাদির উদাহরণ রয়েছে। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ২০২০ সালের মে থেকে অক্টোবরের

মধ্যে বন সংরক্ষক ও বিভাগীয় বন কর্মকর্তাদের কাছে কোনো অভিযোগ জমা পড়েনি; ওই সময়ে আগের অনিষ্পন্ন ১৫৩টি অভিযোগের মধ্যে নিষ্পত্তি হয়েছে মাত্র ৬টি (৪ শতাংশ) অভিযোগ। তা ছাড়া গণশুনানির আয়োজন না করা এবং এ ব্যাপারে বন অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় ও মাঠপর্যায়ে উদ্যোগের ঘাটতি বিদ্যমান।

অংশগ্রহণ

বননির্ভর আদিবাসী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি : বন অধিদপ্তরের মাঠপর্যায়ের কর্মকাণ্ডে বননির্ভর আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে ঘাটতি বিদ্যমান। এ ক্ষেত্রে সামাজিক বনায়ন প্রকল্পে সুবিধাভোগী হিসেবে স্থানীয় বননির্ভর দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বঞ্চিত করে বনকর্মীদের একাংশের যোগসাজশে স্থানীয় প্রভাবশালীদের সুবিধাভোগী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়; 'কমিউনিটি ফরেস্ট ওয়ার্কার' হিসেবে প্রকৃত সুবিধাভোগী, বিশেষ করে ঐতিহ্যগতভাবে বনের জমিতে বসবাস ও কৃষি আবাদকারী ব্যক্তিদের সুযোগ দেওয়া হয় না। এ ছাড়া বনকর্মীদের একাংশ কর্তৃক নিজেদের ইচ্ছামাফিক সামাজিক বনায়নের উপকারভোগী হিসেবে বাছাই করার অভিযোগ রয়েছে।

> সম্প্রতি (১৪ সেপ্টেম্বর ২০২০) টাঙ্গাইল বন বিভাগ মধুপুর উপজেলার অরণখোলা মৌজায় একটি আদিবাসী পরিবারের বংশপরম্পরায় চাষাবাদকৃত জমি (৪০ শতক) থেকে জোরপূর্বক উচ্ছেদ কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। ওই উচ্ছেদ অভিযানের আগে সংশ্লিষ্ট চাষিকে অবহিত করা হয়নি। তবে স্থানীয় রাজনৈতিক ও প্রভাবশালীদের সঙ্গে বনকর্মীদের একাংশের বিধিবহির্ভূত লেনদেনের সম্পর্ক থাকায় একই মৌজায় প্রভাবশালীদের জবরদখলকৃত ভূমি পুনরুদ্ধারে অনুরূপ দৃষ্টান্ত নেই।

প্রাপ্ত তথ্য মতে, বননির্ভর আদিবাসীদের ঐতিহ্য ও প্রথাগত ভূমি অধিকার রক্ষায় পদক্ষেপ গ্রহণ না করা এবং ক্ষেত্রবিশেষে ভূমির অধিকার থেকে বঞ্চিত করার উদাহরণ রয়েছে। স্থানীয় বননির্ভর জনগোষ্ঠীর মতামত, পরামর্শ বা সম্মতি না নিয়ে সংরক্ষিত ও রক্ষিত বনাঞ্চল, জাতীয় উদ্যান, ইকোপার্ক ও বন্য প্রাণীর অভয়ারণ্য ইত্যাদি বাস্তবায়নের ফলে বননির্ভর জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্যগত অধিকারকে হরণ করা হচ্ছে। বনকর্মীদের একাংশ কর্তৃক অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহার ও ন্যায়সংগতভাবে তা প্রয়োগ না করার উদাহরণ রয়েছে। গবেষণার পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, ঐতিহ্যগতভাবে ভোগদখলকৃত ভূমি থেকে আদিবাসীদের জোরপূর্বক উৎখাত করা হয় এবং ক্ষেত্রবিশেষে হয়রানিমূলক মামলা করা ও জোর করে উচ্ছেদ করা হয়। বন অধিদপ্তর কর্তৃক বনবাসীদের বিরুদ্ধে কয়েক হাজার ভুয়া মামলা করার অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া বিকল্প কর্মসংস্থান ও আবাসনের ব্যবস্থা না করে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন, সেনানিবাস ও সামরিক স্থাপনা ইত্যাদি নির্মাণের লক্ষ্যে সরকারি বনের জমি বরাদ্দ প্রদান করায় বনে বসবাসরত আদিবাসী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে উচ্ছেদ করার অভিযোগ রয়েছে।

বন সুরক্ষা

সরকারি বনভূমি সুরক্ষা বন অধিদপ্তরের প্রধান দায়িত্ব হলেও তা পালনে প্রতিষ্ঠানটির সুস্পষ্ট ব্যর্থতা ও বিচ্যুতির সুনির্দিষ্ট উদাহরণ রয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, বন অধিদপ্তর কর্তৃক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হলে সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্যের জন্য ক্ষতিকারক হবে বলে চিঠি মারফতে উল্লেখ করলেও পরিবেশগত প্রভাব যাচাইয়ের (ইআইএ) পর বন অধিদপ্তর ওই প্রকল্পের আর বিরোধিতা করেনি। উল্লেখ্য, পরিবেশ অধিদপ্তরও প্রকল্পটি সম্পর্কে সুস্পষ্ট আপত্তি জানায়। এ ছাড়া ইউনেসকোর পর্যবেক্ষণ ও রামসার কনভেনশন মোতাবেক ইআইএ প্রতিবেদন ক্রটিপূর্ণ এবং সুন্দরবনের জন্য প্রকল্পটি ঝুঁকিপূর্ণ বলে চিহ্নিত হলেও বন অধিদপ্তর প্রকল্পটির বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান গ্রহণে ব্যর্থ হয়। তা ছাড়া বন্যহাতিসহ বন্য প্রাণীর অভয়ারণ্য ও জাতীয় উদ্যানগুলোর (যথা ডুলাহাজরা ও মেধাকচ্ছপিয়া) মধ্য দিয়ে দোহাজারী-গুণদুম রেলপথ নির্মাণ প্রকল্পে অধিদপ্তরের সম্মতি জ্ঞাপন সংস্থাটির ওপর অর্পিত ক্ষমতা ও দায়িত্বের সুস্পষ্ট লঙ্ঘনের উদাহরণ।

সরকারি বনভূমি সুরক্ষা বন অধিদপ্তরের প্রধান দায়িত্ব হলেও তা পালনে প্রতিষ্ঠানটির সুস্পষ্ট ব্যর্থতা ও বিচ্যুতির সুনির্দিষ্ট উদাহরণ রয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অধিদপ্তরের আইনি, প্রাতিষ্ঠানিক ও সক্ষমতা প্রয়োগ না করা, যেমন বনের জমিতে অবৈধ কার্যক্রম বন্ধে অভিযান পরিচালনা, মামলা দায়ের ইত্যাদি না করে শুধু লিখিত আপত্তি জানানোতে সীমাবদ্ধ থাকার অভিযোগ রয়েছে। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যমতে, কক্সবাজার জেলাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বনের অবৈধ স্থাপনায় সংশ্লিষ্ট বিভাগ কর্তৃক বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানির সংযোগ প্রদান; মহেশখালী ও মাতারবাড়ীতে কয়লাবিদ্যুৎ প্রকল্পসংলগ্ন উপকূলীয় শ্বাসমূলীয় বন, নদী ও সাগরে প্রকল্পের বর্জ্য ও মাটি ফেলা এবং পাহাড় কেটে প্রকল্পের জমি ভরাট করা হয়েছে; তা ছাড়া মহেশখালীতে ১৯২ একর সংরক্ষিত বনভূমির গাছ উজাড় করে অপরিশোধিত তেলের ডিপো ও পাইপলাইন স্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে বন বিভাগের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা বিভাগকে আপত্তি জানানোয় ঘাটতি রয়েছে। কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়ক নির্মাণকালে দুই হাজারের অধিক গর্জনগাছ কর্তনসহ ওই প্রকল্পে কাছের পাহাড় ও বনভূমির মাটি ব্যবহাররোধে অধিদপ্তর কর্তৃক কার্যকর পদক্ষেপের ঘাটতি ছিল। সাঙ্গু ও মাতামুহুরী সংরক্ষিত বনাঞ্চলের ভেতর দিয়ে সড়ক নির্মাণ; টাঙ্গাইলে শালবনের মধ্য দিয়ে গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন; রামগড়-সীতাকুণ্ড সংরক্ষিত বনের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন ইত্যাদি কার্যক্রম বন সুরক্ষার বিপরীতে বন ধ্বংসের উদাহরণ বিদ্যমান থাকলেও বন অধিদপ্তর এসব ক্ষেত্রে সক্রিয় নয়।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে বন অধিদপ্তর কর্তৃক শুধু লিখিতভাবে আপত্তি জানানোয় সীমাবদ্ধ থাকার অভিযোগ রয়েছে। ফলে এ পর্যন্ত বনভূমির প্রায় ১ লাখ ৬০ হাজার ২৪০ একর জমি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বরাদ্দ করে নিয়ে গেছে। মধুপুর উপজেলা শালবনের ভেতরে ৩০৫ একর এলাকাজুড়ে বিমানবাহিনীর ফায়ারিং রেঞ্জ স্থাপন করা হয়েছে। রামু ও রুমা উপজেলায় সেনানিবাস স্থাপন দ্বারা বন্য হাতির অভয়ারণ্য বিপন্ন করা হয়েছে এবং সীতাকুণ্ড ও মিরসরাই উপজেলার সংরক্ষিত

বন এবং সোনাদিয়া দ্বীপে বিশেষ রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল স্থাপন করার ফলে বন ও জীববৈচিত্র্য ধ্বংস ত্বরান্বিত হয়েছে।

বনভূমি পুনরুদ্ধার

২০১৯ সালের ডিসেম্বর অবধি মোট ২ লাখ ৮৭ হাজার ৪৫৩ একর বনভূমি জবরদখল করা হলেও অধিদপ্তর কর্তৃক সর্বশেষ পাঁচ বছরে মাত্র ৮ হাজার ৭৯২ একর (৩ শতাংশ) জবরদখলকৃত বনভূমি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। জবরদখলকৃত বনভূমি উদ্ধারের পরিমাণ কম হওয়ার পেছনে বন অধিদপ্তরের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বিভিন্ন কারণ রয়েছে। এ ক্ষেত্রে জমির দলিল ও নথিপত্র অধিদপ্তরের কাছে চূড়ান্ত অবস্থায় না থাকা ও উদ্যোগের অভাব ছিল। গবেষণার প্রাপ্ত তথ্য মতে, গাজীপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, কক্সবাজার ইত্যাদি জেলায় ক্ষেত্রবিশেষে প্রভাবশালী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের জবরদখলে থাকা বনভূমির জমি দখলমুক্তকরণ ও অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের একাংশ কর্তৃক প্রভাবশালীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ না করতে অধস্তনদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হয়। মাঠপর্যায়ের সংশ্লিষ্ট বন কার্যালয়গুলো কর্তৃক উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনার জন্য তৎপর না হয়ে শুধু লিখিত আপত্তি জানানোয় সীমাবদ্ধ থাকা এবং জবরদখলকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে শুধু চিঠি আদান-প্রদানে সীমাবদ্ধ থাকার উদাহরণ রয়েছে। তা ছাড়া বনকর্মী কর্তৃক অনৈতিক সুবিধা ও দুর্নীতির মাধ্যমে বনের জমিতে অর্থকরী ফসল আবাদ অব্যাহত রাখার সুযোগ প্রদান হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে জবরদখলকৃত ভূমি পুনরুদ্ধার ও অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে আইনপ্রণেতা, জনপ্রতিনিধি, প্রভাবশালী ব্যক্তিসহ জেলা প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর একাংশের সহায়তা না পাওয়া এবং বাধা ও চাপের সম্মুখীন হতে হয়।

দুর্নীতি ও অনিয়মের ক্ষেত্র, ধরন ও মাত্রা

ক্ষমতার অপব্যবহার : বিভিন্ন ক্ষেত্রে বনকর্মীদের একাংশের ক্ষমতার অপব্যবহার ও ন্যায়সংগত প্রয়োগে ঘাটতি বিদ্যমান। গবেষণার প্রাপ্ত তথ্যমতে, বদলি নীতিমালা উপেক্ষা করে বনকর্মীদের নিজ জেলায় বদলি ও পদায়ন করা হয়। বদলির আদেশ জারির পরও অনির্দিষ্টকাল একই কার্যালয়ে কর্মীদের রেখে দেওয়া হয়। গাজীপুর, টাঙ্গাইল, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার এবং তিনটি পার্বত্য জেলায় এ ধরনের দৃষ্টান্ত রয়েছে। জমির দাগ ও খতিয়ানে ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল তথ্য সংযোজন করে তা জবরদখলের সুযোগ প্রদানের উদাহরণ রয়েছে। গাজীপুর ও টাঙ্গাইল জেলার আওতাধীন সংরক্ষিত বনাঞ্চলে এসবের চর্চার আধিক্য দেখা গেছে। মধুপুর ও কালিয়াকৈর উপজেলার সংরক্ষিত বনের জমিতে জনসাধারণকে অর্থকরী ফসল আবাদের সুযোগ দিয়ে বছরভিত্তিক বিধিবহির্ভূতভাবে একরপ্রতি ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত আদায় করার অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া অবৈধ বনজসম্পদ পরিবহনে বাধার সৃষ্টি, আটক ও জব্দ না করতে অধস্তন বনকর্মীদের নির্দেশ প্রদান এবং তা অমান্য করলে অন্যত্র বদলিসহ চাকরিতে হয়রানির অভিযোগ রয়েছে।

যোগসাজশ : বনকেন্দ্রিক দুর্নীতি ও অনিয়মের সঙ্গে বনকর্মীদের একাংশের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ততার অভিযোগ রয়েছে। স্থানীয় ভূমি অফিস, সেটেলমেন্ট ও সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের কর্মী ও বনকর্মীদের একাংশের যোগসাজশে ভুয়া দলিল ও নথি তৈরি এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামে রেকর্ডভুক্তির উদাহরণ রয়েছে। সামাজিক বনের প্লট তৈরিতে প্রাকৃতিক বন (শাল, গর্জন ও গজারি) স্থায়ীভাবে উজাড় ও তা দখলের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। সরকারি বনভূমির সীমানা থেকে ন্যূনতম ১০ কিলোমিটারের মধ্যে করাত-কল স্থাপন ও পরিচালনার ওপর নিষেধাজ্ঞা (ধারা ৭ক, করাত-কল লাইসেন্স বিধিমালা ২০১২) উপেক্ষা করে করাত-কল স্থাপন অব্যাহত রয়েছে। সখীপুর ও ঘাটাইল উপজেলার আওতাধীন সংরক্ষিত বনে যথাক্রমে প্রায় অর্ধশতাধিক ও শতাধিক অবৈধ করাত-কলের অস্তিত্ব থাকলেও অধিদপ্তর কর্তৃক তা উচ্ছেদে কার্যকর পদক্ষেপের ঘাটতি বিদ্যমান। তাছাড়া বনকর্মীদের একাংশের বিরুদ্ধে অবৈধ বনজসম্পদ, যেমন বাঘ, কুমির, হরিণের মাংস, কাঠ ইত্যাদি আটক করার পরও পাচারকারীদের ক্ষেত্রবিশেষে গোপনে ছেড়ে দেওয়া কিংবা আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ না করার অভিযোগ রয়েছে।

বিধিবহির্ভূত আর্থিক লেনদেন : গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণে বন অধিদপ্তরের বিভিন্ন নিয়োগ, পদোন্নতি ও বদলি বা পদায়নের একাংশের ক্ষেত্রে বিধিবহির্ভূত অর্থ লেনদেনের তথ্য পাওয়া গেছে। উল্লেখ্য, পদ, কর্মএলাকা, বিশেষ করে অবৈধভাবে বনজসম্পদ বিক্রি করার সুযোগ ও জমির উচ্চমূল্য ইত্যাদি বিবেচনায় 'আর্থিকভাবে লোভনীয়' এলাকায় বদলির জন্য বনকর্মীদের একাংশের মধ্যে দর-কষাকষি ও উচ্চপর্যায়ে প্রভাব বিস্তারের সক্ষমতাভেদে অবৈধ অর্থের লেনদেনের পরিমাণে তারতম্য হয় (সারণি ২)।

সারণি ২ : নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি বা পদায়নে বিধিবহির্ভূতভাবে অর্থ লেনদেন

পদ*	লেনদেনের ক্ষেত্র	টাকার পরিমাণ	অর্থের গ্রহীতা
প্রধান বন সংরক্ষক	পদোন্নতি দ্বারা নিয়োগ	১-৩ কোটি	মন্ত্রণালয়ের নীতিনির্ধারক ও ব্যক্তিগত সহকারী এবং উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের একাংশ
বন সংরক্ষক	নিয়োগ ও বদলি	২০-২৫ লাখ	
বিভাগীয় বন কর্মকর্তা	পদোন্নতি বা বদলি	১০ লাখ-১ কোটি	
প্রকল্প পরিচালক	নিয়োগ বা পদায়ন	১- ১.৫ কোটি	
সহকারী বন সংরক্ষক	বদলি	১ - ৫ লাখ	
রেঞ্জ কর্মকর্তা	বদলি	৫ - ১০ লাখ	প্রধান বন সংরক্ষকের দপ্তর, আঞ্চলিক ও বিভাগীয় বন কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশ
চেক স্টেশন ইন-চার্জ	বদলি	১০ - ২৫ লাখ	
ফরেস্টার	বদলি	১০ - ২৫ লাখ	
বিট কর্মকর্তা	বদলি	২ - ৫ লাখ	
বন প্রহরী	বদলি	০.৫ - ২.৫ লাখ	

**প্রদত্ত তথ্য সব পদ, কর্মী ও সব সময়ের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য নয়*

সামাজিক বনায়ন কর্মসূচির বিভিন্ন ক্ষেত্রেও বনকর্মীদের একাংশ কর্তৃক বিধিবহির্ভূত অর্থ আদায় করা হয়। গবেষণার তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, সামাজিক বনায়নের সুবিধাভোগী হিসেবে তালিকাভুক্তি ও প্রকল্পের আওতায় সামাজিক বনায়নের প্লট প্রাপ্তিতে ক্ষেত্রবিশেষে তিন থেকে পাঁচ হাজার টাকা, নথিপত্রে স্থানীয় ভূমিহীনদের না দেখিয়ে বাস্তবে প্রভাবশালীদের সামাজিক বনায়নের প্লট বরাদ্দে ৫০ থেকে ৬০ হাজার টাকা সংশ্লিষ্ট বনকর্মী কর্তৃক আদায় করা হয়।

অর্থ আত্মসাৎ : প্রকল্পের কাজ আংশিক সমাপ্ত করেও ঠিকাদার কর্তৃক পুরো বিল তুলে নিয়ে তা আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া নীতিনির্ধারকদের একাংশ কর্তৃক বন প্রকল্পের অর্থ আত্মসাতে সম্পৃক্ত থাকারও অভিযোগ রয়েছে। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যমতে, বন অধিদপ্তরের মাঠপর্যায়ের একজন কর্মকর্তা সাবেক একজন মন্ত্রীর নির্দেশে একটি বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের পুরো বিল (অসমাপ্ত কাজের বিলসহ) ঠিকাদারকে প্রদানে বাধ্য হন এবং পরে চাপের মুখে ওই কর্মকর্তা চাকরি থেকে অব্যাহতি গ্রহণ করেন। তা ছাড়া 'আর্থিকভাবে লোভনীয়' বিট, চেক স্টেশন, ফাঁড়ি ও ক্যাম্প পর্যায়ের কর্মীদের বেতন সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ কর্মকর্তা কর্তৃক নগদে বণ্টনকালে রেঞ্জ ও ডিএফওর 'মাসিক খরচ' হিসেবে কার্যালয় প্রতি ৫-১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত কেটে রাখা হয়। ডিএফওর হিসাব শাখা কর্তৃক ক্ষেত্রবিশেষে বনকর্মীদের দ্বারা উত্তোলিত ভ্রমণ বিল প্রতি ২০০ থেকে ৫০০ টাকা এবং মোটরযানের মেরামত ও জ্বালানি বাবদ নগদ উত্তোলিত টাকার ৫০ শতাংশ পর্যন্ত কেটে রাখার অভিযোগ রয়েছে।

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

বন আইনের (১৯২৭) কার্যকর প্রয়োগে প্রয়োজনীয় বিধিমালা, সম্পূরক আইন ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং ৯৩ বছরের পুরোনো বন আইনটি আমূল সংস্কারের জন্য কার্যকর উদ্যোগ অনুপস্থিত। বননির্ভর আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রথাগত ভূমি অধিকারহরণ, বন আইন লঙ্ঘন করে ও একতরফাভাবে সংরক্ষিত বন, বন্য প্রাণীর অভয়ারণ্য, জাতীয় উদ্যান ঘোষণাসহ জবরদখল উচ্ছেদের নামে অধিদপ্তরের বৈষম্যমূলকভাবে ক্ষমতা চর্চার সাম্প্রতিক উদাহরণ রয়েছে। সংরক্ষিত বনভূমির চারপাশে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পসহ বৃহৎ প্রকল্প গ্রহণ, বনের জমি অবৈধ দখল, বনভূমির জমি বিভিন্ন উন্নয়নকাজে বরাদ্দ এবং বনের স্থায়ী ক্ষতিরোধে বন অধিদপ্তরের নিষ্ক্রিয় ভূমিকা লক্ষ করা যায়। বন সংরক্ষণ কার্যক্রমকে কম অগ্রাধিকার প্রদান, বননির্ভর রাজস্ব ও আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডের সম্প্রসারণ রোধে অধিদপ্তরের কার্যকর পদক্ষেপের ঘাটতি রয়েছে। বনায়ন, বনভূমি সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পরিচালনার লক্ষ্যে আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ করা হয়নি। এ ছাড়া বৃক্ষশূন্য প্রাকৃতিক বনের পুনঃবনায়নের জন্য অগ্রাধিকারমূলক বরাদ্দ, অবকাঠামো, লজিস্টিকস ও আধুনিক প্রযুক্তির ঘাটতি এবং এ ব্যাপারে যথোপযুক্ত ও কার্যকর উদ্যোগের অভাব লক্ষ করা যায়। অধিদপ্তরের কর্মকাণ্ডসহ রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্য অর্জন, বন সংরক্ষণ ও বনায়নকে কেন্দ্র করে দুর্নীতির বিস্তার এবং তা প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপের ঘাটতি বিদ্যমান। সর্বোপরি, বন অধিদপ্তরের সব স্তরের কর্মকাণ্ড কার্যকর তদারকি, পরিবীক্ষণ

ও 'ফরেস্ট্রি পারফরম্যান্স অডিট' অনুপস্থিতির ফলে বন খাতকেন্দ্রিক দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হয়েছে বলে গবেষণায় প্রতীয়মান হয়।

সুপারিশ

আধুনিক প্রযুক্তিভিত্তিক বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনাকে অগ্রাধিকার দিয়ে বন অধিদপ্তরকে একটি সক্ষম ও কার্যকর প্রতিষ্ঠানে রূপদানের লক্ষ্যে টিআইবি নিচের সুপারিশমালা প্রস্তাব করছে :

১. রাষ্ট্রীয় অতীব জরুরি প্রয়োজনে বনভূমি ব্যবহার ও ডি-রিজার্ভের আগে বন অধিদপ্তরের অনুমতি গ্রহণ, ত্রুটিমুক্ত ইআইএ সম্পন্নকরণ ও সমপরিমাণ ভূমিতে প্রতিবেশবান্ধব বনায়নে 'কমপেনসেটরি এফরেস্টেশনের বিধি' প্রণয়ন করতে হবে।

২. বন আইনের আমূল সংস্কার করে যুগোপযোগী করতে হবে। আদিবাসীদের প্রথাগত ভূমি অধিকার নিশ্চিতকরণসহ জন অংশগ্রহণমূলক বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বন অধিদপ্তরের দায়িত্ব বিধিবদ্ধভাবে নির্ধারণ করতে হবে।

৩. বন খাত থেকে রাজস্ব সংগ্রহ অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে; প্রাকৃতিক বনের বাণিজ্যিকায়ন সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করতে হবে।

৪. ইতিমধ্যে অবক্ষয়িত প্রাকৃতিক বনের জমিতে সৃজিত সামাজিক বনের গাছ না কেটে মেয়াদোত্তীর্ণ বনের উপকারভোগীদের মুনাফা প্রদানসহ ওই বন প্রাকৃতিক বনে রূপান্তরের লক্ষ্যে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৫. অবক্ষয়িত প্রাকৃতিক বন ও বৃক্ষশূন্য জমিতে, যেমন নতুন চর ও সড়ক-মহাসড়কের পার্শ্ববর্তী এলাকায় পরিবেশ ও প্রতিবেশবান্ধব বন সৃজন করতে হবে।

৬. বন ব্যবস্থাপনায় সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও কার্যকর ব্যবহার করতে হবে; অত্যাধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর বন সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনাকে প্রাধান্য দিয়ে অধিদপ্তরের সার্বিক প্রশাসনিক ও জনবলকাঠামো পুরোপুরি ঢেলে সাজাতে হবে।

৭. বনকর্মীদের মাঠপর্যায়ে সার্কেল, বিভাগভিত্তিক বাধ্যতামূলক ও পালাক্রমিক বদলির বিধান প্রবর্তন এবং এর যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিতকরণে কার্যকর জবাবদিহির ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৮. যথাযথ চাহিদা নিরূপণ সাপেক্ষে সব পর্যায়ের বন কার্যালয়ের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক বরাদ্দ, পর্যাপ্ত অবকাঠামো, কারিগরি ও লজিস্টিকস সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।

৯. মাঠপর্যায়ের সব স্তরের কার্যালয়ে অর্থ বণ্টন ও লেনদেন অনলাইন বা মোবাইল ব্যাংকিংভিত্তিক করতে হবে। এর পাশাপাশি বিট ও অধস্তন কর্মীদের বেতন-ভাতা সংশ্লিষ্ট কর্মীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি প্রেরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

১০. সিএস রেকর্ডকে ভিত্তি ধরে সরকারি বনের সীমানা চিহ্নিত করতে হবে এবং এখন পর্যন্ত

কী পরিমাণ বনভূমি জবরদখল হয়েছে তার ওপর বস্তুনিষ্ঠ তথ্যভান্ডার তৈরি ও তা উদ্ধারে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১১. বন সংরক্ষণ কার্যক্রম তদারকি ও পরিবীক্ষণে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও এর কার্যকর ব্যবহার করতে হবে; ডিএফও ও বন সংরক্ষককে অধীন কার্যালয়ের কর্মকাণ্ড নিয়মিতভাবে অবহিতকরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

১২. বন অধিদপ্তরের বনায়ন ও বন সংরক্ষণ কার্যক্রম নিরীক্ষায় পারফরম্যান্স অডিট ব্যবস্থা প্রবর্তন ও এর কার্যকর চর্চা নিশ্চিত করতে হবে।

১৩. ওয়েবসাইটকে আরও তথ্যবহুল (যেমন নিরীক্ষা প্রতিবেদন, পূর্ণাঙ্গ বাজেট, প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ তথ্য, বিভিন্ন সংস্থাকে বরাদ্দকৃত ও জবরদখল হওয়া ভূমির পরিমাণের ওপর পূর্ণাঙ্গ তথ্য ইত্যাদি) ও নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে।

১৪. প্রকল্প বাস্তবায়ন, বন ও বনজসম্পদ সংরক্ষণের সঙ্গে জড়িত সব কর্মীর নিজস্ব ও পরিবারের অন্য সদস্যদের বার্ষিক আয় ও সম্পদের বিবরণী বছর শেষে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেওয়াসহ তা প্রকাশ করতে হবে।

১৫. বন অধিদপ্তর ও বনকেন্দ্রিক অনিয়ম-দুর্নীতি এবং বিভাগীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে দ্রুততার সঙ্গে শাস্তি প্রদানের নজির স্থাপন করতে হবে।

দুর্যোগ মোকাবিলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় ঘূর্ণিঝড় আম্পানসহ সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা*

মো. নেওয়াজুল মওলা, কাজী আবু সালেহ, মো. মাহ্ফুজুল হক
রাজু আহমেদ মাসুম ও মু. জাকির হোসেন খান

গবেষণার প্রেক্ষাপট

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। জলবায়ুর ঝুঁকি সূচক ২০১৯ অনুসারে ঘূর্ণিঝড়, বন্যা ও জলোচ্ছ্বাসসহ অন্যান্য দুর্যোগের ফলে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান সপ্তম। উল্লেখ্য, ১৯৯১-২০০৬ সময়ে ৬টি ঘূর্ণিঝড় সংঘটিত হলেও পরবর্তী ১৪ বছরে (২০০৭-২০) ১৫টির অধিক ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে এ ধরনের দুর্যোগ ও ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, লবণাক্ততা এবং নদীভাঙনে উপকূল অঞ্চলে ৩ কোটি ৫০ লাখ এবং চরাঞ্চলে ৬৫ লাখ মানুষ মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে অবস্থান করছে। বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসজনিত বার্ষিক গড় ক্ষতি ৩ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলার, যা মোট জিডিপির ২ দশমিক ২ শতাংশ।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগের সংখ্যা বাড়লেও দুর্যোগে প্রাণহানির সংখ্যা কমছে। তবে সাড়া প্রদানে দুর্বলতা, ভঙ্গুর বেড়িবাঁধ এবং তা নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণে ঘাটতির কারণে কম প্রবল দুর্যোগেও সম্পদ ও অবকাঠামোগত ক্ষতি ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আম্পানসহ সাম্প্রতিক দুর্যোগে উপকূলে বসবাসকারী প্রায় ২ কোটি ৯৫ লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, মোট ৩ হাজার ৭৫৭ জন মৃত্যুবরণ করেছে এবং অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়েছে। আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্যমতে, ২০ মে ২০২০ আঘাত হানা ঘূর্ণিঝড় আম্পান ছিল একটি ‘অতিপ্রবল’ ঘূর্ণিঝড়, যার বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ২৪০-২৬০ কিলোমিটার, জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা ১০-১৬ ফুট, সর্বোচ্চ ক্যাটাগরি-৫ হ্যারিকেনের সমতুল্য এবং গত ২০ বছরের মধ্যে আঘাত হানা যেকোনো ঘূর্ণিঝড়ের তুলনায় প্রলয়ংকরী। দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রাকৃতিক রক্ষাকবচ সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য, গাছ ও সরকারি অবকাঠামোরও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। সুশাসনের ক্ষেত্রে এই ঘাটতি প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি উল্লেখযোগ্য ও টেকসইভাবে কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে একটি বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ।

* ২০২০ সালের ২৪ ডিসেম্বর ঢাকায় ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশিত গবেষণার সারসংক্ষেপ।

গবেষণার যৌক্তিকতা

বাংলাদেশ 'সেনডাই ফ্রেমওয়ার্ক ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন'– এ অনুস্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে দুর্যোগ মোকাবিলায় সাড়া প্রদানব্যবস্থা শক্তিশালী করাসহ সার্বিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সুশাসন নিশ্চিতের অঙ্গীকার করেছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টে (এসডিজি ২০৩০) দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য কার্যকর কর্মসূচি গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে 'অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনার (লক্ষ্য ১১ দশমিক ৫) অঙ্গীকার করা হয়েছে। বিভিন্ন আইন, নীতি ও আদেশাবলীতে দুর্যোগে করণীয় দিকনির্দেশনা সত্ত্বেও আগে সংঘটিত বিভিন্ন দুর্যোগসহ সর্বশেষ ঘূর্ণিঝড় আম্পান মোকাবিলায় সুশাসনের ঘাটতিসংক্রান্ত প্রতিবেদন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। ঘূর্ণিঝড় সিডর ও আইলার পর উপকূলীয় জেলাগুলোয় টেকসই বাঁধ নির্মাণ সরকারের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে অগ্রাধিকার কার্যক্রমের অংশ হলেও সংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলোর কার্যকর বাস্তবায়নে ঘাটতি লক্ষণীয়। এ ছাড়া বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মডেল আন্তর্জাতিকভাবে নন্দিত ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনুসৃত হলেও সরকার গৃহীত কার্যক্রমে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ সুশাসনের দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সিডর (২০০৭) এবং আইলার (২০০৯) পর ১২ বছরে দুর্যোগ মোকাবিলায় সুশাসন চর্চায় কতটুকু অগ্রগতি হয়েছে তার ওপর বিস্তারিত গবেষণার ঘাটতি রয়েছে। ইতিপূর্বে টিআইবি পরিচালিত জলবায়ু পরিবর্তনসহ দুর্যোগবিষয়ক বিবিধ গবেষণায় সুশাসনের ঘাটতি চিহ্নিত করা এবং এ খাতে সুশাসন নিশ্চিতে টিআইবির ধারাবাহিক প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে এ গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য ও পরিধি

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য সাম্প্রতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় সুশাসনের অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জগুলো পর্যালোচনা করা। এই গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো হলো–

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা-সম্পর্কিত অঙ্গীকার, আইন, নীতি ও আদেশাবলীর বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করা;
- আম্পানের অভিজ্ঞতার সঙ্গে আগে সংঘটিত চারটি দুর্যোগ মোকাবিলায় সরকার গৃহীত কার্যক্রমে সুশাসনের অগ্রগতি ও ঘাটতিগুলো সামষ্টিক অভিজ্ঞতার আলোকে বিশ্লেষণ করা; এবং
- গবেষণায় প্রাপ্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সুপারিশ প্রদান করা।

এই গবেষণার আওতায় ঘূর্ণিঝড় সিডর, আইলা, রোয়ানু, বন্যাসহ (২০১৯) ঘূর্ণিঝড় আম্পান মোকাবিলায় পূর্বপ্রস্তুতি, ত্রাণ বিতরণ ও পুনর্বাসনসংক্রান্ত কার্যক্রম সুশাসনের নির্দেশকের আলোকে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

গবেষণাপদ্ধতি

এটি একটি গুণগত গবেষণা, তবে প্রয়োজন অনুযায়ী সংখ্যাগত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। এই গবেষণার জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং তা বিশ্লেষণ করে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ গবেষণায় ১৮ মে থেকে ২৩ ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

সারণি ১ : তথ্যের ধরন, উৎস ও সংগ্রহ পদ্ধতি

তথ্যের ধরন	তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি	তথ্যের উৎস
প্রত্যক্ষ তথ্য	মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা; জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা; পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তা; ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি' (সিপিপি) প্রতিনিধি; ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার; স্থানীয় সাংবাদিক, জনপ্রতিনিধি ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি
পরোক্ষ তথ্য	পর্যালোচনা	গণমাধ্যমে প্রচারিত সংবাদ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের প্রকাশিত প্রতিবেদন, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিবেদন, টিআইবি পরিচালিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক পূর্ববর্তী গবেষণা প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালা

আম্পানসংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের (ডিডিএম) তথ্য অনুসারে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ছয়টি জেলার মোট ১৩টি উপজেলাকে প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহের জন্য এই গবেষণার আওতায় নির্বাচন করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে অতিমাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চল থেকে সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা সদর; খুলনা জেলার কয়রা ও দাকোপ; বরগুনা জেলার আমতলী ও বরগুনা সদর; উচ্চমাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চল থেকে যশোর জেলার শার্শা ও চৌগাছা; বাগেরহাট জেলার শরণখোলা ও রামপাল এবং মাঝারি মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চল থেকে পিরোজপুর জেলার সদর ও মঠবাড়িয়া উপজেলাকে নির্বাচন করা হয়েছে। আম্পানসংক্রান্ত তথ্যের সঙ্গে ইতিপূর্বে টিআইবি পরিচালিত দুর্যোগবিষয়ক গবেষণা– সিডর, আইলা, রোয়ানু, বন্যা-২০১৯–এ প্রাপ্ত ফলাফল এই গবেষণায় বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণার ফলাফল সুশাসনের সাতটি নির্দেশকের আলোকে (আইন ও নীতির প্রতিপালন, স্বচ্ছতা, সক্ষমতা, জবাবদিহি, অংশগ্রহণ, অনিয়ম-দুর্নীতি এবং সমন্বয়) বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দুর্যোগবিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলীসহ (এসওডি) সংশ্লিষ্ট আইন, নীতিমালা ও চুক্তিতে উল্লেখ করা প্রতিপালনযোগ্য নির্দেশাবলীর ভিত্তিতে এবং সুশাসনের নির্দেশকের আলোকে পর্যবেক্ষণের সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রগুলোকে চারটি রঙের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি ২ : পর্যবেক্ষণের সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রগুলোকে চারটি রঙের মাধ্যমে উপস্থাপন

নির্দেশাবলী সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে প্রতিপালন করা হয়েছে	প্রতিপালন করা
নির্দেশাবলী সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে আংশিক প্রতিপালন করা হয়েছে এবং ক্ষেত্রবিশেষে প্রতিপালনে ঘাটতি	প্রতিপালনে ঘাটতি
নির্দেশাবলী সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে প্রতিপালন করা হয়নি	প্রতিপালন না করা
সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রসংক্রান্ত তথ্য না পাওয়া	এ-সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়নি

গবেষণার ফলাফল

দুর্যোগসংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক চুক্তি : বাস্তবায়ন ও অগ্রগতিতে চ্যালেঞ্জ

প্যারিস জলবায়ু পরিবর্তন চুক্তি ২০১৫

গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের মাত্রা কমিয়ে আনার পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলো জলবায়ু অভিযোজনের লক্ষ্য সামনে রেখে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বাংলাদেশসহ বিশ্বের ১৯৭টি দেশ ২০১৫ সালে প্যারিস চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। এই চুক্তির আওতায় অভিযোজন এবং প্রশমন কার্যক্রমে অর্থায়নের পাশাপাশি ওয়ারশ আন্তর্জাতিক মেকানিজম অনুযায়ী জলবায়ুতাড়িত প্রাকৃতিক দুর্যোগের 'লস অ্যান্ড ড্যামেজ' বা 'ক্ষয়ক্ষতি' কাটিয়ে উঠতে শিল্পোন্নত দেশগুলো ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার অঙ্গীকার করেছে। তবে ক্ষয়ক্ষতির সঠিক পরিমাণ নির্ধারণ, এ-সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং আন্তর্জাতিক উৎস থেকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহে সক্ষমতার ঘাটতি রয়েছে। অন্যদিকে লস অ্যান্ড ড্যামেজ মেকানিজমের আওতায় আলাদা তহবিল গঠনসহ পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দের জন্য উন্নত দেশগুলোকে চাপ প্রয়োগের বদলে তাদের প্রস্তাবিত 'বিমা ও বন্ড'ভিত্তিক ব্যবস্থার প্রতি ক্রমশই ঝোঁক পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ ছাড়া কার্যকর অভিযোজন নিশ্চিতে বন ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় গুরুত্ব দেওয়া হলেও সুন্দরবনসহ পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার সন্নিকটে পরিবেশ বিধ্বংসী কয়লা ও এলএনজিভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র ও শিল্প কারখানা স্থাপন করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, অন্যতম ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হয়েও কয়লা ও এলএনজিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনে নির্ভরশীলতা অব্যাহত রয়েছে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ও বন সংরক্ষণের বিপরীত নীতি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। চুক্তিতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষতি মোকাবিলায় অভিযোজন ব্যবস্থা জোরদারের পাশাপাশি পারস্পরিক সহযোগিতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির কথা বলা হলেও এ বিষয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের কোনো সুনির্দিষ্ট কর্মকৌশল নেই।

সেনডাই ফ্রেমওয়ার্ক ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন (২০১৫-২০৩০)

দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রমভিত্তিক একটি সমন্বিত কাঠামো তৈরি এবং তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০১৫ সালে 'সেনডাই ফ্রেমওয়ার্ক ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন' গৃহীত হয়। এই কাঠামোর অনুস্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ দুর্যোগে মৃত্যুহার, আক্রান্তের সংখ্যা, ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করাসহ পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দুর্যোগ সহনশীলতা বৃদ্ধির অঙ্গীকার করে। একই সঙ্গে ঝুঁকি নিরসনে এই কাঠামোতে দুর্যোগসংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা নিশ্চিতের অঙ্গীকার করা হলেও স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে এ-সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশে কোনো কাঠামোবদ্ধ নির্দেশিকা নেই। বিশেষ করে দুর্যোগ প্রস্তুতি, সাড়াদান ও পরবর্তী ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমসংক্রান্ত তথ্য উন্মুক্তকরণ, প্রকাশ ও প্রচারে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। এ ছাড়া বিভাগীয় আইন ও বিধিবিধানের কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় কর্মকৌশল গ্রহণের কথা বলা হলেও দুর্যোগ প্রস্তুতি, মোকাবিলা ও ত্রাণ কার্যক্রমে অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধে বিভাগীয় আইন ও বিধিবিধানের কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিতে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। স্থানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে কার্যকর সমন্বয় স্থাপনের বিষয়টি প্রতিপালনেও ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়। উল্লেখ্য, স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ প্রস্তুতি, সাড়াদান এবং পরবর্তী ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে সরকারি ও বেসরকারি

প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে কার্যকর সমন্বয়ের ঘাটতির বিষয়টি আগের গবেষণাসহ এ গবেষণায়ও উঠে এসেছে।

দুর্যোগসংশ্লিষ্ট জাতীয় আইন, নীতি ও আদেশাবলী : প্রতিপালনে চ্যালেঞ্জ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন-২০১২

দুর্যোগ মোকাবিলাবিষয়ক কার্যক্রমকে সমন্বিত, লক্ষ্যভিত্তিক ও শক্তিশালী করা এবং দুর্যোগ মোকাবিলায় কার্যকর ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়ে তোলার জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২ সালে প্রণয়ন করা হয়েছে। এই আইনের ধারা ১০(২)– এ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক নিয়োগের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু মহাপরিচালক নিয়োগে চাকরির শর্ত ও যোগ্যতা, যেমন দুর্যোগ-সম্পর্কিত বিশেষায়িত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ইত্যাদি বিষয়গুলো নির্ধারণ না করায় নিয়োগ-প্রক্রিয়ায় অনিয়মের সুযোগ রয়েছে এবং এর প্রভাব হিসেবে বিশেষায়িত জ্ঞানসম্পন্ন নেতৃত্বের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। এ ছাড়া ১২(১) ধারায় জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করার কথা বলা হলেও জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা না করায় দুর্যোগসংক্রান্ত গবেষণালব্ধ তথ্যের স্বল্পতা রয়েছে। এ আইনের ধারা ২৯(১)– এ অনিয়ম, গাফিলতি বা অব্যবস্থাপনা পরিলক্ষিত হলে অভিযোগ দায়ের এবং উত্থাপনকৃত অভিযোগ নিষ্পত্তির বিধান রয়েছে। তবে অভিযোগ দাখিলকারীর সুরক্ষায় কোনো সুনির্দিষ্ট বিধান না থাকায় অভিযোগ দাখিলকারীকে হুমকি ও মামলায় ভয় প্রদর্শন করা হয়ে থাকে। এ ছাড়া অভিযোগ দেওয়ার পর তা নিরসনে গাফিলতি করলে আইনের অধীনে কোনো সুনির্দিষ্ট শাস্তির বিধানও রাখা হয়নি।

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সুশাসন আনা এবং সম্পৃক্ত সব স্তরের অংশীজনদের জবাবদিহি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়েছে। নীতিমালায় সতর্ক সংকেত ব্যবস্থা যুগোপযোগী করা এবং তা বাস্তবায়ন করার কথা বলা থাকলেও তা যুগোপযোগী করায় উদ্যোগ না নেওয়া, পুরোনো পদ্ধতিতে (যা বন্দরের জন্য প্রযোজ্য) পূর্বাভাস প্রদানের ফলে সাধারণ জনগণের কাছে বোধগম্য না হওয়ায় প্রাণহানি ও সম্পদের ক্ষতির ঝুঁকি বৃদ্ধি পেয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত সব প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেদন এবং নথির সমন্বয়ে একটি অনলাইন ডেটাবেইস গড়ে তোলার কথা বলা হলেও নীতিমালা প্রণয়নের পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও অনলাইন ডেটাবেইস প্রস্তুতে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। ফলে দুর্যোগসংক্রান্ত তথ্যের দুষ্প্রাপ্যতা রয়েছে। এ ছাড়া বিভিন্ন পর্যায়ে ত্রাণ তহবিল ও ত্রাণভান্ডারের নগদ অর্থ ও ত্রাণসামগ্রী দুর্গত এলাকায় দ্রুত পৌঁছানোর বিধান থাকলেও দুর্গম এলাকায় ত্রাণসামগ্রী পৌঁছানোয় বিলম্ব হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিবহন ব্যয় নির্বাহে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা স্থানীয় জনপ্রতিনিধি কর্তৃক ত্রাণের পণ্য বিক্রয় এবং ভুক্তভোগীকে বরাদ্দের তুলনায় কম ত্রাণ দেওয়া হয়েছে।

ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণ নীতিমালা ২০১১

নির্মাণাধীন বা নির্মাণের জন্য পরিকল্পনাধীন আশ্রয়কেন্দ্রগুলোর যথাযথ বাস্তবায়ন এবং ইতিমধ্যে নির্মিত আশ্রয়কেন্দ্রগুলোর যথাযথ ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহার উপযোগিতা নিশ্চিতে ২০১১ সালে

ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণ নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। নীতিমালায় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা পর্যায়ে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (ইআইএ) করার কথা বলা হলেও ক্ষেত্রবিশেষে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ ছাড়াই আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়ে থাকে। একইভাবে আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের স্থান নির্বাচনে যথাযথভাবে ঝুঁকি যাচাই না করায় বিভিন্ন স্থানে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এ ছাড়া এই নীতিতে আশ্রয়কেন্দ্রের স্থান নির্বাচনে জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেম (জিআইএস) প্রযুক্তির ব্যবহার করা এবং ঝুঁকিতে থাকা এলাকা, জনসংখ্যার ঘনত্ব, যোগাযোগব্যবস্থা, নিকটবর্তী আশ্রয়কেন্দ্র থেকে দূরত্ব ও ভূমির প্রাপ্যতা বিবেচনা করার কথা বলা হলেও জিআইএস প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা হয় না। আশ্রয়কেন্দ্রের স্থান নির্বাচনে উল্লিখিত বিষয়গুলো বিবেচনায় না নিয়ে বরং স্থানীয় প্রভাবশালীদের ব্যক্তিগত ও অনৈতিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতে রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহারের উদাহরণ রয়েছে। এই নীতিতে আশ্রয়কেন্দ্রের যোগাযোগব্যবস্থা, সুযোগ-সুবিধা (বিশেষ করে নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য) উন্নত করার কথা বলা হলেও তা নিশ্চিতে ঘাটতি রয়েছে। এ ছাড়া আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ এবং ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনগণ এবং সুবিধাভোগীদের অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলা হলেও স্থানীয় দরিদ্রদের নির্মাণশ্রমিক হিসেবে নিযুক্ত করা হয় না এবং আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনায়ও স্থানীয় নাগরিকদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। ক্ষেত্রবিশেষে আশ্রয়কেন্দ্র প্রভাবশালীদের দখলে রাখা এবং ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা হয়। ফলে দুর্যোগের সময় আশ্রয়কেন্দ্রগুলোর ব্যবহার উপযোগিতা নিশ্চিতেও ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়।

দুর্যোগবিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী ২০১০ (হালনাগাদ ২০১৯)

দুর্যোগ মোকাবিলায় নিয়োজিত এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব এবং কর্তব্য নির্ধারণের জন্য ২০১০ সালে দুর্যোগবিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী প্রণয়ন করা হয়েছে এবং ২০১৯ সালে তা হালনাগাদ করা হয়েছে। আদেশাবলীতে দুর্যোগ সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করার নির্দেশনা থাকলেও দুর্যোগ সহনশীল অবকাঠামো (ঝুঁকিপূর্ণ আশ্রয়কেন্দ্র, রাস্তা ও বাঁধ) মেরামত ও পুনর্গঠন কার্যক্রমের কার্যকর বাস্তবায়ন করা হয় না। আদেশাবলীতে সতর্কীকরণ ও নিরাপত্তামূলক বার্তা প্রচার করার কথা বলা থাকলেও আধুনিক ও যুগোপযোগী পদ্ধতিতে সতর্কীকরণ ও নিরাপত্তামূলক বার্তা প্রচারে ঘাটতি বিদ্যমান। এ ছাড়া আশ্রয়কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় সেবা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কথা বলা হলেও বিগত দুর্যোগের মতো পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা যেমন খাদ্য, পানি, পয়োনিষ্কাশন, জরুরি চিকিৎসা এবং প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিতে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম দ্রুততা এবং স্বচ্ছতার সঙ্গে পরিচালনার কথা বলা হলেও এ-সংক্রান্ত কার্যক্রমে দুর্নীতি ও অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়। অন্যদিকে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি সহায়তা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়নে আদেশাবলীর ব্যত্যয়সহ কার্যক্রম বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতা বিদ্যমান। আদেশাবলীতে আন্তপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ের কথা বলা হলেও সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে দুর্যোগ পূর্ব-প্রস্তুতি, সাড়াদান, মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে সমন্বয়ে ঘাটতিও পরিলক্ষিত হয়।

স্বচ্ছতা

তথ্য অধিকার আইন ছাড়াও দুর্যোগবিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলীতে সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা থাকলেও আগে সংঘটিত দুর্যোগসহ সর্বশেষ ঘূর্ণিঝড় আম্পানেও দুর্গম এলাকায় দুর্যোগের পূর্বাভাসসংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ ও সতর্কতামূলক বার্তা প্রচার না করার অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে স্থানীয় পর্যায়ে পূর্বাভাস ও সতর্কবার্তা প্রদানে আবহাওয়া অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমে বিভ্রান্তিকর বার্তা প্রচারের ফলে স্থানীয় জনপ্রশাসন ও জনপ্রতিনিধি এবং সাধারণ জনগণের মাঝে পূর্বাভাসসংক্রান্ত তথ্য নিয়ে বিভ্রান্তি দেখা গেছে। ফলে ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকি বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে, কন্ট্রোল রুম ও হটলাইনের নম্বর আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচারে কার্যকর কোনো উদ্যোগ দেখা যায়নি। ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণসংক্রান্ত কমিটির প্রতিবেদন প্রকাশে ঘাটতি রয়েছে এবং স্থানীয়ভাবে ত্রাণ ও সুবিধাভোগীর তালিকা প্রকাশ করা হয়নি। মন্ত্রণালয়ের সুনির্দিষ্ট কর্মকর্তাদের বিভাগ ও জেলাভিত্তিক ত্রাণ বিতরণ তদারকি করার দায়িত্ব থাকলেও এ-সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়নি।

সারণি ৩ : স্বচ্ছতার চ্যালেঞ্জবিষয়ক পর্যবেক্ষণের সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্র

পর্যবেক্ষণের সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্র	সিডর-২০০৭	আইলা-২০০৯	রোয়ানু-২০১৬	বন্যা-২০১৯	আম্পান-২০২০
কেন্দ্রীয় পর্যায়ে দুর্যোগের পূর্বাভাসসংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ					
স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগের পূর্বাভাসসংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ					
আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা, সুযোগ-সুবিধা ও সেবাসংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ					
কন্ট্রোল রুম বা হটলাইনের নম্বর আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচার					
স্থানীয়ভাবে ত্রাণ ও সুবিধাভোগীর তালিকা প্রকাশ					
প্রকৃত ক্ষয়-ক্ষতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ					
ত্রাণ বিতরণ তদারকি প্রতিবেদন প্রকাশ					

	প্রকাশ
	ঘাটতি
	না করা
	এ-সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়নি

সক্ষমতা

সারণি ৪: সক্ষমতার চ্যালেঞ্জবিষয়ক পর্যবেক্ষণের সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্র

পর্যবেক্ষণের সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্র	সিডর-২০০৭	আইলা-২০০৯	রোয়ানু-২০১৬	বন্যা-২০১৯	আম্পান-২০২০
সতর্কবার্তা প্রচার পদ্ধতি আধুনিক ও সময়োপযোগী করা	না করা	না করা	না করা	না করা	না করা
পর্যাপ্তসংখ্যক আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা	ঘাটতি	ঘাটতি	ঘাটতি	ঘাটতি	ঘাটতি
জরুরি উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা	ঘাটতি	ঘাটতি	ঘাটতি	ঘাটতি	ঘাটতি
স্থানীয় পর্যায়ে ত্রাণ মজুতকরণ	না করা	না করা	না করা	ঘাটতি	না করা
আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত	না করা	না করা	না করা	না করা	না করা
জরুরি চিকিৎসা, স্বাস্থ্যসেবা ও স্যানিটেশন নিশ্চিত	ঘাটতি	ঘাটতি	ঘাটতি	ঘাটতি	ঘাটতি
দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মেরামতে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ	ঘাটতি	ঘাটতি	ঘাটতি	ঘাটতি	ঘাটতি

রং	অর্থ
হলুদ	ঘাটতি
লাল	না করা

দুর্যোগের সংখ্যা ও ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পেলেও সতর্কবার্তা প্রচার পদ্ধতি আধুনিকায়ন ও ঝুঁকিপূর্ণ জনসাধারণের বোধগম্য করে প্রচার না করে নৌ ও সমুদ্রবন্দরের জন্য প্রযোজ্য সতর্কবার্তা প্রচার করায় দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যদিকে, প্রয়োজনীয়সংখ্যক আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণে ঘাটতি রয়েছে। সারা দেশে ২২ হাজারের বেশি আশ্রয়কেন্দ্রের চাহিদা থাকলেও প্রায় ৩২ শতাংশ ঘাটতি রয়েছে। এ ছাড়া স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধি কর্তৃক জরুরি উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনায় ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। ক্ষেত্রবিশেষে স্বেচ্ছাসেবকদের টিম গঠন না করায় দুর্গম এলাকাগুলোয় জরুরি উদ্ধারকাজ পরিচালনা ব্যাহত হয় এবং বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী অধিকতর ঝুঁকিতে অবস্থান করতে বাধ্য হয়। অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধার অভাবে যথাসময়ে ত্রাণ মজুত করা সম্ভব হয় না, ফলে দুর্যোগকালীন ও পরবর্তী সময়ে বিতরণে বিলম্ব হয়ে থাকে। এ ছাড়া দুর্যোগে আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিতে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ না থাকা, যেমন পুলিশ প্রশাসন কর্তৃক নিরাপত্তা নিশ্চিতে টহল কার্যক্রম পরিচালনা করতে না পারায় কোনো কোনো এলাকায়

চুরি-ডাকাতির মতো ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এ ছাড়া জনগণের মূল্যবান সম্পদ নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরের জন্য পর্যাপ্ত পরিবহনের ব্যবস্থা নিতে পারেনি।

তা ছাড়া আগের দুর্যোগে পরিলক্ষিত ঘাটতি– যেমন জরুরি চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা এবং স্যানিটেশন নিশ্চিতেও ঘাটতির বিষয়টি আম্পানের ক্ষেত্রেও বিদ্যমান। পর্যাপ্ত মেডিকেল টিম এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রয়োজনীয় পরিবহন বা অর্থের বরাদ্দ না থাকায় জরুরি চিকিৎসাসেবা প্রদানে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। অন্যান্য ঘাটতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– সম্পূরক যন্ত্রপাতি, লোকবল ও ব্যবহারযোগ্যসামগ্রী সরবরাহের মাধ্যমে ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র চালু রাখাসহ স্বাস্থ্যসেবাব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে জরুরি পরিস্থিতিতে সেবা প্রদানের ব্যবস্থা না থাকা; নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন নিশ্চিতে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মতৎপরতার ঘাটতি ইত্যাদি।

দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সংস্কার ও পুনর্নির্মাণে পদক্ষেপের ঘাটতিও বিদ্যমান। স্থানীয় শিক্ষা অফিস কর্তৃক শিক্ষা কার্যক্রম স্বাভাবিক করতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মেরামতে বাজেট না থাকা, কোনো কোনো এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষার্থীদের শিক্ষাসামগ্রী পুনরায় বিতরণ না করা ও দূরবর্তী বিচ্ছিন্ন এলাকার দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার্থীদের স্কুলে ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগের ঘাটতি দেখা গেছে।

জবাবদিহি

পূর্বাভাস ও সতর্কবার্তা প্রদানে আবহাওয়া অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমে বিভ্রান্তিকর বার্তা প্রদান করার ফলে স্থানীয় জনপ্রশাসন ও জনপ্রতিনিধি এবং সাধারণ জনগণের মাঝে পূর্বাভাসসংক্রান্ত তথ্য নিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। এ ছাড়া প্রকৃত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সঠিকভাবে নিরূপণে ঘাটতি দেখা গেছে। যেমন ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণসংক্রান্ত কমিটি কর্তৃক প্রকৃত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সঠিকভাবে চিহ্নিত করা হয়নি।

ষাট ও সত্তরের দশকে নির্মিত উপকূলের অধিকাংশ ঝুঁকিপূর্ণ বাঁধ মেরামতে দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপে ঘাটতি দেখা গেছে। দুর্বলভাবে নির্মিত বাঁধগুলো জোয়ারের পানি প্রতিরোধে অকার্যকর হওয়ায় সিডর, আইলাসহ সর্বশেষ আম্পানের ফলে সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাসে ব্যাপক এলাকা ও জনপদ প্লাবিত হয়েছে। জরুরি ভিত্তিতে ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ সংস্কার ও মেরামতে পাউবোকে বিশেষ বরাদ্দ দেওয়া হলেও দ্রুত মেরামতে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ না করার অভিযোগ রয়েছে। তা ছাড়া বাঁধ দ্রুত মেরামত ও সংস্কারে পাউবোর কর্মদক্ষতার ঘাটতি ও বরাদ্দপাপ্ত অর্থের সম্পূর্ণ অংশ ব্যবহার না করার অভিযোগ রয়েছে। দুর্যোগ-পরবর্তী দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বাঁধ সংস্কার না করায় ঘর-বাড়ি পানির নিচে তলিয়ে আক্রান্ত মানুষদের গৃহহীন থাকতে দেখা গেছে এবং বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের কার্যকর উদ্যোগ না নেওয়ায় আক্রান্ত পরিবারগুলোকে দীর্ঘদিন বাঁধে অবস্থান করতে হয়েছে। দুর্বল বাঁধের কারণে আম্পানে ৮৪টি পয়েন্টে মোট ২৩৩ কিলোমিটার বাঁধ ভাঙলেও

মেরামতে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় জোয়ারের পানি প্রবেশের ফলে দুর্গত এলাকায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে। আম্পান আঘাত হানার ৬ মাস অতিবাহিত হলেও সাতক্ষীরার আশাশুনিতে বাঁধ সংস্কার না করায় ঘর-বাড়ি পানির নিচে তলিয়ে আক্রান্ত প্রায় ২০ হাজার মানুষ গৃহহীন অবস্থায় বাঁধের ওপর অবস্থান করেছে।

সারণি ৫ : জবাবদিহির চ্যালেঞ্জবিষয়ক পর্যবেক্ষণের সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্র

পর্যবেক্ষণের সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্র	সিডর-২০০৭	আইলা-২০০৯	রোয়ানু-২০১৬	বন্যা-২০১৯	আম্পান-২০২০
ঝুঁকিপূর্ণ অবকাঠামো (বাঁধ, আশ্রয়কেন্দ্র, রাস্তা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান) চিহ্নিত করা					
দুর্যোগের আগেই ঝুঁকিপূর্ণ অবকাঠামো মেরামত					
প্রচারমাধ্যমে দুর্যোগের সঠিক বার্তা প্রদান					
প্রকৃত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ					
দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো মেরামতে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ					

	ঘাটতি
	না করা
	এ-সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়নি

সিডরের পর ২০১৯ পর্যন্ত উপকূলীয় জেলাগুলোয় পাউবো ১৬৮টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করলেও অধিকাংশ দুর্যোগ সহনশীল অবকাঠামো নাজুক অবস্থায় থাকায় ঘূর্ণিঝড় আম্পানে বাঁধ ভেঙে ১ লাখ ৭৬ হাজার হেক্টর এলাকা প্লাবিত হয়েছে। উন্নয়ন তহবিল ও বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড (বিসিসিটিএফ) থেকে উপকূলীয় এলাকায় পাউবো প্রায় ১৯ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন করলেও রাজনৈতিক বিবেচনায় তহবিল বরাদ্দের কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগে সর্বোচ্চ ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলোয় কম বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

জোয়ারের পানি প্রবেশের ফলে দুর্গত এলাকায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে এবং ১০ হাজার ৫৫২ হেক্টর কৃষি জমির ক্ষতিসহ ৪৫ হাজার ঘরবাড়ি ও ২৬ হাজার ৫০ হেক্টর মাছের খামার ভেসে গেছে। ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণসংক্রান্ত কমিটি কর্তৃক প্রকৃত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সঠিকভাবে নির্ধারণে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। এ ছাড়া ফসলি জমির দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতি, ক্ষয়ক্ষতির হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা

হয় না; বিশেষ করে সিডর ও আইলা-পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতির অভিজ্ঞতা (যেমন ৩৫ শতাংশ কৃষিজমির লবণাক্ততাজনিত ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে না ওঠা এবং দুর্যোগের পরের বছর থেকে ফসল উৎপাদন ২০ শতাংশ কম হওয়া) বিবেচনায় না নেওয়ায় ক্ষয়ক্ষতির সঠিক পরিমাণ নিরূপণ এবং কৃষকদের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে সেই মোতাবেক প্রণোদনা দিতে পরিকল্পনা ও বরাদ্দে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। একজন তথ্যদাতার মতে, 'শুধু উপকূলীয় জেলাগুলোয় ঘূর্ণিঝড় আম্পান-পরবর্তী দীর্ঘমেয়াদে কৃষিতে ব্যাপক ক্ষতি হবে। প্রথম বছরান্তে প্রাক্কলিত ক্ষতির পরিমাণ হবে প্রায় ২ হাজার ৩৫ কোটি টাকা। এ ছাড়া আগামী দুই থেকে তিন বছর প্রায় ৬১ হাজার ৬০২ হেক্টর জমি ব্যবহার অনুপযোগী থাকার ঝুঁকি রয়েছে।'

সারণি ৬ : জবাবদিহির চ্যালেঞ্জবিষয়ক পর্যবেক্ষণের সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্র

পর্যবেক্ষণের সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্র	সিডর-২০০৭	আইলা-২০০৯	রোয়ানু-২০১৬	বন্যা-২০১৯	আম্পান-২০২০
ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন পর্যায়ে দুর্যোগবিষয়ক স্থায়ী কমিটির কার্যকারিতা	এ-সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়নি	এ-সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়নি	এ-সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়নি	না থাকা	না থাকা
দুর্যোগবিষয়ক মহড়ার নিয়মিত আয়োজন	না থাকা	না থাকা	না থাকা	না থাকা	না থাকা
ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী যথাযথভাবে শনাক্ত ও যথাসময়ে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেওয়া	না থাকা	না থাকা	না থাকা	ঘাটতি	না থাকা
গৃহস্থালি সম্পদ, কৃষি ও প্রাণিসম্পদ রক্ষায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ	ঘাটতি	ঘাটতি	ঘাটতি	ঘাটতি	ঘাটতি
যথাযথভাবে ত্রাণের চাহিদা নিরূপণ	না থাকা	না থাকা	না থাকা	না থাকা	না থাকা
যথাযথভাবে ত্রাণ বরাদ্দ ও বিতরণ	ঘাটতি	ঘাটতি	ঘাটতি	ঘাটতি	ঘাটতি
পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনায় যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ	ঘাটতি	ঘাটতি	ঘাটতি	ঘাটতি	ঘাটতি
ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের যথাযথ তদারকি	ঘাটতি	ঘাটতি	ঘাটতি	ঘাটতি	ঘাটতি
স্থানীয় পর্যায়ে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা	না থাকা	না থাকা	না থাকা	না থাকা	না থাকা

(লাল)	না থাকা
(হলুদ)	ঘাটতি
(ধূসর)	এ-সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়নি

দুর্যোগের পূর্বে আশ্রয়কেন্দ্র প্রস্তুত, পর্যাপ্ত খাবার ও আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থানকালীন সুবিধা নিশ্চিতে ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন পর্যায়ে দুর্যোগবিষয়ক স্থায়ী কমিটির কার্যকারিতার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। সরকারি নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট অংশীজনকে সম্পৃক্ত করে দুর্যোগবিষয়ক মহড়ার আয়োজন করা হয় না। দুর্গম চর, দ্বীপ ও হাওর অঞ্চলের জনগোষ্ঠীকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট প্রশাসন ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের উদ্যোগের ঘাটতি বিদ্যমান। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুর্যোগকালে আশ্রয়কেন্দ্রে পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। যেমন গৃহস্থালি প্রাণী ও প্রয়োজনীয় মালামাল রাখার জায়গা আগে থেকে প্রস্তুত করে না রাখা, স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত খাবার সরবরাহ না করায় মানুষ অভুক্ত থাকা, শিশুদের জন্য উপযোগী খাবারের ব্যবস্থা না থাকা, নারী, শিশু, বৃদ্ধ, অসুস্থ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য পৃথক কক্ষ ও ল্যাট্রিন না থাকা, রাত্রীকালীন আলো সরবরাহের ব্যবস্থা না থাকা, রাত্রিযাপনে নিরাপত্তাঝুঁকি এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে মেডিকেল টিমের উপস্থিতি না থাকার অভিযোগ রয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধি কর্তৃক দুর্যোগকবলিত এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন না করে ত্রাণের চাহিদা নিরূপণ করার অভিযোগ রয়েছে। চাহিদা যথাযথভবে নিরূপণ করতে ব্যর্থ হওয়ায় কিছু এলাকায় দুর্যোগকালীন খাদ্যসংকটের বিষয়টিও গবেষণায় উঠে এসেছে।

অধিকাংশ স্থানে প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল ত্রাণ বরাদ্দ করা হয়েছে, যা দুর্যোগের ক্ষতি বিবেচনায় খুবই সামান্য এবং ক্ষেত্রবিশেষে অসম বরাদ্দ ও বণ্টনের অভিযোগ রয়েছে। অন্যদিকে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তের সংখ্যা বিবেচনায় না নিয়ে টাকা, চাল ও ঢেউটিন বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে এবং ক্ষেত্রবিশেষে রাজনৈতিক বিবেচনায় কম ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় অধিক বরাদ্দ এবং বেশি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় বরাদ্দ না দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া ত্রাণ বিতরণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম তদারকির জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের যথাযথ ভূমিকা পালন না করার অভিযোগ রয়েছে। উল্লেখ্য, স্থানীয় পর্যায়ে ‘ট্যাগ অফিসার’ এবং বিভাগ ও জেলাভিত্তিক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের তদারকিতে ন্যস্ত করা হলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরাসরি দুর্যোগকবলিত এলাকায় না গিয়ে কার্যালয়ে বসে তদারকি করার অভিযোগ রয়েছে। পুনর্বাসন কার্যক্রমে দুর্গম এলাকার সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে অগ্রাধিকার প্রদানে ঘাটতি রয়েছে। সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর ঘর-বাড়ি মেরামত ও সংস্কার, জীবিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং তাদের সক্ষমতা তৈরিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (ডিডিএম) কর্তৃক কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। সিডর ও আইলাসহ আম্পানে বাস্তুচ্যুতদের পুনর্বাসনের কার্যকর উদ্যোগ না নেওয়ায় তারা দীর্ঘদিন ধরে বাঁধে অবস্থান করেছে। উল্লেখ্য, আম্পানে সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাসে কয়রায় ১৮টি গ্রাম পানির নিচে তলিয়ে ২০ হাজার মানুষ গৃহহীন অবস্থায় বাঁধের ওপর অবস্থান করেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্থানীয় পর্যায়ে ত্রাণ বিতরণসংক্রান্ত অভিযোগ করার জন্য আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা নেই। উপজেলা প্রশাসন ত্রাণ বিতরণসংক্রান্ত অভিযোগ আমলে নেয় না এবং ক্ষেত্রবিশেষে অভিযোগ করলে হয়রানির শিকার হতে হয় বলে স্থানীয়রা অভিযোগ করেন।

ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো উন্নয়ন, মেরামত ও পুনর্বাসনের জন্য পাউবো কর্তৃক স্বল্প বরাদ্দের কথা বলা হলেও উন্নয়ন তহবিল ও বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড (বিসিসিটিএফ) থেকে উপকূলীয় এলাকায় ২০১০-১৯ সাল পর্যন্ত পাউবো প্রায় ১৯ হাজার কোটি টাকার প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। উল্লেখ্য, দুর্যোগের ঝুঁকির ভিত্তিতে অগ্রাধিকার প্রদান না করা এবং রাজনৈতিক বিবেচনায় তহবিল বরাদ্দের কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগে সর্বোচ্চ ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলোয় কম বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

অংশগ্রহণ

সারণি ৭ : অংশগ্রহণের চ্যালেঞ্জবিষয়ক পর্যবেক্ষণের সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্র

পর্যবেক্ষণের সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্র	সিডর-২০০৭	আইলা-২০০৯	রোয়ানু-২০১৬	বন্যা-২০১৯	আম্পান-২০২০
আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের জন্য স্থান নির্বাচনে স্থানীয় জনগণের মতামত গ্রহণ					
আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় নাগরিকের অংশগ্রহণ					
বাঁধ নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ					
ত্রাণ বিতরণ এবং পুনর্বাসন কার্যক্রমে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ					

	ঘাটতি
	অংশগ্রহণ না থাকা

অধিকতর কার্যকর হলেও বাঁধ নির্মাণ ও সংরক্ষণে জন-অংশগ্রহণমূলক সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা মডেলটি অনুসরণ করা হয় না বলে স্থানীয় জনগণ এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা অভিযোগ করেন। আশ্রয়কেন্দ্র ও বাঁধ নির্মাণে স্থানীয় দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে শ্রমিক হিসেবে কাজের সুযোগ প্রদানে ঘাটতি রয়েছে। এ ছাড়া গুলিশাখালীতে স্থানীয় চেয়ারম্যান ও জনগণের দাবি উপেক্ষা করে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ স্থানের পরিবর্তে একজন প্রকৌশলীর বাড়ির কাছে আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করার মতো উদাহরণও রয়েছে। আগের দুর্যোগের মতো আম্পানেও ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের সুবিধাভোগী নির্বাচনেও স্থানীয় জনগণের মতামত নেওয়া হয় না বলে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণ অভিযোগ করেছেন।

অনিয়ম ও দুর্নীতি

সারণি ৮ : অংশগ্রহণের চ্যালেঞ্জবিষয়ক পর্যবেক্ষণের সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্র

পর্যবেক্ষণের সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্র	সিডর-২০০৭	আইলা-২০০৯	রোয়ানু-২০১৬	বন্যা-২০১৯	আম্পান-২০২০
দুর্যোগসহনশীল অবকাঠামো (বাঁধ, রাস্তা, আশ্রয়কেন্দ্র) নির্মাণে অনিয়ম ও দুর্নীতি	হয়েছে	হয়েছে	হয়েছে	হয়েছে	হয়েছে
আশ্রয়কেন্দ্র বা বাঁধ নির্মাণে রাজনৈতিক ক্ষমতার ব্যবহার ও ব্যক্তি স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া	হয়েছে	হয়েছে	হয়েছে	হয়েছে	হয়েছে
আশ্রয়কেন্দ্র ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে ব্যবহার	হয়েছে	হয়েছে	হয়েছে	হয়েছে	হয়েছে
ত্রাণ বিতরণে রাজনৈতিক ক্ষমতার ব্যবহার	হয়েছে	হয়েছে	হয়েছে	হয়েছে	হয়েছে

(লাল রং) **হয়েছে**

আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের স্থান নির্ধারণে যথাযথভাবে ঝুঁকি যাচাই না করা এবং রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ রয়েছে। উল্লেখ্য, যথাযথভাবে ঝুঁকি যাচাই না করেই আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করায় বরিশাল, লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুরসহ বিভিন্ন স্থানে এই স্থাপনাগুলো নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে। আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের পর ক্ষেত্রবিশেষে তা প্রভাবশালীদের দখলে রাখা ও ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করতে দেখা গেছে। এ ছাড়া সব দুর্যোগের সময়েই বিভিন্ন এলাকায় ত্রাণের সুবিধাভোগী নির্বাচন ও বিতরণে অনিয়ম হতে দেখা গেছে। সরকারি কর্মকর্তা এবং জনপ্রতিনিধি কর্তৃক তাদের ইচ্ছেমতো উপকারভোগী নির্বাচনের অভিযোগ রয়েছে। জনপ্রতিনিধি কর্তৃক স্বজনপ্রীতি ও রাজনৈতিক বিবেচনায় উপকারভোগী নির্বাচন, ত্রাণ বিতরণ এবং ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িঘর সংস্কারে ঢেউটিন ও টাকা বরাদ্দের ক্ষেত্রে সুবিধাভোগীদের থেকে অনৈতিক অর্থ গ্রহণের অভিযোগ রয়েছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (ডিডিএম) কর্তৃক ২০১৯-২০ অর্থবছরে ক্রয়-প্রক্রিয়ায় অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। এ ক্ষেত্রে পছন্দের ঠিকাদারকে কার্যাদেশ দিতে শুকনো খাবার ক্রয়ের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশিকা অনুসরণ করা হয়নি। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞতার ঘাটতির ফলে একজন ঠিকাদারকে বাদ দিলেও পরবর্তী অন্য আরেকটি দরপত্রে তাকেই কার্যাদেশ প্রদান এবং একজন ঠিকাদারের বিরুদ্ধে মানহীন ঢেউটিন সরবরাহের অভিযোগে দুদকের মামলা চলমান থাকা সত্ত্বেও কার্যাদেশ দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

উপকূলীয় বাঁধ সংস্কার, রক্ষণাবেক্ষণে অনিয়ম ও দুর্নীতি হয়েছে। আশাশুনিতে চিংড়ি চাষের জন্য বেড়িবাঁধ কাটাসংক্রান্ত ৩৬০টি মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ার পেছনে সংশ্লিষ্ট প্রভাবশালীদের সঙ্গে

পাউবো কর্মকর্তাদের আর্থিক লেনদেন ও পারস্পরিক যোগসাজশের অভিযোগ করেন স্থানীয় জনসাধারণ। পছন্দের ঠিকাদারের সঙ্গে যোগসাজশে পাউবো কর্মকর্তা কর্তৃক অতিরিক্ত প্রাক্কলন করে দরপত্র আহ্বান, কাজ প্রাপ্তির পর অতিরিক্ত প্রাক্কলনের টাকার অংশ সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের সঙ্গে ভাগাভাগির অভিযোগও রয়েছে। রাস্তা নির্মাণে শ্যামনগরের গাবুরায় শিডিউল অনুযায়ী পুরোনো বেড়িবাঁধের উচ্চতা আগের চেয়ে ৩ ফুট বাড়ানোর কথা থাকলেও তা না করার অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া ভোলার চরফ্যাশন ও মনপুরা শহর রক্ষা বাঁধ প্রকল্পে নিম্নমানের সিসি ব্লক স্থাপন এবং প্রকল্প কর্মকর্তার সঙ্গে যোগসাজশে ঠিকাদারের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাৎ এবং খুলনা ও সাতক্ষীরায় নদী খনন প্রকল্পে সঠিক পরিমাণে নির্মাণ উপকরণ ব্যবহার না করা এবং নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নসহ অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে।

উপকূলীয় অবকাঠামো নির্মাণ, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণসংক্রান্ত ৪টি প্রকল্পে দুর্নীতির কারণে ০.২৬-১৪০ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতির সুনির্দিষ্ট অভিযোগ রয়েছে। প্রকল্প বাজেটের শতকরা হিসাবে এসব আর্থিক ক্ষতির হার ছিল সর্বনিম্ন ১৪ দশমিক ৩৬ থেকে সর্বোচ্চ ৭৬ দশমিক ৯২ শতাংশ পর্যন্ত। নিচে (সারণি-৯) প্রকল্প ৪টিতে অনিয়ম ও দুর্নীতির বিস্তারিত চিত্র তুলে ধরা হলো:

সারণি ৯ : উপকূলীয় অবকাঠামো নির্মাণ, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণে দুর্নীতি

প্রকল্প/ কার্যক্রমের ধরন	দুর্নীতির ধরন	সময় কাল	প্রকল্পের মোট বাজেট (কোটিতে)	দুর্নীতির কারণে আর্থিক ক্ষতি (কোটিতে)	দুর্নীতির কারণে আর্থিক ক্ষতি (শতাংশে)
পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প	ক্রয় আইন লঙ্ঘন, ক্রয়-প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি, দরপত্রে উল্লিখিত শর্ত ও অভিজ্ঞতা পূরণ না হওয়া সত্ত্বেও সংসদ সদস্যের স্ত্রীর প্রতিষ্ঠানকে কাজ দেওয়া	২০১১	৯৭৫	১৪০	১৪.৩৬
বরগুনা ও পটুয়াখালীতে পোল্ডার নির্মাণ প্রকল্প	অতিরিক্ত ব্লক ব্যবহারের নামে ঠিকাদার ও প্রকল্প কর্মকর্তাদের যোগসাজশে অর্থ আত্মসাৎ	২০১৬	৭২.০৩	১৬.৮৩	২৩.৩৭

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন...

প্রকল্প/ কার্যক্রমের ধরন	দুর্নীতির ধরন	সময় কাল	প্রকল্পের মোট বাজেট (কোটিতে)	দুর্নীতির কারণে আর্থিক ক্ষতি (কোটিতে)	দুর্নীতির কারণে আর্থিক ক্ষতি (শতাংশে)
মনু নদী সেচ ও পাম্পহাউস পুনর্বাসন	কর্মকর্তা ও ঠিকাদারের যোগসাজশে ক্রয়-প্রক্রিয়ায় অনিয়ম ও অতিরিক্ত বিল দেখিয়ে অর্থ আত্মসাৎ	২০১৯	৫৪.৮৩	৩৪.৪২	৬২.৭৮
খুলনার কয়রায় বাঁধ সংস্কার	প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ না করে প্রকল্প কর্মকর্তা কর্তৃক অর্থ আত্মসাৎ	২০২০	০.২৬	০.২০	৭৬.৯২

২.৮. সমন্বয়

সারণি ১০ : সমন্বয়ে চ্যালেঞ্জবিষয়ক পর্যবেক্ষণের সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্র

পর্যবেক্ষণের সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্র	সিডর-২০০৭	আইলা-২০০৯	রোয়ানু-২০১৬	বন্যা-২০১৯	আম্পান-২০২০
দুর্যোগসহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কারে সরকারি আন্তপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়					
দুর্যোগ মোকাবিলা প্রস্তুতিতে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং স্বেচ্ছাসেবকদের সমন্বয়					
ত্রাণ বরাদ্দ ও বিতরণে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়					

	ঘাটতি
	না থাকা

দুর্যোগসহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কারে সমন্বয়ের ঘাটতি রয়েছে। একাধিক সরকারি প্রতিষ্ঠানের সম্পৃক্ততা থাকলেও সমন্বয়ে ঘাটতির ফলে আশ্রয়কেন্দ্রের অভিন্ন নকশা প্রণয়ন, নির্মাণ ও দুর্যোগকালীন সুযোগ-সুবিধা এবং ব্যবহার উপযোগিতা নিশ্চিতে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে।

কয়রায় স্থানীয় জনপ্রতিনিধি কর্তৃক বাঁধ মেরামতের চেষ্টা করলেও সাংসদ কর্তৃক প্রতিশ্রুত থোক বরাদ্দ না করা এবং স্থানীয় প্রশাসন থেকে সহযোগিতার অভাবে উদ্যোগটি বাধাগ্রস্ত হয়েছে।

স্থানীয় জনপ্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতির ফলে যথাসময়ে ত্রাণ না পৌঁছানো এবং একই সুবিধাভোগীর একাধিকবার ত্রাণ পাওয়ার অভিযোগ রয়েছে। দুর্যোগের প্রকৃত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সঠিকভাবে নিরূপণেও সমন্বয়ের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। যেমন আম্পানে ডিডিএম কর্তৃক মোট ২১৯ কোটি টাকার কৃষি ক্ষতি নিরূপণ করা হলেও কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক তা ৫৪ দশমিক ৩৪ শতাংশ কম দেখানো হয়েছে।

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

সার্বিকভাবে দেখা যায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার, জাতীয় আইন, নীতি এবং আদেশাবলী প্রতিপালনে কার্যকর উদ্যোগে ঘাটতি রয়েছে। দুর্যোগ পূর্বাভাস প্রচারে আন্তপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় না থাকায় কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রদান করা হয়। ফলে স্থানীয় পর্যায়ে জরুরি সতর্কবার্তা প্রচারেও ভুল-বোঝাবুঝি সৃষ্টি হয়। দুর্যোগসহনশীল অবকাঠামো (আশ্রয়কেন্দ্র, বাঁধ, রাস্তা ইত্যাদি) নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণে অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে জনদুর্ভোগ ও অর্থনৈতিক ক্ষতি বৃদ্ধি পেলেও অভিযুক্ত সংস্থা ও ব্যক্তিকে জবাবদিহির আওতায় আনতে কার্যকর পদক্ষেপের ঘাটতি রয়েছে। ত্রাণের চাহিদা যাচাই, উপকারভোগী নির্বাচন এবং বিতরণ কার্যক্রমে দুর্নীতি, অনিয়মসহ স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, ন্যায্যতা এবং জন-অংশগ্রহণ নিশ্চিত না করায় প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তরা ত্রাণসহায়তা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। স্থানীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা এবং আন্তপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ের ঘাটতির কারণে দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতির প্রকৃত হিসাব, ত্রাণের চাহিদা নিরূপণ ও সমন্বিত পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ণ না করা এবং তদানুসারে বরাদ্দে ঘাটতি বিদ্যমান। তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘমেয়াদি পুনর্বাসনের উদ্যোগ না নেওয়ায় অতিদরিদ্র শ্রেণির একটি অংশ বাস্তুচ্যুত হয়ে নিকটবর্তী শহরে এবং রাজধানীতে অভিবাসন করেছে। ফলে আরও নতুন জলবায়ুতাড়িত বাস্তুচ্যুতি এবং অভ্যন্তরীণ অভিবাসন বৃদ্ধির আশঙ্কা রয়েছে। এ ছাড়া দুর্যোগ মোকাবিলা ও ব্যবস্থাপনায় সুশাসন নিশ্চিতে মাঠপর্যায়ে পরিচালিত আগের গবেষণাগুলোর সুপারিশ আমলে না নেওয়া এবং তা বাস্তবায়ন না করায় সাম্প্রতিক দুর্যোগেও আগের চিহ্নিত ঘাটতিগুলোর পুনরাবৃত্তি ঘটেছে।

সুপারিশ

১. বিদ্যমান সতর্কবার্তা প্রদান পদ্ধতি হালনাগাদ করে সাধারণ জনগণের বোধগম্য ভাষায় প্রচার করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি এড়াতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্তৃপক্ষকে সতর্কতার সঙ্গে বার্তা প্রচার করতে হবে।

২. ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলগুলোকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে যথাসময়ে পূর্বাভাস ও সতর্কবার্তা দিতে হবে।

৩. অধিকতর বিপদাপন্ন পরিবার ও এলাকাকে প্রাধান্য দিয়ে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম স্বচ্ছতার সঙ্গে পরিচালনা করতে হবে।

৪. ত্রাণ ও পুনর্বাসন-সম্পর্কিত তথ্য জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে তথ্য বাতায়নের মাধ্যমে জনগণের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে।

৫. আপৎকালীন পরিস্থিতি ও দুর্যোগের সম্ভাব্য ঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে স্থানীয় পর্যায়ের কমিটি, স্বেচ্ছাসেবক দল ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনের কার্যকর অংশগ্রহণে দুর্যোগ প্রস্তুতি নিতে হবে।

৬. নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ সুবিধাসংবলিত এবং এলাকাভিত্তিক পর্যাপ্ত আশ্রয়কেন্দ্র নিশ্চিত করতে হবে।

৭. আশ্রয়প্রার্থীদের সংখ্যা বিবেচনায় নিয়ে আশ্রয়কেন্দ্রগুলোয় পর্যাপ্ত খাদ্য, পানি, পয়োনিষ্কাশন ও জরুরি চিকিৎসাসেবার প্রস্তুতি এবং তা সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

৮. ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর নেতৃত্বাধীন অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করে দুর্যোগসহনশীল এবং টেকসই অবকাঠামো যেমন আশ্রয়কেন্দ্র, বাঁধ ও পোল্ডার নির্মাণ, সংস্কার ও পুনর্নির্মাণ করতে হবে।

৯. প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতাসহ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত কার্যক্রমে দুর্নীতি, অনিয়ম ও অপচয় বন্ধে জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে।

১০. প্রকাশিত অনিয়ম-দুর্নীতির স্বচ্ছ তদন্ত সাপেক্ষে দোষীদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ও ফৌজদারি ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

১১. দুর্যোগের ফলে বাস্তুচ্যুত পরিবারগুলোর জীবিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা, নতুন জীবিকার সুযোগ সৃষ্টি এবং দুর্যোগ মোকাবিলায় তাদের সক্ষমতা তৈরিতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

১২. দুর্যোগ মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা, বিশেষ করে নেদারল্যান্ডসের পানি ব্যবস্থাপনার অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে উপকূলীয় অঞ্চলকে সুরক্ষার জন্য কার্যকর মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন অর্থায়ন ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়*

মো. রাজু আহমদ মাসুম ও মু. জাকির হোসেন খান

গবেষণার প্রেক্ষাপট

মানবসৃষ্ট অনিয়ন্ত্রিত শিল্পোন্নয়ন ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জীবাশ্ম জ্বালানির দহনে পৃথিবীর তাপমাত্রা ক্রমশ বাড়ছে, যা ১৯৭০ সাল থেকে উদ্বেগজনক হারে অব্যাহত রয়েছে। ফলে একদিকে যেমন মেরু অঞ্চলের বরফ গলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, অন্যদিকে বিভিন্ন গবেষণায় বন্য ও সামুদ্রিক প্রাণীর আবাসস্থল ধ্বংসের ফলে মানুষের সংস্পর্শে এসে এসব প্রাণীবাহিত বিভিন্ন ভেক্টর বর্ণ ও জুনোটিক রোগের বিস্তার ঘটছে বলে দাবি করা হচ্ছে। ১৯৯৪ সালে জলবায়ু পরিবর্তনকে একটি বৈশ্বিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে তা মোকাবিলায় জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক কনভেনশন (UNFCCC) প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরবর্তী সময়ে প্রাক-শিল্পায়ন যুগের তুলনায় বৈশ্বিক তাপমাত্রা কমপক্ষে ২ ডিগ্রিতে নামিয়ে আনার জন্য ইউএনএফসিসিসির আওতায় বিভিন্ন চুক্তি (১৯৯৭ সালের কিয়োটো চুক্তি, ২০০১ সালে মারাকেশ অ্যাকর্ড, ২০০৭ বালি রোড ম্যাপ, ২০০৯ সালে কোপেনহেগেন অ্যাকর্ড, ২০১২ সালে দোহা অ্যামেন্ডমেন্ট) করা হলেও বাস্তবে শিল্পোন্নত দেশগুলো কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে বৈশ্বিক তাপমাত্রা কমিয়ে আনতে ব্যর্থ হয়। পরে ২০১৬ সালে ১৯৬টি দেশের ঐকমত্যের ভিত্তিতে প্যারিস জলবায়ু চুক্তিতে প্রাক-শিল্পায়ন যুগের তুলনায় বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে নামিয়ে আনা এবং পর্যায়ক্রমে তা ১ দশমিক ৫ ডিগ্রির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে নিজ নিজ দেশ কর্তৃক 'জাতীয় অনুমিত অবদান' (এনডিসি) প্রণয়ন করে। উল্লেখ্য, কোপেনহেগেন অ্যাকর্ডের ধারাবাহিকতায় ২০২০ সালের মধ্যে নতুন প্রতিশ্রুতি হিসেবে উন্নয়ন সহায়তার অতিরিক্ত প্রতিবছর ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রদানের বিষয়টিও প্যারিস চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই তহবিল প্রদানের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন এবং সবুজ জলবায়ু তহবিলের মাধ্যমে তা সরবরাহ ও ব্যবস্থাপনার বিষয়টি পরবর্তী সময়ে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার জলবায়ুবিষয়ক অভীষ্টে উল্লেখ করা হয়েছে (১৩.ক)। এ ছাড়া অভীষ্ট ১৩-এর লক্ষ্য ১৩.২-এ প্রশমনসংক্রান্ত জাতীয় নীতি, কৌশল ও কার্যক্রমে সমন্বয় এবং ১৩.৩-এ প্রশমনবিষয়ক সতর্কতা, সচেতনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বারোপ করা হয়।

বৈশ্বিক প্রশমন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে জাতীয় অংশীদারত্বের প্রতিশ্রুতি পূরণে বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে ২০১৫ সালের তুলনায় কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের হার ৫ শতাংশ এবং আন্তর্জাতিক উৎস হতে তহবিল সহায়তা সাপেক্ষে ১৫ শতাংশ হ্রাসের প্রতিশ্রুতিসংবলিত এনডিসি প্রণয়ন

---

* ২০২০ সালের ৫ নভেম্বর ঢাকায় ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশিত গবেষণার সারসংক্ষেপ।

করে। এ ছাড়া ২০১৬ সালে মরক্কোয় অনুষ্ঠিত কপ-২২ সম্মেলনে বাংলাদেশসহ ৪৭টি স্বল্পোন্নত দেশ ২০৫০ সালের মধ্যে শতভাগ জ্বালানি চাহিদা নবায়নযোগ্য উৎস থেকে সংগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেয়। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, প্রশমন লক্ষ্য অর্জনে ২০১১-২০৩০ সালের মধ্যে প্রশমনসংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রমের জন্য বাংলাদেশ গড়ে প্রতিবছর প্রায় ১১ হাজার ৫০০ কোটি টাকার প্রয়োজনীয়তা প্রাক্কলন করে। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্ম পরিকল্পনা (বিসিসিএসএপি) বাস্তবায়নে অর্থায়নের অন্যতম উৎস হিসেবে কাজ করছে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিল (বিসিসিটিএফ)। বাংলাদেশের অগ্রাধিকার অভিযোজন অর্থায়ন হলেও বিসিসিটিএফ হতে জুন ২০২০ সাল পর্যন্ত ১৭৩টি প্রশমন প্রকল্পে ৬০৮ দশমিক ৬২ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়, যা এই তহবিল হতে মোট অর্থায়নের ১৮ শতাংশ। শুধু তা-ই নয়, প্রতিবছর বাংলাদেশ সরকার জাতীয় উন্নয়ন ব্যয়েও জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমনসংক্রান্ত খাতে নিয়মিত অর্থ বরাদ্দ দিয়ে আসছে।

যেকোনো খাতের সুশাসন পর্যালোচনার জন্য অংশীজন ও তাদের ভূমিকা চিহ্নিতকরণ গবেষণার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাথমিক একটি বিষয়। বাংলাদেশে প্রশমন খাতে সরকারি ও বেসরকারি অর্থায়ন ও নানাবিধ কার্যক্রম থাকলেও এ খাতে অংশীজন ও তাদের ভূমিকা চিহ্নিতকরণ এখনো অনুপস্থিত। ক্লাইমেট ফান্ডস আপডেটের তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় যে বৈশ্বিক বিভিন্ন জলবায়ু তহবিল থেকে বাংলাদেশে এ পর্যন্ত প্রাপ্ত প্রশমন অর্থায়ন বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জাতীয় পর্যায়ের অংশীজনদের মধ্যে রয়েছে বন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়; স্থানীয় সরকার ও গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়; বিদ্যুৎ, শক্তি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয় প্রভৃতি ও মন্ত্রণালয়গুলোর অধীনে থাকা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেওয়া যায় প্রশমন অর্থায়নের ভবিষ্যৎ উদ্যোগের সঙ্গেও বিভিন্ন পর্যায়ে এই প্রতিষ্ঠানগুলো নিবিড়ভাবে জড়িত থাকবে। কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠানের বাস্তবায়িত প্রশমন প্রকল্পগুলোয় সুশাসন চর্চার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে এখনো কোনো নিবিড় গবেষণা করা হয়নি।

বাংলাদেশ সংবিধানের ১৮(ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, বাংলাদেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করার বিষয়টি উল্লেখ করলেও বাস্তবে একের পর এক জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক পরিবেশ বিধ্বংসী কয়লা ও এলএনজিভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করে তা উপেক্ষা করা হচ্ছে। এনডিসিতে প্রতিশ্রুত প্রশমন কার্যক্রমের গুরুত্ব অপরিসীম হলেও বিভিন্ন গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী নির্বিচারে বন ধ্বংস করা হচ্ছে এবং জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহারের ফলে অধিক কার্বন নিঃসরণের মাধ্যমে জাতীয় প্রশমন অঙ্গীকার প্রতিপালনে প্রতিনিয়ত ব্যত্যয় ঘটানো হচ্ছে। এনডিসি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, নিকট ভবিষ্যতে বাংলাদেশে প্রশমন অর্থায়নের কলেবর নিশ্চিতভাবেই বৃদ্ধি পাবে। বাংলাদেশ প্রশমন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ অর্জনে দেশি-বিদেশি উৎস থেকে প্রায় ২ লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকা (২৭ বিলিয়ন ডলার) সংগ্রহ ও ব্যয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করলেও টিআইবির ইতিমধ্যে সম্পন্ন বিভিন্ন গবেষণায় জলবায়ু প্রকল্প বাস্তবায়নে পূর্ব অভিজ্ঞতা অনুযায়ী এই অর্থ ব্যয়ে সুশাসনের ঝুঁকি বিদ্যমান।

টিআইবির জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন বিষয়ে পরিচালিত নানাবিধ গবেষণায় সুশাসনের ঘাটতি ও জলবায়ু অর্থায়ন ব্যবহারে নানাবিধ অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগের বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়েছে। জলবায়ু অভিযোজন অর্থায়নে সুশাসন বিষয়ে নানাবিধ গবেষণা হলেও বাংলাদেশে জাতীয় পর্যায়ে প্রশমন খাতসংশ্লিষ্ট নীতি ও পরিকল্পনার বাস্তবায়ন এবং অংশীজনদের কার্যক্রমে সুশাসনের আঙ্গিকে বিশ্লেষণের ঘাটতি অনুপস্থিত রয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় পর্যায়ে প্রশমন অর্থায়নের ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব ও সম্ভাবনা বিবেচনা করে এ-সংক্রান্ত নিবিড় গবেষণার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বাংলাদেশ সরকার ইতিমধ্যে এনডিসি বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং ভবিষ্যতে প্রশমন অর্থায়নবিষয়ক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে অবদানের সুযোগ হয়েছে। বিদ্যমান প্রশমন অর্থায়ন ও এর ব্যবহারে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত হলে তা উল্লিখিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সুশাসন নিশ্চিতে সহায়ক হবে। এ ছাড়া সামগ্রিকভাবে জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন নিশ্চিতকরণে টিআইবির প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতা হিসেবে এই গবেষণার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য ও পরিধি

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন অর্থায়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনা। গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো :

- প্রশমন অর্থায়ন ও সংশ্লিষ্ট আইন/নীতি, কৌশল, অংশীজনের অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি পর্যালোচনা করা;
- বিসিসিটিএফ অর্থায়নকৃত প্রশমন প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ে সুশাসনের বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা এবং
- চিহ্নিত সুশাসনের চ্যালেঞ্জ উত্তরণে সুপারিশ প্রদান করা।

গবেষণাটিতে প্রশমনসংক্রান্ত জাতীয় নীতি/কৌশল/অঙ্গীকার/প্রতিশ্রুতি, বাংলাদেশে দেশি ও বিদেশি উৎস থেকে প্রশমন অর্থায়ন এবং বিসিসিটিএফ প্রকল্প/কার্যক্রম প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সুশাসনের নির্দেশকের আলোকে পর্যালোচনা করা হয়েছে। গবেষণাটি শুধু বাংলাদেশে জলবায়ু প্রশমন অর্থায়ন এবং কার্যক্রমের ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়েছে। জলবায়ু অভিযোজনসংক্রান্ত অর্থায়ন ও কার্যক্রম এই গবেষণার আওতাভুক্ত নয়।

গবেষণাপদ্ধতি

এটি একটি মিশ্র পদ্ধতির গবেষণা। গবেষণাটিতে গুণগত ও পরিমাণগত উভয় পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণা উদ্দেশ্য বিবেচনায় মোট চার ধরনের গবেষণা টুলস (স্থাপনাগুলোর উপস্থিতি জরিপ, মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ এবং দলীয় আলোচনা) ব্যবহার করে সুনির্দিষ্ট সূচকের ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

সারণি ১ : গবেষণায় ব্যবহৃত তথ্যের ধরন, তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ও তথ্যের উৎস

তথ্যের ধরন	তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি	তথ্যের উৎস
প্রত্যক্ষ তথ্য	মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার (৩৮ জন)	• প্রশমন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি; প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারী; স্থানীয় জনপ্রশাসনে নিযুক্ত কর্মকর্তা; স্থানীয় জনপ্রতিনিধি; প্রকল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার ও অর্থায়নকারী সংস্থার প্রতিনিধি
	ফোকাস দলীয় আলোচনা (২৯টি)	• প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত স্থানীয় জনগণ
	সরেজমিন পর্যবেক্ষণ (৭টি প্রকল্প এলাকা)	• প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকা
	জিপিএস কর্তৃক শনাক্তকরণ	• প্রশমন প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত দুটি প্রকল্পের সব সৌরবিদ্যুৎভিত্তিক প্রতিটি সড়কবাতির স্থান, সড়কবাতির কার্যকারিতার প্রামাণ্য চিত্র জিপিএসের মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে
পরোক্ষ তথ্য	আধেয় বিশ্লেষণ	• সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি, নীতিমালা, নির্দেশিকা; প্রাসঙ্গিক গবেষণা প্রতিবেদন; অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক প্রতিবেদন; প্রকল্প প্রস্তাবনা ও ওয়েবসাইট

এই গবেষণায় প্রশমন অর্থায়ন ব্যবহারে সুশাসন পর্যালোচনার জন্য বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিলের অর্থায়িত ৭টি প্রকল্প নির্বাচন করা হয়েছে; যার আর্থিক মূল্য বিসিসিটিএফের প্রশমন খাতে বরাদ্দকৃত তহবিলের ১১ শতাংশ। আন্তর্জাতিক উৎস থেকে বাস্তবায়িত প্রকল্প গবেষণাকালের বেশ আগেই সম্পন্ন হওয়ায় প্রকল্প প্রণয়ন, অনুমোদন ও বাস্তবায়নে সুশাসনসংক্রান্ত তথ্যপ্রাপ্তির অনিশ্চয়তা বিবেচনায় গবেষণার জন্য শুধু বিসিসিটিএফ অর্থায়নকৃত প্রকল্প বেছে নেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, একই ধরনের প্রতিষ্ঠান দেশীয় ও আন্তর্জাতিক তহবিলের বাস্তবায়নে যুক্ত রয়েছে। বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান, বাস্তবায়ন কাল, কাজের ধরন ও বরাদ্দের পরিমাণ বিবেচনায় প্রকল্পগুলো নির্বাচন করা হয়েছে এবং সুশাসনের ৬টি নির্দেশকের (সক্ষমতা, সামঞ্জস্যতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, জন অংশগ্রহণ এবং অনিয়ম-দুর্নীতি) আলোকে প্রকল্পগুলোয় সুশাসন চর্চা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

গবেষণার ফলাফল

বাংলাদেশে জলবায়ু প্রশমন অর্থায়ন

২০৩০ সালের মধ্যে দেশি-বিদেশি উৎস থেকে প্রাক্কলিত প্রায় ২ লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকা জোগানের পরিকল্পনার বিপরীতে ২০১৯ সাল পর্যন্ত এই অর্থের মাত্র ৬ শতাংশ (১২,৬৯৯.৭০ কোটি টাকা) তহবিল আন্তর্জাতিক উৎস থেকে প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে জলবায়ু

পরিবর্তন প্রশমনে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় উৎস থেকে ২০২০ সাল নাগাদ যথাক্রমে ৬০৮ দশমিক ৬২ কোটি টাকা এবং ১২,০৯১ দশমিক ০৮ কোটি টাকা অর্থায়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিলের (বিসিসিটিএফ) মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে অর্থায়ন করা হয়েছে এবং গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফ্যাসিলিটি (জিইএফ), স্পেসিফিক ইনভেস্টমেন্ট লোন (এসআইএল), ক্লাইমেট ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড (সিআইএফ), গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ), বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ রেজিলিয়েন্স ফান্ডের (বিসিসিআরএফ) মাধ্যমে আন্তর্জাতিক উৎস থেকে প্রশমন কার্যক্রমে তহবিল সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রশমন কার্যক্রমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অর্থায়নের অনুপাত যথাক্রমে ৫:৯৫। বাংলাদেশে প্রশমন অর্থায়নের সিংহভাগ আন্তর্জাতিক উৎস থেকে সংগ্রহ করা হলেও এই আন্তর্জাতিক উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থায়নের মাত্র ৬৭ শতাংশ অর্থ শুধু প্রশমনসংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে ব্যয় করা হয়েছে। উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিলে প্রশমন প্রকল্প বাস্তবায়নকারী জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সরাসরি অভিগম্যতা না থাকায় প্রকল্পে অর্থায়ন ও তা বাস্তবায়নে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার ওপরে জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে নির্ভর করতে হয় এবং এই নির্ভরশীলতার কারণে তহবিল ব্যবস্থাপনায় ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

শুধু তা-ই নয়, শিল্পোন্নত দেশগুলো থেকে অনুদানভিত্তিক অর্থায়নের প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হলেও আন্তর্জাতিক উৎস থেকে ২০১৯ সাল নাগাদ বাংলাদেশকে প্রদত্ত প্রশমন অর্থায়নের প্রায় ১২,০৯১ দশমিক ০৮ কোটি টাকার মাত্র ১৫ শতাংশ অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে প্রশমন কার্যক্রম/প্রকল্প বাস্তবায়নরত জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোনো কার্যকর সমন্বয় ও আন্তপ্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ না থাকায় এনডিসির প্রশমন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ সম্ভাব্য উৎস থেকে প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহে যথাযথ কৌশল গ্রহণ এবং সম্ভাব্য উৎস থেকে প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহে এখনো আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। জাতীয় অবদান ও গুরুত্বভেদে প্রশমন কার্যক্রমগুলোর খাত ও সময়ভিত্তিক কোনো প্রাধিকার ক্রম নির্ধারণ করা নেই, ফলে আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিলে বাংলাদেশের দুর্বল অভিগম্যতা এবং সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে প্রশমন কার্যক্রম/ প্রকল্প বাস্তবায়নরত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোনো কার্যকর সমন্বয় ও আন্তপ্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ অনুপস্থিত।

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন কার্যক্রমে জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানগুলোর সহযোগী হিসেবে বিভিন্ন পর্যায়ের আন্তর্জাতিক অংশীজনরাও বিভিন্ন প্রশমন কার্যক্রমে অর্থায়ন ও আন্তর্জাতিক তহবিল ও সহায়তা থেকে এ খাতে প্রাপ্য অর্থের জিম্মাদারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তবে বাংলাদেশে বাস্তবায়িত প্রশমন প্রকল্প/কার্যক্রমের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করছে জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান। জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানগুলোর পাশাপাশি প্রকল্প/কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়ন তদারকি ও মূল্যায়ন কার্যক্রমের সীমিত পরিসরে কাজ করছে প্রশমন কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক অংশীজনরা। নিচে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অংশীজনদের ধরনভেদে বাংলাদেশে প্রশমন কার্যক্রমের একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হলো।

সারণি ২ : বাংলাদেশে প্রশমন কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট অংশীজন

প্রশমন কার্যক্রমের ধরন	অংশীজনের ধরন
প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও নবায়নযোগ্য শক্তি	আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠান
	বৈদেশিক উন্নয়ন সংস্থা
	আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক ব্যাংক
	জাতীয় প্রতিষ্ঠান
জীববৈচিত্র্য ও বনায়ন	বৈদেশিক উন্নয়ন সংস্থা
	আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক ব্যাংক
	জাতীয় প্রতিষ্ঠান
বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, গবেষণা, সক্ষমতা বৃদ্ধি ও অন্যান্য	জাতীয় প্রতিষ্ঠান

প্যারিস জলবায়ু চুক্তির রূপরেখা অনুসারে বাংলাদেশ এনডিসিতে জাতীয় প্রশমন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। এই লক্ষ্যমাত্রার আলোকে বাংলাদেশ নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং উপকূলীয় বনের সীমা বৃদ্ধিকে গুরুত্ব দিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অংশীজনদের সমন্বয়ে জলবায়ু প্রশমন সহায়ক প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও নবায়নযোগ্য শক্তি, বনায়ন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। কার্যক্রমের ধরনভেদে বিসিসিটিএফ থেকে প্রদত্ত তহবিলের প্রায় ৫২ শতাংশ তহবিল (৩১৬ কোটি টাকা) বনায়ন ও বন ব্যাবস্থাপনায়, ৩২ শতাংশ তহবিল (১৯৫ কোটি টাকা) নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনে এবং ১৬ শতাংশ তহবিল (৯৮ কোটি টাকা) প্রশমনসংক্রান্ত অন্যান্য কাজে ব্যয় করা হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমনসংশ্লিষ্ট জাতীয় নীতি, কৌশল, অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি পর্যালোচনা

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রশমনবিষয়ক বা বৈশ্বিক গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ হ্রাসে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা এবং কার্যক্রমের উল্লেখ রয়েছে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা ২০০৯, জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অনুমিত অবদান (এনডিসি), ২০১৫ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা ২০০৮-এ। নিচে পর্যায়ক্রমে উল্লিখিত প্রশমন অর্থায়ন ও সংশ্লিষ্ট আইন/নীতি, কৌশল, অংশীজনের অঙ্গীকার ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হলো।

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (বিসিসিএসএপি), ২০০৯ : জাতীয় পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমনে কার্যকর অবদান রাখতে বিসিসিএসএপিতে জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা ও গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ কমাতে একটি কৌশলগত জ্বালানি পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। বাস্তবে গত ১১ বছরেও জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতসহ ও গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ কমাতে সময়াবদ্ধ সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যভিত্তিক রোডম্যাপ তৈরি হয়নি। ফলে নবায়নযোগ্য খাত থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিষয়ে অগ্রাধিকারভিত্তিক বিনিয়োগ/অর্থায়নের বিষয়ে কোনো কৌশলগত দিকনির্দেশনা না থাকায় সহজেই পরিবেশ বিধ্বংসী কয়লা ও এলএনজিতে ব্যাপকভাবে বিনিয়োগের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়া বিসিসিএসএপিতে অভিযোজন ও

প্রশমন অর্থায়নের সুনির্দিষ্ট অনুপাত ও কার্যক্রমের ধরনভিত্তিক কোনো অগ্রাধিকার ক্রম নির্ধারিত না থাকায় প্রশমন অর্থায়ন ও প্রকল্প বাস্তবায়নে পরিবেশ সংরক্ষণ ও কার্বন নিঃসরণ কমানোর চেয়ে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর স্বার্থই অধিক গুরুত্ব পাচ্ছে।

কৌশলগত জ্বালানি পরিকল্পনা প্রণয়নের পাশাপাশি এই কৌশলপত্রে দেশব্যাপী সামাজিক বনায়ন ও উপকূলীয় এলাকায় সবুজ বেষ্টনীর পরিধি বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে বন অধিদপ্তর সবুজ বেষ্টনী সৃষ্টির মাধ্যমে উপকূল সুরক্ষায় একাধিক প্রকল্প গ্রহণ করলেও বাস্তবে দুর্যোগ মোকাবিলায় তার কার্যকারিতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। বাংলাদেশের উপকূল সুরক্ষায় সবচেয়ে কার্যকর ম্যানগ্রোভ সুন্দরবনের ১০ কিমির মধ্যে এবং সংরক্ষিত আরও কিছু উপকূলীয় বনের কাছে কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্রসহ অপরিকল্পিত শিল্পায়ন করা হচ্ছে, যা এই কৌশলপত্রের প্রশমন ধারণার সঙ্গে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক।

শুধু তা-ই নয়, এই কৌশলপত্রের আলোকে শিল্পোন্নত দেশগুলো থেকে জুতসই এবং কার্যকর প্রযুক্তি আমদানি এবং ব্যবহার নিশ্চিত করার কথা বলা হলেও বাস্তবে প্রশমনে সহায়ক প্রযুক্তির আমদানির ধরন ও তার ব্যবহার নিশ্চিত করার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কৌশল নেই। উল্টো ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সৌরবিদ্যুতের প্যানেল আমদানিতে ১০ শতাংশ শুল্ক ও কর আরোপের মাধ্যমে এ খাতে উৎপাদন ও বিপণনের সঙ্গে যুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে একধরনের নেতিবাচক প্রণোদনা দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে কয়লা ও অন্যান্য জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে জাতীয় অর্থায়ন ও বিভিন্ন ছাড় দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে কয়লা ও অন্যান্য জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে জাতীয় অর্থায়ন ও বিভিন্ন ছাড় দেওয়া (যেমন কয়লা আমদানিতে ১০ শতাংশ মূসক ছাড়, বিদেশি কর্মী ও কোম্পানির আয়ের ওপর কর হার সম্পূর্ণ মওকুফ ইত্যাদি), যা বিসিসিএসএপিতে কৌশলগত জ্বালানি পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যমাত্রার পুরো বিপরীত। জাতীয় পর্যায়ে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিপণনের সঙ্গে যুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রণোদনা দেওয়াসংক্রান্ত নীতি/দিকনির্দেশিকা দেওয়া হয়নি এই কৌশলপত্রে।

জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অনুমিত অবদান (এনডিসি), ২০১৫ : এনডিসিতে বাংলাদেশের প্রশমনবিষয়ক প্রতিশ্রুতির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো ২০৩০ সালের মধ্যে বায়ুবিদ্যুৎ ৪০০ এবং সৌরবিদ্যুতের উৎপাদন ১ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত করা। অথচ দেশি-বিদেশি লবির স্বার্থে নবায়নযোগ্য জ্বালানির পরিবর্তে বাংলাদেশ এই লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত মাত্র ২ দশমিক ৯ মেগাওয়াট (০.০০৭ শতাংশ) বায়ুবিদ্যুৎ এবং ৩৩৮ দশমিক ৬৫ মেগাওয়াট (৩৩.৯ শতাংশ) সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা অর্জন করেছে, যা প্রত্যাশার তুলনায় অনেক কম। এই নবায়নযোগ্য শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে যে সীমাবদ্ধতা দেখানো হয়েছে তা-ও বাস্তবসম্মত নয়। বিভিন্ন গবেষণায় ২০৪১ সাল নাগাদ ৪০ হাজার মেগাওয়াট নবায়নযোগ্য শক্তিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা থাকলেও বাস্তবে সে লক্ষ্যমাত্রা অনেক কম দেখানো হয়েছে। এ ছাড়া স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর চাপে নবায়নযোগ্য শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে অগ্রাধিকার না দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনার সিংহভাগই দূষিত কয়লা এবং আরও অধিক দূষণকারী এলএনজিসহ জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে বার্ষিক ১১৫ মিলিয়ন টন কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমন হবে, যা এনডিসিতে উল্লিখিত প্রশমন লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে পুরোপুরি

সাংঘর্ষিক। শুধু তা-ই নয়, বিদেশি বিনিয়োগকারীদের ব্যবসায়িক সুবিধার্থে প্রণীত পাওয়ার সিস্টেম মাস্টারপ্ল্যান (পিএসএমপি) ২০১৬ বাস্তবায়ন করতে সরকার কর্তৃক প্যারিস চুক্তি এবং টেকসই উন্নয়নবিরোধী অবস্থান গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে কয়লানির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদনে অগ্রাধিকার প্রদান করা হলেও পরে অর্থাভাবে ও আন্তর্জাতিক চাপে কয়লানির্ভরতা থেকে সরে এসে অধিক পরিবেশ বিধ্বংসী এলএনজিসহ জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক খাতে ব্যাপক বিনিয়োগ পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

পরিবহন খাতেও ২০১৫ সালের তুলনায় ১৫ শতাংশ গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ কমানোর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হলেও কীভাবে এই হার কমানো হবে, সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা করা হয়নি। পরিবেশদূষণের ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলে রাজধানী ঢাকা ইতিমধ্যে বায়ুদূষণে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় শহরগুলোর তালিকায় স্থান পেয়েছে। নাসার তথ্যমতে, গত ১০ বছরে ঢাকার বাতাসে দূষণের মাত্রা ৮৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ পরিবেশ অধিদপ্তরের মতে, ঢাকার বায়ুদূষণ বৃদ্ধিতে ইটভাটার পাশাপাশি ফিটনেসবিহীন যানবাহনের কালো ধোঁয়াও অনেকাংশে দায়ী। তবে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর চাপে তা কমাতে এখনো সরকারের পক্ষ থেকে তেমন কোনো কার্যকর কোনো উদ্যোগ লক্ষ করা যায়নি এবং নিয়মিতভাবেই ঢাকার বায়ুমানের অবনতি ঘটছে। পরিবহন খাতের পাশাপাশি এনডিসিতে শিল্প শক্তি ব্যয়ের ১০ শতাংশ অপচয় রোধের প্রতিশ্রুতি থাকলেও এ বিষয়ে সরকারের পদক্ষেপ সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। এমনকি শিল্প কিংবা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোয় উৎপাদিত উদ্বৃত্ত সৌরবিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত করার কোনো সুযোগ তৈরিসহ এই খাতে শক্তি ব্যয় অপচয় রোধে প্রতিষ্ঠানগুলোকে কোনো প্রণোদনার সুযোগও দেওয়া হয়নি।

নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা, ২০০৮ : নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো ২০৫০ সালের মধ্যে দেশে কার্বন নির্গমন ৮০ শতাংশ কমিয়ে আনা। যদিও বাস্তবে ২০০০-২০১৫ সাল নাগাদ বিদ্যুৎ উৎপাদনে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার ৯৫ শতাংশ থেকে বেড়ে ৯৯ শতাংশে উন্নীত হয়েছে এবং ২০০০-২০১৬ সাল নাগাদ মাথাপিছু কার্বন নিঃসরণ দ্বিগুণ বৃদ্ধি (০.২ মেট্রিক টন থেকে ০.৪৬ মেট্রিক টন বৃদ্ধি) পেয়েছে, যা এই নীতির লক্ষ্য অর্জনের ধারণার সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। পাশাপাশি ২০২১ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য শক্তি থেকে দেশের মোট বিদ্যুতের ১০ শতাংশ উৎপাদনের কথা থাকলেও বর্তমানে এই হার মাত্র শূন্য দশমিক ০৩ শতাংশ। এ ছাড়া এই নীতিমালার আলোকে নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহারের জন্য যন্ত্রাংশ এবং সরঞ্জাম তৈরিতে ব্যবহৃত সব কাঁচামাল ও যন্ত্রাংশে ১৫ শতাংশ হারে মূল্য সংযোজন কর (মূসক) অব্যাহতির কথা থাকলেও ২০২০-২১ অর্থবছরে শর্তসাপেক্ষে ৬০ এএমপি পর্যন্ত ব্যাটারি কেনার ক্ষেত্রে মূসক অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে, তবে এর বাতি এবং যন্ত্রাংশের আমদানির ওপর ৩১ শতাংশ কর এখনো অব্যাহত রয়েছে। এমনকি ২০০৮-এর পর এনডিসি ও বৈশ্বিক প্রতিশ্রুতির পরিপ্রেক্ষিতে ১৫ শতাংশ প্রশমন পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই নীতি ও লক্ষ্যমাত্রা হালনাগাদ করা হয়নি।

বিসিসিটিএফ অর্থায়নকৃত প্রশমন প্রকল্পে সুশাসন চর্চা : প্রকল্প প্রস্তাবনা ও বাস্তবায়ন সামঞ্জস্যতা

গবেষণাধীন সাতটি প্রকল্পের প্রস্তাবনায় সুনির্দিষ্ট প্রত্যাশিত ফলাফলে উল্লেখের বাইরে যদি প্রকল্পে প্রস্তাবিত কার্যক্রমের কথা বিবেচনা করা হয়, তবে দেখা যায় সাতটি প্রকল্পের মধ্যে চারটির ক্ষেত্রে

বনায়ন, তিনটি নবায়নযোগ্য জ্বালানিসংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। অনুমোদিত প্রকল্প প্রস্তাবনার সঙ্গে বাস্তবায়নের সামঞ্জস্যতা পরীক্ষা করে দেখা গেছে, একটি প্রকল্প ব্যতীত বাকি ছয়টি প্রকল্পেই প্রস্তাবনার সঙ্গে বাস্তবায়নে বিভিন্ন ধরন ও মাত্রার অসামঞ্জস্যতা রয়েছে। বনায়নের প্রকল্পগুলোর মধ্যে দুটি প্রকল্পে আংশিক বনায়ন করে প্রকল্প কার্যক্রম সমাপ্ত করা হয়েছে এবং অপর দুটি প্রকল্পে প্রস্তাবিত গাছের প্রজাতি বৈচিত্র্য রক্ষা করা হয়নি। নবায়নযোগ্য জ্বালানির তিনটি প্রকল্পের দুটি সড়কবাতিসংক্রান্ত প্রকল্প, যেখানে একটি প্রকল্পে প্রস্তাবনার উল্লিখিত রাস্তায় সড়কবাতি স্থাপন না করে অন্য স্থানে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার ইচ্ছামতো সড়কবাতি স্থাপন করা হয়েছে। অপর যে প্রকল্পের আওতায় সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে, সেখানেও প্রস্তাবনায় উল্লিখিত ৬৫০ কিলোওয়াট লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ভোক্তা পর্যায়ে মাত্র ৫০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে।

বিসিসিটিএফ অর্থায়নকৃত প্রশমন প্রকল্পে সুশাসন চর্চা : স্বচ্ছতা

গবেষণায় নির্বাচিত সাতটি প্রকল্পের মধ্যে পাঁচটি প্রকল্পের স্থানীয় বাস্তবায়ন কার্যালয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তার উপস্থিতি এবং চাহিদাভিত্তিক তথ্য প্রদানের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। সাতটি প্রকল্পের মধ্যে পাঁচটিতে তথ্য বোর্ড থাকলেও তথ্য বোর্ডে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলির ঘাটতি রয়েছে এবং কিছু ক্ষেত্রে জনদৃষ্টির আড়ালে নামসর্বস্ব তথ্য বোর্ডগুলো বসানো হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি সংবলিত তথ্য বোর্ড না থাকলেও স্থানীয় প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিদের স্থানীয়ভাবে রাজনৈতিক সুবিধার জন্য প্রকল্প এলাকার বিভিন্ন স্থানে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। এ ছাড়া জাতীয় তথ্য বাতায়নে অঞ্চল এবং প্রতিষ্ঠানভিত্তিক তথ্য প্রকাশ ও হালনাগাদের সুযোগ রাখা হলেও প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলোর পক্ষ থেকে অঞ্চলভিত্তিক তথ্য বাতায়নে তথ্য হালনাগাদের বিষয়টি অনুপস্থিত।

বিসিসিটিএফ অর্থায়নকৃত প্রশমন প্রকল্পে সুশাসন চর্চা : জবাবদিহি

জলবায়ু অর্থায়ন ব্যবহারে জবাবদিহি পর্যালোচনায় এই গবেষণায় প্রকল্পসমূহের তদারকি, নিরীক্ষা, মূল্যায়ন ও অভিযোগ নিরসনব্যবস্থাকে জবাবদিহির নির্দেশক হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তদারকি : গবেষণায় নির্বাচিত সাতটি প্রকল্পের সবগুলোই বাস্তবায়নকারী স্থানীয় কার্যালয়ের কর্মকর্তা কর্তৃক পরিবীক্ষণ করার দাবি করলেও বাস্তবে এই তদারকির কোনো লিখিত প্রতিবেদন প্রস্তুত ও তা সংরক্ষণের চর্চা নেই।

বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়ের তদারকি : গবেষণাধীন সাতটি প্রকল্পের মধ্যে কেবলমাত্র দুটি প্রকল্পে মন্ত্রণালয়ের পরিবীক্ষণ দল তদারকিতে গেছে বলে জানিয়েছেন বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ এবং গবেষণায় অংশগ্রহণকারী তথ্যদাতারা।

অর্থায়নকারী সংস্থা কর্তৃক পরিদর্শন ও তদারকি : প্রতিটি প্রকল্পেই ট্রাস্ট তহবিল থেকে কর্মকর্তারা সরেজমিনে দুইবার পর্যবেক্ষণ বা তদারকি করেছেন।

স্থানীয় জনপ্রশাসন বা জনপ্রতিনিধিদের তদারকি : স্থানীয় জনপ্রশাসন বা জনপ্রতিনিধিদের প্রকল্পগুলোতে তদারকিতে সম্পৃক্ত থাকার যে প্রবিধান রয়েছে, তা সাতটির মধ্যে ছয়টি প্রকল্পেই অনুসরণ করা হয়নি। কেবলমাত্র যেসব প্রকল্পের বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে জনপ্রতিনিধিরা

রয়েছেন, তারা বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের বিকল্প হিসেবে তদারকি করেছেন। অন্য প্রকল্পগুলোতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা গবেষণাধীন প্রকল্প সম্পর্কে তেমন কিছুই জানেন না বলে তথ্য দিয়েছেন।

আইএমইডি কর্তৃক মূল্যায়ন ও মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় কর্তৃক নিরীক্ষা : গবেষণায় নির্বাচিত সাতটি প্রকল্পের সবগুলো সমাপ্ত হলেও কোনো প্রকল্পই আইএমইডি কর্তৃক মূল্যায়ন এবং মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় কর্তৃক নিরীক্ষা করা হয়নি।

আনুষ্ঠানিক অভিযোগ নিরসনব্যবস্থা : গবেষণাধীন কোনো প্রকল্পেই কোনো আনুষ্ঠানিক অভিযোগ নিরসনব্যবস্থা নেই। বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ জানায়, কেউ অভিযোগ করলে তারা ব্যবস্থা নেয়। তবে কোনো অভিযোগ তারা এ পর্যন্ত পায়নি।

বিসিসিটিএফ অর্থায়নকৃত প্রশমন প্রকল্পে সুশাসন চর্চা : জন অংশগ্রহণ

প্রকল্প প্রণয়নে স্থানীয় জনসাধারণের অংশগ্রহণ : পর্যবেক্ষণকৃত সাতটির মধ্যে কেবল একটি প্রকল্পে স্থানীয় পর্যায়ে সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও এর উত্তরণের উপায় নির্ণয় করতে স্থানীয় পর্যায়ে সভা করা হয়েছে।

প্রকল্প তদারকিতে জন অংশগ্রহণ : গবেষণাধীন সাতটির মধ্যে কোনো প্রকল্পেই প্রকল্পের উপকারভোগী, প্রকল্পের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণ ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে তদারকিতে সম্পৃক্ত করা হয়নি।

নারী ও অতিদরিদ্রদের মতামত গ্রহণ : প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও তদারকিতে জন অংশগ্রহণ, বিশেষত নারী ও অতিদরিদ্রের মতামতের বাধ্যবাধকতা থাকলেও শুধু একটি প্রকল্পে স্থানীয় সুবিধাভোগীদের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। বাকি ছয়টি প্রকল্পের কোনোটিতেই মতামত প্রদানের জন্য স্থানীয় নারীদের বা অতিদরিদ্রদের কাউকেই আহ্বান করা হয়নি।

বিসিসিটিএফ অর্থায়নকৃত প্রশমন প্রকল্পে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ : অনিয়ম-দুর্নীতি

গবেষণার আওতাভুক্ত সাতটি প্রকল্পের সবগুলো প্রকল্পেই বিবিধ অনিয়ম ও দুর্নীতির চিত্র বিদ্যমান। এ ক্ষেত্রে সাতটি প্রকল্পের সবগুলোই রাজনৈতিক সুপারিশের ভিত্তিতে অনুমোদন করা হয়েছে; যার মধ্যে তিনটি প্রকল্পের অনুমোদনে তৎকালীন একজন মন্ত্রীর ব্যক্তিগত সহকারীকে ১০ শতাংশ প্রকল্প অর্থ অগ্রিম ঘুষ দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। একটি প্রকল্পের আওতায় ৬৫০ কিলোওয়াট সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হলেও ভোক্তা পর্যায়ে দৈনিক মাত্র ৫০ কিলোওয়াটের বেশি বিদ্যুৎ সরবরাহের নির্বাহী আদেশ না থাকায় বিদ্যুতের অপচয় করা হচ্ছে। যেখানে প্রকল্পটির আওতায় উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে সংযুক্ত করার সুযোগ না থাকায় অবমুক্তকরণের নামে ২০১৭ সাল থেকে প্রতিবছর প্রায় ১৮০ মেগাওয়াট বিদ্যুতের অপচয় করা হচ্ছে। সড়কবাতিসংক্রান্ত দুটি প্রকল্পের প্রস্তাবনা অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যথাযথভাবে যাচাই না করেই অতিরিক্ত ব্যয় প্রাক্কলনসহ প্রকল্প দুটির অনুমোদন দিয়েছে। শুধু তা-ই নয়, একই সময়ে একই ধরনের সক্ষমতার প্রকল্প দুটি অনুমোদিত হলেও প্রকল্প দুটির আওতায় স্থাপিত সড়কবাতির ইউনিট প্রতি মূল্যের পার্থক্য প্রায় ১ লাখ ১ হাজার টাকা। এই দুটি প্রকল্পের মধ্যে যেই প্রকল্পে সড়কবাতির ইউনিট মূল্য সবচেয়ে বেশি নির্ধারণ করা হয়েছে সেই প্রকল্পটির প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রণয়ন, অনুমোদন, বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান

ও ঠিকাদার নির্বাচনে এক মন্ত্রীর এক প্রাক্তন সহকারী প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছেন এবং প্রকল্পটির মেয়াদ শেষের আগেই সেই প্রকল্পের প্রায় অর্ধেক সড়কবাতি অকার্যকর হয়ে গেছে।

সারণি ৩ : প্রকল্প বাস্তবায়নে অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রাক্কলিত আর্থিক মূল্য

প্রকল্প	কার্যক্রমভিত্তিক অনিয়ম ও দুর্নীতি	অনিয়ম ও দুর্নীতির আর্থিক মূল্য (টাকা)
প্রকল্প-১	বনায়নের জন্য বরাদ্দকৃত ৩ দশমিক ২৮ কোটি টাকার ৪০ শতাংশ তহবিল আত্মসাৎ	১,৩১,০০,০০০
প্রকল্প-২	প্রায় ১ লাখ চারাগাছ কম লাগানোর অভিযোগসহ প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যানবাহন ও অফিস সরঞ্জাম প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যালয় থেকে উধাও	৫৬,২৫,০০০
প্রকল্প-৩	নিম্নমানের চারা রোপণসহ, প্রকল্পের উল্লিখিত কার্যক্রমের আংশিক বাস্তবায়ন ও ব্যয় দেখিয়ে বরাদ্দকৃত তহবিলের অংশবিশেষ আত্মসাৎ	১,৮৪,৪২,০০০
প্রকল্প-৪	প্রকল্পের ৫০ শতাংশ কাজ বাস্তবায়ন করে বাকি অর্ধেকের মতো তহবিল আত্মসাৎ	৮,৬৬,০০,০০০
প্রকল্প-৫	২৮ শতাংশ অতিরিক্ত ব্যয় প্রাক্কলন	৫৫,৯০,২০০
প্রকল্প-৬	একর প্রতি ১১ লাখ টাকা অতিরিক্ত দামে ৪ একর জমি ক্রয়সহ অতিরিক্ত ব্যয় প্রাক্কলন	২৩,৪৪,০০,০০০
প্রকল্প-৭	৭০ শতাংশ অতিরিক্ত ব্যয় প্রাক্কলন	৬৯,৮৮,৮০০

ওপরে প্রকল্পভিত্তিক অনিয়ম ও দুর্নীতির একটি চিত্র উল্লেখ করা হলো যেখানে দেখা যায়, সাতটি প্রকল্পে অর্থায়নকৃত ৬৮ দশমিক ১৬ কোটি টাকার প্রায় ৫৪ দশমিক ৪ শতাংশ অর্থই (প্রায় ৩৭.০৭ কোটি টাকা) বিভিন্নভাবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় ও আঁতাতের মাধ্যমে অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে আত্মসাৎ বা অপচয় করা হয়েছে।

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

গবেষণাটির ফলাফল বিশ্লেষণের ভিত্তিতে সার্বিকভাবে বলা যায় এনডিসিতে প্রতিশ্রুত ১৫ শতাংশ প্রশমন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকারের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক উৎস থেকে তহবিল সংগ্রহে কোনো পথনকশা না থাকা এবং কার্যকর পদক্ষেপের অভাবে আন্তর্জাতিক তহবিল থেকে সরাসরি তহবিল সংগ্রহে জাতীয় প্রতিষ্ঠানের কার্যকর অভিগম্যতা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। পরিবেশ সুরক্ষায় সাংবিধানিক অঙ্গীকার ও প্রশমনের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতিকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে নবায়নযোগ্য উৎস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিনিয়োগ না করে উল্টো কয়লা ও এলএনজিভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে ব্যাপকভাবে বিনিয়োগ করা হচ্ছে। প্রশমন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা, জন অংশগ্রহণ ব্যবস্থা, স্থানীয়ভাবে প্রকল্পের চাহিদা এবং গুরুত্ব বিবেচনা না করে রাজনৈতিক বিবেচনায় প্রকল্পে অর্থায়ন, অনুমোদন এবং বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রশমন

কার্যক্রমের স্থান ও সময়ভিত্তিক কোনো প্রাধিকার ক্রম নির্ধারিত না থাকার সুযোগে রাজনৈতিক প্রভাব ব্যবহার করে অনিয়ম-দুর্নীতির উদ্দেশ্যে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের প্রবণতা বিদ্যমান। প্রকল্প বাস্তবায়ন নীতি নিয়মিত লঙ্ঘন করলেও অভিযুক্ত সংস্থাকে জবাবদিহির আওতায় আনা হয়নি। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে প্রশমন প্রকল্প প্রণয়ন, অর্থায়ন, কার্যক্রম বাস্তবায়ন, তদারকি, নিরীক্ষা ও মূল্যায়নে সংশ্লিষ্ট আইএমইডি এবং মহাহিসাব নিরীক্ষকের অধিদপ্তরের সঙ্গে বিসিসিটিএফের মধ্যে আন্তপ্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ ও কোনো কার্যকর সমন্বয় ব্যবস্থা নেই।

সুপারিশমালা

জলবায়ু প্রশমন অর্থায়ন ও নীতি/কৌশল/অঙ্গীকার বাস্তবায়ন

১. অবিলম্বে প্যারিস চুক্তিতে প্রতিশ্রুত অনুদানভিত্তিক প্রশমন অর্থায়ন নিশ্চিতকরণে উন্নত রাষ্ট্রগুলোর ওপর বাংলাদেশের নেতৃত্বে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর ঐক্যবদ্ধ কূটনৈতিক চাপ প্রয়োগ করতে হবে।

২. জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সবুজ জলবায়ু তহবিলসহ আন্তর্জাতিক তহবিলে অভিগম্যতা অর্জনে আন্তপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ের মাধ্যমে কার্যকর পথনকশা প্রণয়ন করতে হবে।

৩. কয়লা ও এলএনজির মতো জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক শক্তিতে বিনিয়োগ বন্ধ করে নবায়নযোগ্য খাতে বিনিয়োগ ও অর্থায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

৪. নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের অযৌক্তিক ব্যয় কমিয়ে সুলভে উৎপাদনে সরকারি প্রকল্পের মতো বেসরকারি খাতে বিনিয়োগকারীদেরও একই ধরনের প্রণোদনা (কর অব্যাহতি এবং ক্যাপাসিটি চার্জমুক্ত) প্রদান করতে হবে।

৫. বনায়ন ও বন্য প্রাণী আবাস সংরক্ষণসহ বন ব্যবস্থাপনায় অগ্রাধিকারমূলক প্রশমন অর্থায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

প্রশমন প্রকল্প/কার্যক্রম বাস্তবায়নে সুশাসন

৬. প্রশমন কার্যক্রমে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে বাস্তবায়নকারী সংস্থার সুশাসন নিশ্চিতে ফলপ্রসূ পদক্ষেপ গ্রহণের বিবেচনা সাপেক্ষে প্রকল্প অনুমোদন দিতে হবে।

৭. তথ্য বোর্ডে আবশ্যকীয় উল্লিখিত বিষয়সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন প্রণয়ন সাপেক্ষে সব প্রকল্প এলাকায় তথ্য বোর্ড স্থাপনসহ দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তার উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।

৮. প্রকল্প তদারকি, নিরীক্ষা ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন জনগণের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে এবং প্রকল্পের সব পর্যায়ে জন অংশগ্রহণসহ তৃতীয় পক্ষের স্বাধীন তদারকি নিশ্চিত করতে হবে।

৯. অভিযোগ গ্রহণের জন্য অভিযোগ বাক্স স্থাপন, মোবাইল নম্বর প্রদানসহ প্রকল্প এলাকায় গণশুনানির মাধ্যমে অভিযোগ নিরসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১০. জলবায়ু ট্রাস্ট তহবিল ব্যবহার নীতিমালা, ২০১২ লঙ্ঘনের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট শাস্তির বিধানসহ নীতিমালা সংশোধন করতে হবে।

যুক্তরাজ্যের গ্লাসগোতে কপ-২৬ জলবায়ু সম্মেলন কয়লাভিত্তিক জ্বালানি ব্যবহার বন্ধ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসার এবং প্রতিশ্রুত জলবায়ু অর্থায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রসঙ্গে টিআইবির অবস্থাপত্র*

যুক্তরাজ্যের গ্লাসগোতে ৩১ অক্টোবর ২০২১ থেকে শুরু হতে যাওয়া কপ-২৬/জলবায়ু সম্মেলনকে প্যারিস চুক্তি-পরবর্তী সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জলবায়ু সম্মেলন হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। প্রাক-শিল্পায়ন সময় থেকে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি ১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার জন্য ১৯৬টি দেশ প্যারিস চুক্তিতে সম্মত হয় ছয় বছর আগে। কিন্তু চুক্তি বাস্তবায়নের পথরেখা চূড়ান্ত করতে পারেনি দেশগুলো। ইতিমধ্যে তাপমাত্রা প্রাক-শিল্প যুগ থেকে ১ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেয়েছে। বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং অধিক কার্বন নিঃসরণ বিশ্বব্যাপী ঘন ঘন বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড় এবং দাবানলের ঘটনা বাড়িয়ে দিয়েছে অস্বাভাবিকভাবে। এমন বাস্তবতায় বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি ঠেকানোর ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা কার্বন নিঃসরণকারী জীবাশ্ম জ্বালানি, বিশেষ করে কয়লার ব্যবহার ও রপ্তানি বেড়েছে এবং অর্থায়ন বৃদ্ধি পেয়েছে কয়লাভিত্তিক জ্বালানি প্রকল্পে। অন্যদিকে, উন্নয়নশীল দেশগুলোয় নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রসারে প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রতিশ্রুত উন্নয়ন সহায়তার ‘অতিরিক্ত’ এবং ‘নতুন’ ১০০ বিলিয়ন ডলার জলবায়ু প্রতিবছর তহবিল হিসেবে দিতে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য মুখ্যত দায়ী শিল্পোন্নত দেশগুলো ব্যর্থ হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় আলাদা কোনো তহবিল গঠন করা হয়নি। সার্বিকভাবে প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়ন এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে প্রদত্ত অঙ্গীকার প্রতিপালনে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও শুদ্ধাচার নিশ্চিতে ঘাটতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। এরই প্রেক্ষাপটে ২০৫০ সালের মধ্যে ‘নেট-জিরো’ গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ করার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, কয়লার ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা, প্রতিশ্রুত জলবায়ু অর্থায়ন প্রদান, এনহ্যান্সড ট্রান্সপারেন্সি ফ্রেমওয়ার্ক/বর্ধিত স্বচ্ছতাকাঠামো ও প্যারিস রুলবুক চূড়ান্ত করার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে কপ-২৬ সম্মেলনে আলোচনা হবে।[১] ধারণা করা হচ্ছে, প্যারিস চুক্তি-পরবর্তী সময়ে এ বিষয়গুলো নিয়ে সমঝোতায় পৌঁছানোর জন্য এ সম্মেলনই শেষ সুযোগ।

ব্যাপকভিত্তিক জীবাশ্ম জ্বালানি আহরণ ও প্রকল্পে অর্থায়ন এবং জলবায়ুঝুঁকি বৃদ্ধি

প্যারিস চুক্তি অনুযায়ী বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি ঠেকাতে দেশগুলো জীবাশ্ম জ্বালানি আহরণ ও ব্যবহার কমানোর কথা থাকলেও বাস্তব চিত্র উল্টো। অক্টোবরে প্রকাশিত জাতিসংঘ পরিবেশ

---

* ২০২১ সালের ২৮ অক্টোবর ঢাকায় অনুষ্ঠিত ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশিত অবস্থানপত্র।

[১] কপ-২৫ ওয়েবসাইট, বিস্তারিত দেখুন: https://ukcop26.org/cop26-goals/

কর্মসূচির ‘দ্য প্রডাকশন গ্যাপ রিপোর্ট’[২] বলছে, দেশগুলো ২০৩০ সালনাগাদ জীবাশ্ম জ্বালানি উৎপাদন ও ব্যবহার ১১০ ভাগ বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে। এর মধ্যে কয়লার উৎপাদন বাড়ানোর পরিকল্পনা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ২৪০ ভাগ, তেল ৫৭ ভাগ আর গ্যাস ৭১ ভাগ। শুধু তা-ই নয়, করোনা অতিমারি শুরুর পর বৃহৎ অর্থনীতির গ্রুপ জি-২০ দেশগুলো ৩০০ বিলিয়ন ডলারের নতুন তহবিল এ খাতে অর্থায়ন করার পরিকল্পনা করছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঝুঁকিতে থাকা বাংলাদেশও হাঁটছে এই উল্টোপথে। রামপাল, মাতারবাড়ী, বাঁশখালী প্রকল্পসহ মোট ১৯টি কয়লা ও এলএনজিভিত্তিক প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে, যার বড় অংশই করা হচ্ছে উপকূলীয় জেলাগুলোয়। জাপান, চীন, কোরিয়সহ বিশ্বের উন্নত দেশ এই প্রকল্পগুলোতে অর্থায়ন ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে।[৩] চীন নিজ দেশের বাইরে কয়লা প্রকল্পে অর্থায়ন না করার ঘোষণা দিলেও বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশে নির্মাণাধীন প্রকল্পে অর্থায়ন বন্ধের কোনো ঘোষণা দেয়নি।[৪] উল্লেখ্য, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এমনিতেই বাংলাদেশের উপকূলীয় স্থলভাগের ১১ শতাংশ তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। চার ও পাঁচ মাত্রার ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানার ঝুঁকিও ১৩০ শতাংশ বাড়বে।[৫] এরই মধ্যে উপকূলীয় জেলায় এত বেশিসংখ্যক কয়লা প্রকল্প বন ও পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করবে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি আরও বাড়িয়ে দেবে। ফলে উপকূলীয় জেলায় বসবাসরত ১ কোটি ৫০ লাখ মানুষের জীবন ও জীবিকা আরও হুমকির মুখে পড়বে।

প্রতিবেদন প্রণয়ন ও নীতিনির্ধারণে হস্তক্ষেপ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রসারে বাধা

কপ-২৬ সম্মেলনে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমানোর বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা জোর দিয়ে বলা হলেও সৌদি আরব, অস্ট্রেলিয়া, জাপান এবং ভারতসহ বিভিন্ন প্রভাবশালী দেশ দ্রুত সময়ে তা কমানোর বিরোধিতায় নেমেছে ভেতরে-ভেতরে।[৬] শুধু তা-ই নয়, জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে ইউএনএফসিসি প্রতিবেদনে পছন্দসই পরিবর্তন আনতে চাপ দিচ্ছে জীবাশ্ম জ্বালানি উৎপাদন ও রপ্তানির সঙ্গে জড়িত বৃহৎ দেশগুলো। একইভাবে, ধনী বেশ কয়েকটি দেশ পরিবেশবান্ধব জ্বালানি প্রসারে দরিদ্র দেশগুলোকে বেশি অর্থ দেওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। এ-সংক্রান্ত নীতি গ্রহণ-প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত ও দীর্ঘায়িত করার জন্য জোর তদবির চালাচ্ছে। উল্লেখ্য, জীবাশ্ম জ্বালানি কোম্পানির লবিস্টরা প্যারিস চুক্তির ধারা ৬ সংযোজনে সফল হয়েছে। ফলে দূষণকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য কঠিন কোনো শর্ত না দিয়ে বরং তাদের জন্য কার্বন ক্রয় ও বিক্রয়ের সুযোগ রাখা হয়েছে।[৭]

---

২ দ্য প্রডাকশন গ্যাপ রিপোর্ট ২০২১ দেখুন: https://productiongap.org/2021report/

৩ মার্কেট ফোর্স ২০১৯, বিস্তারিত দেখুন: https://bit.ly/3C79Y9A

৪ নেচার, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২১, বিস্তারিত দেখুন: https://www.nature.com/articles/d41586-021-02645-w

৫ ডেইলি স্টার, ১১ জানুয়ারি ২০০৮, বিস্তারিত দেখুন: https://www.thedailystar.net/news-detail-18674

৬ বিবিসি, ২১ অক্টোবর ২০২১, বিস্তারিত দেখুন: https://www.bbc.com/news/science-environment-58982445

৭ টিন ভোগ, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২১, বিস্তারিত দেখুন: https://www.teenvogue.com/story/un-climate-change-conferences-fossil-fuel-industry

অন্যদিকে, একটি গবেষণার তথ্যমতে বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য উৎস থেকে প্রায় ৩০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের সুযোগ রয়েছে।[৮] ২০১০ সালের পরে নাবয়নযোগ্য জ্বালানির উৎসভেদে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় ৮৫ শতাংশ পর্যন্ত হ্রাস[৯] পেলেও জ্বালানি খাতসহ জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অনুমিত অবদান (আইএনডিসি) সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে এই উৎসগুলো থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে পর্যাপ্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়নি এবং কোনো পথরেখাও প্রণয়ন করা হয়নি।[১০] ২০২০ সালের মধ্যে ১০ শতাংশ বিদ্যুৎ নবায়নযোগ্য উৎস থেকে উৎপাদনের প্রতিশ্রুতি থাকলেও বর্তমানে প্রতিদিন মাত্র ৭৩০ মেগাওয়াট উৎপাদন হচ্ছে, যা মোট উৎপাদন সক্ষমতার মাত্র ৩ দশমিক ৪৭ শতাংশ। পর্যাপ্ত বিনিয়োগ ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কার্যকর পদক্ষেপের অভাবে ২০২১ সালেও নির্ধারিত লক্ষ্যের অর্ধেকও অর্জন করা সম্ভব হয়নি। টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (স্রেডা) ৩৬টি নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্পের মধ্যে শুধু চারটি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে।[১১] সংশোধন হতে যাওয়া বিদ্যুৎ মহাপরিকল্পনায় ২০৪১ সালের মধ্যে ৪০ শতাংশ এবং ২০৫০ সালের মধ্যে শতভাগ নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদন নিশ্চিতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির ধারণা ও পথ নির্দেশনা এখনো তৈরি করা হয়নি।

বৈশ্বিক কার্বন নিঃসরণ হ্রাস এবং আন্তর্জাতিক ও জাতীয় প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে ঘাটতি

জীবাশ্ম জ্বালানি বৈশ্বিক মোট কার্বনের তিন-চতুর্থাংশ নিঃসরণ করে, যা বৈশ্বিক তাপমাত্রা ১ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধির জন্য দায়ী।[১২] ইউরোপের ৫০টি দেশ ২০৫০ সালের মধ্যে 'নেট-জিরো' লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং সংশোধিত আইএনডিসি বাস্তবায়নের ঘোষণা দিয়েছে, যেখানে তারা যেমন পরিবহন, ইস্পাত ও ভারী শিল্প খাত থেকে অপর্যাপ্ত কার্বন নিঃসরণ কমানোর পরিকল্পনা দিয়েছে।[১৩] তাদের প্রদত্ত সংশোধিত প্রতিশ্রুতি কার্বন হ্রাসে বৈশ্বিক মোট ঘাটতির মাত্র ২০ শতাংশ পুষিয়ে দিতে পারবে।[১৪]

বাংলাদেশ সংশোধিত আইএনডিসি জমা দিলেও সেখানে কার্বন হ্রাসের বাড়তি কোনো কার্যক্রম ও পরিকল্পনা প্রদান করা হয়নি। প্রস্তাবিত ১০টি কয়লাবিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন না করার সিদ্ধান্ত নিলেও নতুন কয়লা প্রকল্প গ্রহণ বন্ধের ঘোষণা সরকার দেয়নি। রামপাল, মাতারবাড়ী, বাঁশখালী প্রকল্পসহ মোট ১৯টি কয়লা ও এলএনজিভিত্তিক প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন হলে বাংলাদেশের কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৬৩ গুণ বৃদ্ধি পাবে

---

[৮] ন্যাশনাল রিনিউয়েবল এনার্জি ল্যাবরেটরি প্রতিবেদন ২০১৮, https://www.nrel.gov/docs/fy18osti/71077.pdf

[৯] ইন্টারন্যাশনাল রিনিউয়েবল এনার্জি এজেন্সি প্রতিবেদন ২০২০: বিস্তারিত দেখুন: https://www.irena.org/publications/2021/Jun/Renewable-Power-Costs-in-2020

[১০] সিপিডি ২০২১, বিস্তারিত দেখুন: https://bit.ly/3C7a7tE

[১১] স্রেডা, বিস্তারিত দেখুন: http://www.renewableenergy.gov.bd/index.php

[১২] গ্লোবাল এনার্জি আউটলুক ২০২১, বিস্তারিত দেখুন: https://www.rff.org/publications/reports/global-energy-outlook-2021-pathways-from-paris/; আওয়ার ওয়ার্ল্ড ইন ডাটা, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://ourworldindata.org/ghg-emissions-by-sector

[১৩] ওইসিডি ২০১৯, বিস্তারিত দেখুন: https://www.oecd.org/greengrowth/GGSD2019_IssuePaper_CementSteel.pdf

[১৪] ইমিশন গ্যাপ রিপোর্ট ২০২০, বিস্তারিত দেখুন-https://www.unep.org/interactive/emissions-gap-report/2020/

এবং ২০৩০ সালের মধ্যে বছরে ১১৫ মিলিয়ন টন বাড়তি কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসরণ করবে।[১৫] ফলে বাংলাদেশ এশিয়ার অন্যতম কয়লা দূষণকারী দেশে রূপান্তরিত হবে, যা কার্বন নিঃসরণ কমানোসংক্রান্ত সরকারের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

কয়লাভিত্তিক প্রকল্পের ফলে প্রাকৃতিক সম্পদ সুরক্ষায় অনিশ্চয়তা

কপ-২৬ সম্মেলনে একটি গুরুত্বপূর্ণ এজেন্ডা হলো ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠী, প্রাকৃতিক আবাসস্থল ও সম্পদ সুরক্ষা, বাস্তুতন্ত্র রক্ষা ও পুনরুদ্ধার, জীবন-জীবিকা রক্ষা এবং ক্ষতি এড়ানো। কিন্তু বাংলাদেশ কয়লা প্রকল্পের জন্য অস্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও ব্রাজিল থেকে নিম্নমানের কয়লা সমুদ্র ও নদীপথে প্রকল্প এলাকায় আমদানি করবে। ফলে নদীর পানিদূষণসহ জলজ জীববৈচিত্র্যের ওপর ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব ফেলার ঝুঁকি রয়েছে। উল্লেখ্য, চীনের অর্থায়নে পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় পায়রা নদী ও সমুদ্রতটের জায়গা দখল করে কয়লাবিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণ করা হচ্ছে। প্রকল্পটির ফলে আন্ধারমানিক নদী এবং রামনাবাদ চ্যানেলের ৪০ কিমি বিস্তৃত ইলিশের অভয়ারণ্য ও প্রজননক্ষেত্র ঝুঁকির মধ্যে পড়বে। কয়লাবাহী জাহাজের দূষিত তেল, ময়লা, আবর্জনা এবং কয়লা প্রকল্প থেকে গরম পানি ছেড়ে দিলে ইলিশ প্রজননে সহায়ক একধরনের প্লাঙ্কটন ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ফলে ইলিশের প্রজননক্ষেত্রটি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং নদীর মাছ ধরা ও প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভর জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকা হুমকির মধ্যে পড়বে।[১৬]

বাংলাদেশে আঘাত হানা প্রবল ঘূর্ণিঝড়সহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে মানুষের জীবন-জীবিকা ও উপকূলের জনপদকে রক্ষায় সুন্দরবন একটি রক্ষাকবচ। কিন্তু বৈশ্বিক ও জাতীয় উদ্বেগ উপেক্ষা করে আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য কৌশলগত পরিবেশ সমীক্ষা ছাড়াই সুন্দরবনের মতো পরিবেশ সংবেদনশীল বনের কাছে কয়লাবিদ্যুৎ প্রকল্প ও ঝুঁকিপূর্ণ শিল্প স্থাপন করা হচ্ছে। রামপাল কয়লা প্রকল্পের কারণে বিশ্ব ঐতিহ্য কমিটি কর্তৃক সুন্দরবনকে 'ঝুঁকিপূর্ণ বিশ্ব ঐতিহ্যে'র তালিকায় অন্তর্ভুক্তির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

কয়লা প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে দূষণ বৃদ্ধির ঝুঁকি এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন

সম্প্রতি জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিল টেকসই, নিরাপদ, স্বাস্থ্যকর পরিবেশের অধিকারকে মানবাধিকার হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে। কিন্তু চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে পরিকল্পিত আটটি কয়লা প্রকল্প থেকে দূষণের ফলে ৩০ বছরে ৩০ হাজার মানুষের মৃত্যুর আশঙ্কা রয়েছে। শুধু জাপান সরকারের অর্থায়নে কক্সবাজারে মাতারবাড়ীতে স্থাপিত কয়লা প্রকল্পের দূষণ ১৪ হাজার মানুষের মৃত্যুর কারণ হবে।[১৭] বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় পর্যটনকেন্দ্র কক্সবাজার ও এর আশপাশের পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি হবে। এ ছাড়া, রামপাল, মাতারবাড়ী এবং বারিশালে কয়লা প্রকল্প

---

[১৫] মার্কেট ফোর্স ২০১৯, বিস্তারিত দেখুন: https://www.marketforces.org.au/bangladesh-choked-by-coal/

[১৬] ডেইলি স্টার, ১৫ জানুয়ারি ২০১৯, বিস্তারিত দেখুন: https://www.thedailystar.net/frontpage/news/hilsa-habitats-under-threat-1687693; থার্ড পোল ২০২১, বিস্তারিত দেখুন: https://www.thethirdpole.net/en/energy/china-builds-coal-power-plant-bangladesh-despite-protests/

[১৭] সেন্টার ফর রিসার্চ অন এনার্জি অ্যান্ড ক্লিন এয়ার ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://bit.ly/3C71KOL

বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় জনগণের বসতভিটা ও কৃষিজমি থেকে উচ্ছেদ এবং বাঁশখালীতে কয়লা প্রকল্পবিরোধী আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে মৃত্যুসহ মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে। ফলে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারের পরিপন্থী এই কয়লা প্রকল্পগুলো বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনকে ঝুঁকিতে ফেলবে।

বৈশ্বিক জলবায়ু অর্থায়নে স্বচ্ছতার ঘাটতি ও অর্থায়নে অনিশ্চয়তা

প্যারিস চুক্তিতে প্রতিশ্রুত জলবায়ু তহবিল প্রদান বাধ্যতামূলক না করে ঐচ্ছিক রাখা হয়েছে। ফলে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় জলবায়ু অর্থায়ন পাওয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। ২০২০ সাল থেকে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে প্রতিবছর ১০০ বিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ হিসেবে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও তা প্রদানে উন্নত দেশগুলো ব্যর্থ হয়েছে।[১৮] জলবায়ু তহবিল 'উন্নয়ন সহায়তার বাড়তি' ও 'নতুন এবং অতিরিক্ত' হলেও কোনো রকম যাচাই-বাছাই ছাড়াই উন্নয়ন সহায়তার সঙ্গে জলবায়ু অর্থায়নকে মিলিয়ে গত দুই বছরে তারা ৮০ বিলিয়ন ডলার দিয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এর মধ্যে সর্বোচ্চ ২০ বিলিয়ন ডলার জলবায়ু তহবিল। এ ছাড়া উন্নয়ন সহায়তাকে জলবায়ু তহবিল হিসেবে দেখানোর ফলে প্রদত্ত অর্থ দুবার গণনা ও রিপোর্ট করা হয়েছে, যা অনৈতিক। প্যারিস চুক্তিতে জলবায়ু অর্থায়নের সর্বসম্মত সংজ্ঞা না থাকায় 'নতুন' ও 'অতিরিক্ত' সহায়তাকে ঋণ হিসেবেও প্রদান করা হচ্ছে।[১৯] বাংলাদেশের অভিযোজন ও প্রশমনের জন্য প্রতিবছর ৪ বিলিয়ন ডলার প্রয়োজন।[২০] কিন্তু ২০১০ সাল থেকে বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত ৭১০ মিলিয়ন ডলার আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিল থেকে পেয়েছে, যা প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য।[২১] জলবায়ু তহবিলের টাকা কোন উৎস থেকে, কখন ও কীভাবে দেওয়া হবে তার নিশ্চয়তা না থাকায় অর্থায়নে অনিশ্চয়তা বাড়ছে।

জিসিএফের স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও শুদ্ধাচারে ঘাটতি

জলবায়ু অর্থায়নের প্রধান মাধ্যম জিসিএফ ক্ষতিগ্রস্ত দেশের জন্য ১৯০টি প্রকল্পে ১০ বিলিয়ন ডলার অনুমোদন করেছে এবং যার মধ্যে থেকে মাত্র দুই বিলিয়ন ডলার ছাড় করেছে।[২২] অভিযোজন এবং প্রশমন খাতে ৫০:৫০ অনুপাত বজায় রাখার কথা থাকলেও অভিযোজনের জন্য ২ দশমিক ৪ বিলিয়ন (২৪ শতাংশ), প্রশমনের জন্য ৪ দশমিক ৫ বিলিয়ন (৪৫ শতাংশ) এবং প্রশমনের সঙ্গে অভিযোজন মিলিয়ে (ক্রস-কাটিং) ৩ দশমিক ১ বিলিয়ন (৩১ শতাংশ) দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে অনুদান ৪২ শতাংশ এবং ঋণ ৪৪ শতাংশ।[২৩] জিসিএফ কর্তৃক তহবিল

---

[১৮] নেচার, ২০ অক্টোবর ২০২১, বিস্তারিত দেখুন: https://www.nature.com/articles/d41586-021-02846-3

[১৯] ডেইলি স্টার, ১৭ ডিসেম্বর ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://bit.ly/3m41Jpt; ডেইলি স্টার, ২৮ জুলাই ২০২১, বিস্তারিত দেখুন: https://bit.ly/3AZbvgN

[২০] পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২০১৫, বিস্তারিত দেখুন: https://bit.ly/3C71EXp

[২১] ঢাকা ট্রিবিউন, ২ জানুয়ারি ২০২১, বিস্তারিত: https://www.dhakatribune.com/climate-change/2021/01/02/climate-finance-in-bangladesh-a-critical-review

[২২] জিসিএফ ২০২১, বিস্তারিত দেখুন, https://www.greenclimate.fund/projects/dashboard#overview

[২৩] জিসিএফ ২০২১, বিস্তারিত দেখুন, https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/gcf-project-portfolio-eng.pdf

প্রাপ্তিতে কঠিন মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয়েছে এবং এই মানদণ্ড নিশ্চিত করে জাতীয় প্রতিষ্ঠানের তহবিলে অভিগম্যতা নিশ্চিতে সক্ষমতার ঘাটতি রয়েছে। অভিগম্যতা নিশ্চিতে জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধিতেও জিসিএফ কর্তৃক স্বল্প পরিমাণ রেডিনেস প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে কঠিন মানদণ্ড নিশ্চিত করে জিসিএফ থেকে প্রয়োজনীয় জলবায়ু তহবিল পাওয়া ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর জন্য কঠিন হয়ে পড়েছে। এই সুযোগকে আন্তর্জাতিক অর্থ লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানগুলো কাজে লাগিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য জিসিএফ নিবন্ধন নিচ্ছে এবং জিসিএফ প্রদত্ত অনুদানের সঙ্গে ঋণ যুক্ত করে এটিকে একটি লাভজনক বিনিয়োগ হিসেবে ব্যবহার করছে, যা অনৈতিক। জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সরাসরি অভিগম্যতা নিশ্চিতে এবং উন্নয়নশীল দেশের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে এটি একটি প্রতিবন্ধকতা। উল্লেখ্য, জিসিএফে ১১৩টি নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৪১টি আন্তর্জাতিক। অনুমোদন এবং তহবিল ছাড়সহ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কোনো নীতিমালা ও জবাবদিহি না থাকায় ২০১৫-২১ সালের মধ্যে জিসিএফ ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর জন্য মাত্র দুই বিলিয়ন ডলার ছাড় করেছে। বাংলাদেশের ছয়টি জিসিএফ প্রকল্পে ৩৬৮ মিলিয়ন ডলার অনুমোদন দিলেও অক্টোবর ২০২১ পর্যন্ত ২৮ দশমিক ৬ মিলিয়ন ডলার ছাড় করেছে, যা মোট বরাদ্দের ৭ দশমিক ৭৭ শতাংশ মাত্র।[২৪] জিসিএফের প্রকল্প তহবিল ছাড় এবং বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতার কারণে জলবায়ু উপদ্রুত এলাকায় দুর্যোগ ক্ষয়ক্ষতি বেড়েই চলেছে।

ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় অনুদানভিত্তিক বরাদ্দে ঘাটতি

প্যারিস চুক্তিতে 'ক্ষয়ক্ষতি'র (loss and damage) বিষয়টি অভিযোজন থেকে আলাদা বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। কপ-২৫ সম্মেলনে 'ক্ষয়ক্ষতি' মোকাবিলায় ওয়ারসো ইন্টারন্যাশনাল মেকানিজমের পর্যালোচনা এবং একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করা হলেও ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় আলাদা কোনো তহবিল গঠন এবং ক্রমবর্ধমান ক্ষয়ক্ষতি কমাতে অতিরিক্ত কোনো অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়নি। উল্লেখ্য, ২০২০ সালে বাংলাদেশে বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৫ বিলিয়ন ডলার। অনুদানভিত্তিক ক্ষতিপূরণ প্রদান না করে দূষণকারী উন্নত দেশগুলো ব্যক্তিগত জীবনবিমা, শস্যবিমা, লাইভস্টক বিমা কার্যকর করার দিকে গুরুত্ব দিচ্ছে। অনুদানভিত্তিক ক্ষতিপূরণ না দিয়ে এমন বিমাব্যবস্থা কার্যকর করা হলে বিমার খরচ জোগাতে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক ও পরিবারের দুর্ভোগ আরও বাড়বে। এ ছাড়া স্বচ্ছতার সঙ্গে 'ক্ষয়ক্ষতি' নির্ধারণ এবং প্রতিবেদন প্রস্তুতে কোনো গাইডলাইন এখন পর্যন্ত গৃহীত হয়নি।

প্যারিস রুলবুক ও এনডিসির আওতায় বর্ধিত স্বচ্ছতাকাঠামো বাস্তবায়নে স্বচ্ছতার ঘাটতি

প্যারিস চুক্তি স্বাক্ষরকারী দেশগুলো নিজস্ব অর্থায়নে এবং উন্নত দেশ থেকে তহবিল প্রাপ্তি সাপেক্ষে গ্রিনহাউস গ্যাস কমানোর জন্য আইএনডিসি বাস্তবায়ন করছে। আইএনডিসি বাস্তবায়নে ২০১৮ সালে প্যারিস রুলবুক/পরিকল্পনা বাস্তবায়ন নির্দেশিকা গৃহীত হয়। নির্দেশিকার ভিত্তিতে এখন

---

[২৪] জিসিএফ ২০২১, বিস্তারিত দেখুন, https://www.greenclimate.fund/countries/bangladesh#documents

পর্যন্ত বাংলাদেশসহ মোট ৮৬টি দেশ সংশোধিত আইএনডিসি প্রতিবেদন জমা দিয়েছে।[২৫] তবে রুলবুকের এনহ্যান্সড ট্রান্সপারেন্সি ফ্রেমওয়ার্ক/ বর্ধিত স্বচ্ছতা কাঠামোর আওতায় প্রতিবেদন প্রস্তুতে কিছু শর্ত শিথিল রাখা হয়েছে। অর্থায়নসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিতে যে কাঠামো প্রস্তাব হয়েছে, তা মেনে চলাও বাধ্যতামূলক নয়। ফলে দেশগুলো অস্বচ্ছ তথ্যের ভিত্তিতে গ্যাস নির্গমন, অভিযোজন ও প্রশমন কার্যক্রম এবং প্রদত্ত ও প্রাপ্ত আর্থিক সহায়তাসংবলিত প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। উন্নত দেশসহ অধিকাংশ দেশ তুলনামূলক, সম্পূর্ণ ও সময়োপযোগী তথ্য প্রদান করেনি।[২৬] ফলে কার্যক্রমের অগ্রগতিসহ উন্নত দেশগুলো ক্ষতিগ্রস্ত দেশে কী পরিমাণ আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করেছে এবং কী পরিমাণ কার্বন নির্গমন কমিয়েছে তা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। প্রতিবেদনে প্রদত্ত তথ্যের সত্যতা যাচাই করার কোনো ব্যবস্থাও নেই।[২৭] ২০৩০ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও ইউরোপিয়ান দেশগুলো ৫০-৫২ শতাংশ পর্যন্ত কার্বন কমানোর ঘোষণা দিলেও তার বাস্তবায়ন নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। ফলে সংশোধিত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হলেও বৈশ্বিক কার্বনের পরিমাণ ১৬ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে।[২৮]

আসন্ন কপ-২৬ সম্মেলনে টিআইবির প্রত্যাশা

এই পরিপ্রেক্ষিতে আসন্ন কপ-২৬ সম্মেলনে কয়লাভিত্তিক জ্বালানিব্যবস্থা নিষিদ্ধ, জলবায়ু অর্থায়নে দৃশ্যমান অগ্রগতি, ন্যায্যতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতসহ প্যারিস চুক্তির বাস্তবায়ন নিশ্চিতে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের বিবেচনার জন্য টিআইবি নিচের দাবিগুলো পেশ করছে।

বাংলাদেশ কর্তৃক কপ-২৬ সম্মেলনে উত্থাপনযোগ্য

১. জলবায়ুবিষয়ক নীতিনির্ধারণে জীবাশ্ম জ্বালানি কোম্পানিদের অনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে।

২. ২০৫০ সালের মধ্যে 'নেট জিরো' লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আইএনডিসিসহ প্রশমনবিষয়ক সব কার্যক্রমে উন্নত দেশগুলোর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে।

৩. ২০৫০ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য উৎস থেকে শতভাগ জ্বালানি উৎপাদনে উন্নত দেশগুলোকে পর্যাপ্ত জলবায়ু তহবিল, প্রযুক্তি হস্তান্তর ও কারিগরি সহায়তা প্রদানে সিভিএফের পক্ষ থেকে সমন্বিতভাবে দাবি উত্থাপন করতে হবে।

৪. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করে উন্নত দেশগুলোকে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রতিবছর ১০০ বিলিয়ন ডলার জলবায়ু তহবিল দিতে হবে।

---

২৫ ইউএনএফসিসিসি, ২০২১, বিস্তারিত দেখুন: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_08_adv_1.pdf

২৬ ইউএনএফসিসিসি, ২০২১, বিস্তারিত দেখুন: https://bit.ly/3m4rvtr

২৭ সেন্টার ফর ক্লাইমেট অ্যান্ড এনার্জি সল্যুশন, ৩ জুন ২০২১, বিস্তারিত দেখুন: https://www.c2es.org/2021/06/transparency-of-action-issues-for-cop-26/

২৮ ইউএনএফসিসিসি, ২০২১, বিস্তারিত দেখুন: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_08_adv_1.pdf

৫. জিসিএফসহ জলবায়ু তহবিলে ঋণ নয়, অভিযোজনকে অগ্রাধিকার দিয়ে ক্ষতিপূরণের টাকা অনুদান হিসেবে দিতে হবে।

৬. দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় একটি ক্ষয়ক্ষতিবিষয়ক আলাদা তহবিল গঠন করতে হবে।

৭. ক্ষয়ক্ষতি নির্ধারণ এবং এ-সংক্রান্ত প্রতিবেদন স্বচ্ছতার সঙ্গে প্রস্তুতে একটি গাইডলাইন তৈরি করতে হবে এবং ঝুঁকি বিনিময়ে বিমার পরিবর্তে অনুদানভিত্তিক ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

৮. জিসিএফের স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও শুদ্ধাচার নিশ্চিত করে যথাসময়ে ও দ্রুততার সঙ্গে প্রকল্প অনুমোদন ও অর্থছাড় করতে হবে এবং ক্ষতিগ্রস্ত দেশে অভিযোজন ও প্রশমনবিষয়ক ৫০:৫০ অনুপাত মেনে অর্থায়ন করতে হবে।

বাংলাদেশ সরকারের করণীয়

৯. ২০২১ সালের পরে নতুন কোনো প্রকার কয়লা জ্বালানিনির্ভর প্রকল্প অনুমোদন ও অর্থায়ন না করার ঘোষণা দিতে হবে।

১০. নেট জিরো লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কপ-২৬ সম্মেলনে একটি আইনি সমঝোতা করতে ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরামের (সিভিএফ) নেতৃত্বে বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিকভাবে শক্ত অবস্থান গ্রহণ করতে হবে।

১১. জীবন-জীবিকা, বন ও পরিবেশ এবং প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষায় কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রসহ বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ শিল্পায়ন কার্যক্রম স্থগিত করে আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য ও নিরপেক্ষ কৌশলগত পরিবেশের প্রভাব নিরূপণ সাপেক্ষে অগ্রসর হতে হবে।

১২. একটি সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপসহ প্রস্তাবিত ইন্টিগ্রেটেড এনার্জি অ্যান্ড পাওয়ার মাস্টারপ্ল্যানে (আইইপিএমপি) কৌশলগতভাবে নবায়নযোগ্য জ্বালানিকে গুরুত্ব দিতে হবে।

১৩. জ্বালানি খাতে স্বার্থের দ্বন্দ্ব সংশ্লিষ্টদের বাদ দিয়ে একটি অন্তর্ভুক্তি ও অংশগ্রহণমূলক উপায়ে প্রস্তাবিত ইন্টিগ্রেটেড এনার্জি অ্যান্ড পাওয়ার মাস্টারপ্ল্যান (আইইপিএমপি) প্রণয়ন করতে হবে।

১৪. বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানির উৎপাদন বৃদ্ধিতে এ খাতের জন্য স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা নিতে হবে এবং সুনির্দিষ্ট রূপরেখা প্রণয়ন করে প্রশমনবিষয়ক কার্যক্রম স্বচ্ছতার সঙ্গে বাস্তবায়নে পদক্ষেপ নিতে হবে; বিশেষ করে এ খাতে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ বৃদ্ধিসহায়ক নীতিমালা প্রণয়ন ও অবিলম্বে বাস্তবায়ন করতে হবে।

গবেষক পরিচিতি

অমিত সরকার

টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাধবিদ্যা ও পুলিশবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর এবং একই বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিভাগ থেকে তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তিতে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে জাতীয় শুদ্ধাচারব্যবস্থা (জাতীয় সংসদ, বিচার বিভাগ), মানব পাচার, সাইবার ও বহুজাতিক অপরাধ ইত্যাদি।

কাজী আবু সালেহ

গবেষক হিসেবে টিআইবি এবং বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্টসহ (ব্লাস্ট) বিভিন্ন দেশি ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছেন। জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, আন্তর্জাতিক অভিবাসন, শিশু অধিকার ইত্যাদি বিষয় তার গবেষণার প্রধান ক্ষেত্র। তিনি সর্বশেষ টিআইবির ক্লাইমেট ফিন্যান্স পলিসি অ্যান্ড ইন্টিগ্রিটি (সিএফপিআই) প্রকল্পের 'সহকারী ব্যবস্থাপক–গবেষণা' হিসেবে কর্মরত ছিলেন এবং বর্তমানে ইরেসমাস মুন্ডুস স্কলারশিপের অধীনে সমাজকল্যাণ বিষয়ে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পড়াশোনা করছেন। তার সাম্প্রতিক কাজের মধ্যে অন্যতম হলো দুর্যোগ মোকাবিলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় : ঘূর্ণিঝড় আম্পান। এ ছাড়া আন্তর্জাতিক অভিবাসন ও শিশু অধিকারসংক্রান্ত তার কিছু গবেষণা প্রবন্ধ আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন।

কুমার বিশ্বজিত দাশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ের তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তিনি ম্যানেজার, রিসোর্স অ্যান্ড ইনফরমেশন এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (তথ্য) হিসেবে টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে কর্মরত ছিলেন। তিনি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার ও টিআইবির জাতীয় খানা জরিপসহ অন্যান্য গবেষণার সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

জুলিয়েট রোজেটি

টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বরিশাল সরকারি ব্রজমোহন কলেজের অর্থনীতি বিভাগ থেকে স্নাতক ও

স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয় হচ্ছে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও প্রতিষ্ঠান (সংসদ), তথ্য অধিকার এবং সরকারি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ও খাত।

দিপু রায়

তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তিনি প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে কর্মরত ছিলেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয়গুলোর মধ্যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাত এবং এসব খাতভিত্তিক প্রতিষ্ঠান, জাতীয় সততা ব্যবস্থাসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান, টেলিযোগাযোগ খাত এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া টিআইবির জাতীয় খানা জরিপসহ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জরিপের সঙ্গেও তিনি জড়িত।

নাজমুল হুদা মিনা

অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে কর্মরত ছিলেন। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। নাজমুল হুদা তৈরি পোশাক খাত, বিচার বিভাগ ও ভূমি ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত গবেষণার সঙ্গে জড়িত।

নাহিদ শারমীন

টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর এবং বেলজিয়ামের অ্যান্টর্প বিশ্ববিদ্যালয়ে 'গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট' বিষয়ে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয় হচ্ছে স্থানীয় সরকার খাত ও প্রতিষ্ঠান, সরকারি ক্রয়, জলবায়ু পরিবর্তন এবং স্বাস্থ্য খাত ও প্রতিষ্ঠান।

নিহার রঞ্জন রায়

ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে কর্মরত ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। নিহার রঞ্জনের গবেষণার প্রধান বিষয় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও প্রতিষ্ঠান (সংসদ) এবং ভূমি খাত (ভূমি ব্যবস্থাপনা ও সেবা কার্যক্রম)। এ ছাড়া তিনি সমবায় খাত (সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনা) এবং পাবলিক পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁস নিয়েও গবেষণা করেছেন।

তাসলিমা আক্তার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তিনি প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে কর্মরত ছিলেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয়ের মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্য খাত ও স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়া। এ ছাড়া টিআইবির জাতীয় খানা জরিপসহ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জরিপের সঙ্গেও তিনি জড়িত।

ফাতেমা আফরোজ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন সিভিল সার্ভিস কলেজ থেকে গভর্ন্যান্স অ্যান্ড পাবলিক পলিসি বিষয়ে স্নাতকোত্তর এবং ভিয়েনাভিত্তিক ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্টি-করাপশন একাডেমিতে মাস্টার অব আর্টস ইন অ্যান্টি-করাপশন স্টাডিজ বিষয়ে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয় হচ্ছে সুশাসন, দুর্নীতি, জাতীয় সংসদ, সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, জেন্ডার ইত্যাদি। তিনি ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে কর্মরত ছিলেন।

ফারহানা রহমান

টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে রিসার্চ ফেলো হিসেবে কর্মরত। তিনি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয় স্থানীয় সরকার খাত ও প্রতিষ্ঠান। এ ছাড়া তিনি প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, জাতীয় বাজেট পর্যালোচনা, ২০০৪ সালের বন্যা পরিস্থিতি পর্যালোচনা বিষয়ে গবেষণা করেছেন। এ ছাড়া টিআইবির জাতীয় খানা জরিপের সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে জড়িত।

মনজুর ই খোদা

টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর এবং বেলজিয়ামের অ্যান্টর্প বিশ্ববিদ্যালয়ে 'গ্লোবালাইজেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট' বিষয়ে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয়ের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশের স্থল ও সমুদ্রবন্দর এবং কাস্টম হাউস ব্যবস্থাপনা, বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, প্রাথমিক শিক্ষা খাত ও প্রতিষ্ঠান এবং অভিবাসন-প্রক্রিয়ায় সুশাসন। এ ছাড়া টিআইবির জাতীয় খানা জরিপসহ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জরিপের সঙ্গেও তিনি জড়িত ছিলেন।

মু. জাকির হোসেন খান

টিআইবির জলবায়ু অর্থায়ন সুশাসন ইউনিটে সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। জলবায়ু অভিযোজন ও অর্থায়ন, পানিসম্পদ খাত, পরিবেশ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানিবিষয়ক সুশসান ও নীতি বিশ্লেষণ তার গবেষণার বিষয়। তার বিভিন্ন গবেষণা প্রবন্ধ ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, জার্নাল অব ডেভেলপমেন্ট ইকোনমিকস, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত দি এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত এনভায়রনমেন্টাল ভ্যালুয়েশন ইন সাউথ এশিয়া, ওয়াটার ইন্টিগ্রিটি গ্লোবাল আউটলুক ২০১৭সহ সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল ইকোনমিকস, সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক ফর এনভায়রনমেন্টাল ইকোনমিকস, ইকোনমিক রিসার্চ গ্রুপ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকাশনায় ছাপা হয়েছে। এ ছাড়া দেশি-বিদেশি বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে গবেষণার বিষয়ে তিনি নিয়মিত প্রবন্ধ লেখেন।

মো. জুলকারনাইন

রিসার্চ ফেলো হিসেবে টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে কর্মরত। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর এবং পরে স্টেট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ থেকে জনস্বাস্থ্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয়ের মধ্যে রয়েছে সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও ব্যাংকিং খাত এবং এসব খাতভিত্তিক প্রতিষ্ঠান, পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য ইত্যাদি। এ ছাড়া তিনি টিআইবির জাতীয় খানা জরিপসহ জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন জরিপের সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। টিআইবি ছাড়াও তিনি পপুলেশন কাউন্সিল বাংলাদেশ, জেমস পি গ্রান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথ, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, এনজিও ফোরাম ফর পাবলিক হেলথ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে গবেষক হিসেবে কাজ করেছেন।

মো. নেওয়াজুল মওলা

বর্তমানে টিআইবির ক্লাইমেট ফাইন্যান্স গভর্ন্যান্স (সিএফজি) ইউনিটে রিসার্চ ফেলো হিসেবে কর্মরত। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নৃবিজ্ঞানে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। সামাজিক গবেষণা এবং এর বিভিন্ন পদ্ধতিতে তার গভীর অভিজ্ঞতা রয়েছে। টিআইবিতে সিএফজি ইউনিটের সঙ্গে কাজ করার সময় তিনি জলবায়ু পরিবর্তন এবং অর্থসংক্রান্ত বিষয়গুলোর প্রশাসনিক দিক ঘনিষ্ঠভাবে উপলব্ধি করেন এবং জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসনের ওপর বিভিন্ন গবেষণা ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করেন। টিআইবিতে যোগদানের আগে তিনি ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি, আইসিডিডিআরবি এবং ব্র্যাকের সঙ্গে কাজ করেছেন। তার গবেষণার আগ্রহের ক্ষেত্রগুলো হলো জলবায়ু পরিবর্তন, প্রশমন ও অভিযোজন, জলবায়ু অর্থ পরিচালনা, জীবিকা এবং স্থিতিস্থাপকতা, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে স্বাস্থ্যের ঝুঁকি এবং সামাজিক বোঝাপড়া এবং বিশ্বাস ব্যবস্থা, পরিবেশগত চাপের সঙ্গে সামাজিক দুর্বলতা অভিযোজন, জলবায়ুতাড়িত অভিবাসন, অভিযোজন পরিচালনার মান, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং ত্রাণে অর্থায়নের সততা।

মোহাম্মদ নূরে আলম

ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে কর্মরত ছিলেন। তিনি শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। নূরে আলম ইতিমধ্যে পানি উন্নয়ন বোর্ড, বিমান ও বিমানবন্দর ব্যবস্থাপনা এবং ভূমি ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণা সম্পন্ন করেছেন। এ ছাড়া টিআইবির জাতীয় খানা জরিপসহ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জরিপের সঙ্গেও তিনি জড়িত।

মো. মাহ্ফুজুল হক

গবেষক ও প্রকল্প ব্যবস্থাপক হিসেবে টিআইবি এবং হ্যাবিট্যাট ফর হিউম্যানিটি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশি এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছেন। জলবায়ু পরিবর্তন, জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন, পানি ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ

সুরক্ষা ইত্যাদি বিষয় তার গবেষণার প্রধান ক্ষেত্র। তিনি বর্তমানে টিআইবির ক্লাইমেট ফিন্যান্স পলিসি অ্যান্ড ইন্টিগ্রিটি (সিএফপিআই) প্রকল্পের প্রকল্প ব্যবস্থাপক হিসেবে কর্মরত রয়েছেন এবং জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসনবিষয়ক বিবিধ গবেষণা ও অধিপরামর্শমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। তার গবেষণাকাজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়ন এবং সুশাসন, বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়নের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, অভিযোজন অর্থায়নে সুশাসনের মানদণ্ড নির্ধারণ, বন্যা মোকাবিলায় প্রস্তুতি এবং ত্রাণ কার্যক্রমে শুদ্ধাচার পর্যবেক্ষণ, দুর্যোগ মোকাবিলা ইত্যাদি। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন।

মো. মোস্তফা কামাল

রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট– কোয়ালিটেটিভ হিসেবে টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে কর্মরত। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। টিআইবিতে কাজ করার আগে তিনি আইসিডিডিআরবিতে স্বাস্থ্য খাতের একাধিক গবেষণাকর্মে সহায়তা করেছেন।

মো. রেযাউল করিম

প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে কর্মরত ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর এবং ভিয়েনাভিত্তিক ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্টি-করাপশন একাডেমিতে মাস্টার অব আর্টস ইন অ্যান্টি-করাপশন স্টাডিজ বিষয়ে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয়গুলোর মধ্যে জাতীয় সততাব্যবস্থা-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান (সরকারি কর্ম কমিশন, নির্বাহী বিভাগ), গণপরিবহন খাত ও প্রতিষ্ঠান, মানব পাচার এবং জাতীয় নিরাপত্তা উল্লেখযোগ্য।

মোরশেদা আক্তার

টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয় হচ্ছে জাতীয় সংসদ, শিক্ষা খাত এবং সরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান ও খাত।

রাজু আহমেদ মাসুম

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নৃবিজ্ঞানে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় পর্যায়ে জলবায়ুসংক্রান্ত কার্যক্রম ও সুশাসনসংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে তার গবেষণার অভিজ্ঞতা রয়েছে। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশে অক্সফামের অধীনে জলবায়ু বিচার ও প্রাকৃতিক সম্পদ অধিকারের জন্য কাজ করছেন। জলবায়ুসংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপের পাশাপাশি জনাব মাসুম জরুরি সাড়া প্রদানের ক্ষেত্রেও অভিজ্ঞ। এ ছাড়া তিনি বিভিন্ন মেয়াদে

ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ, বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) এবং অ্যাকশনএইড বাংলাদেশে কাজ করেছেন। এ ছাড়া শিশু সুরক্ষা, খাদ্যনিরাপত্তা, শহুরে স্থিতিস্থাপকতা ইত্যাদি অন্যান্য উন্নয়নসংক্রান্ত বিষয়ে তার আগ্রহ রয়েছে। তিনি অক্সফাম জিবি, স্টার্ট নেটওয়ার্ক ও ডিএফআইডির একজন জরুরি মানবিক প্রতিক্রিয়া ফেলো। তিনি বাংলাদেশের রানা প্লাজার ঘটনাসহ বিভিন্ন মানবিক পরিস্থিতিতে একজন কর্মী হিসেবে অবদান রেখেছেন।

দেশব্যাপী দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি ও নাগরিক চাহিদাকে সোচ্চার ও কার্যকর করার জন্য কাজ করছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। এর অংশ হিসেবে সুশাসনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সরকারি-বেসরকারি সেবা খাতে দুর্নীতির প্রকৃতি, মাত্রা ও ব্যাপকতা নিরূপণের জন্য টিআইবি গবেষণা ও তার ভিত্তিতে অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সরকার ও সংশ্লিষ্ট সব অংশীজনের অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশে আইনি, প্রাতিষ্ঠানিক, নীতি ও কৌশল কাঠামোতে প্রয়োজনীয় ও যুগোপযোগী সংস্কারের মাধ্যমে রাষ্ট্রের দুর্নীতিবিরোধী ও সুশাসনসহায়ক অবকাঠামো সুদৃঢ় করা ও এর প্রয়োগে সহায়ক ভূমিকা পালন করা এই কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য।

টিআইবি পরিচালিত ও প্রকাশিত বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ নিয়ে ‘বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা : উত্তরণের উপায়’ শীর্ষক ১১টি সংকলন ইতিমধ্যে বার্ষিক ভিত্তিতে প্রকাশিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় এই সিরিজের দ্বাদশতম সংকলন ২০২২ সালের অমর একুশে গ্রন্থমেলা উপলক্ষে প্রকাশিত হলো। এই সংকলনকে চারটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে : প্রথম অধ্যায়ে দেশের শুদ্ধাচারব্যবস্থা, দ্বিতীয় অধ্যায়ে সেবা খাত, তৃতীয় অধ্যায়ে ব্যক্তিমালিকানাধীন খাত এবং চতুর্থ অধ্যায়ে পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ মোকাবিলা নিয়ে প্রকাশিত বিভিন্ন গবেষণার ওপর ভিত্তি করে লিখিত প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে।

ISBN Number: 978-984-35-2052-4
978-984-35-2052-4

Transparency International Bangladesh (TIB)
MIDAS Centre (Levels 4 & 5)
House 05, Road 16 (New) 27 (Old), Dhanmondi, Dhaka 1209
Tel: +8802 48113032-33, 48113036, Fax: +8802 48113101
info@ti-bangladesh.org www.ti-bangladesh.org TIBangladesh